শারীর শিক্ষার
ইতিহাস
রথীন্দ্র কুমার সেন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

শারীর শিক্ষার ইতিহাস

রথীন্দ্র কুমার সেন

অধিকর্তা, শারীর শিক্ষা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
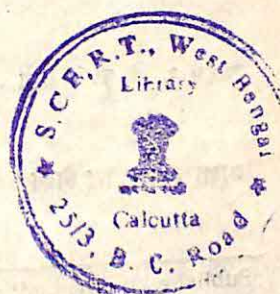
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SARIR SHIKSAR ITIHAS
[History of Physical Education]
RATHINDRA KUMAR SEN

প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক ঃ
অদ্রীশ বর্ধন
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী দুর্গা রায়

মূল্য ঃ সাতাশ টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

সমাজ জীবনে শারীর শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সব দেশই আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। একটি সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে সর্ব প্রথমে চাই কর্ম চঞ্চল পরিবেশ। সেখানে কর্মযজ্ঞের সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কর্মীর, যারা শ্রমে ক্লান্ত নয়, দেহভারে নত নয়, যাদের শরীর সুগঠিত ও পটুতায় ভরা এবং কর্ম-কুশলতা যাদের সম্বল। তাই আজ দেশে দেশে শারীর শিক্ষার প্রসার ও প্রচার এত ব্যাপকতা লাভ করেছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে শারীর শিক্ষার প্রত্যক্ষ দান অপরিসীম। শুধু শারীরিক দক্ষতা নয়, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেও এই শিক্ষা সহায়তা করে। এমন কি, অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করার জন্যও এর প্রভাব সামান্য নয়। এছাড়া, শারীর শিক্ষা খেলার মাঠে যে শৃংখলা-বোধের জন্ম দেয়—সমাজের সর্বস্তরে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, তার মূল্য সীমাহীন।

ফুটবল খেলায় রেফারির ক্ষুদ্র বাঁশির শব্দে বাইশ জন তাজা যুবকের বিদ্যুৎগতি ও চরম উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ারের সামান্য অঙ্গুলির ইঙ্গিতেই ব্যাট্‌সম্যানকে অবনত মস্তকে মাঠ পরিত্যাগ করতে হয়। খেলার মাঠের এই শৃংখলা শিক্ষা সম্ভবত আর কোথাও নেই।

শারীর শিক্ষাকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য জানতে হবে তার অতীত ইতিহাস। সুদূর অতীতকালে মানব সমাজে শারীর প্রভাব এবং তার ক্রমবিকাশের ধারার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা না জন্মালে বর্তমান কালোপযোগী শারীর শিক্ষার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। শারীর শিক্ষার ইতিহাস রচনা করার সার্থকতা এখানেই।

যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার কাহিনীর অনেকটাই অন্ধকারের পর্দায় আবৃত কিন্তু পৃথিবীর বুকে সেই যুগের লোকেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে রেখে গেছে তাদের জীবন ধারার কিছু চিহ্ন, কিছু ইঙ্গিতবাহী সূত্র। এছাড়া, আধুনিক আদিবাসী ও কয়েকটি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীও সেই অন্ধকার যুগের বুকে কয়েকটি আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করেছে। তারই ফলে আমরা জেনেছি, অনুমান করেছি সেই যুগের কথা যখন মানুষের বাসস্থান ছিল গুহা কিংবা বৃক্ষ-কোটরে, যখন শুধু বন্যজীবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আহার

SARIR SHIKSAR ITIHAS
[History of Physical Education]
RATHINDRA KUMAR SEN

প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক ঃ
অদ্রীশ বর্ধন
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী দুর্গা রায়

মূল্য ঃ সাতাশ টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

সমাজ জীবনে শারীর শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সব দেশই আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। একটি সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে সর্ব প্রথমে চাই কর্ম চঞ্চল পরিবেশ। সেখানে কর্মযজ্ঞের সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কর্মীর, যারা শ্রমে ক্লান্ত নয়, দেহভারে নত নয়, যাদের শরীর সুগঠিত ও পটুতায় ভরা এবং কর্ম-কুশলতা যাদের সম্বল। তাই আজ দেশে দেশে শারীর শিক্ষার প্রসার ও প্রচার এত ব্যাপকতা লাভ করেছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে শারীর শিক্ষার প্রত্যক্ষ দান অপরি-সীম। শুধু শারীরিক দক্ষতা নয়, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেও এই শিক্ষা সহায়তা করে। এমন কি, অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করার জন্যও এর প্রভাব সামান্য নয়। এছাড়া, শারীর শিক্ষা খেলার মাঠে যে শৃংখলা-বোধের জন্ম দেয়—সমাজের সর্বস্তরে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, তার মূল্য সীমাহীন।

ফুটবল খেলায় রেফারির ক্ষুদ্র বাঁশির শব্দে বাইশ জন তাজা যুবকের বিদ্যুৎগতি ও চরম উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ারের সামান্য অঙ্গুলির ইঙ্গিতেই ব্যাট্‌সম্যানকে অবনত মস্তকে মাঠ পরিত্যাগ করতে হয়। খেলার মাঠের এই শৃঙ্খলা শিক্ষা সম্ভবত আর কোথাও নেই।

শারীর শিক্ষাকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য জানতে হবে তার অতীত ইতিহাস। সুদূর অতীতকালে মানব সমাজে শারীর প্রভাব এবং তার ক্রমবিকাশের ধারার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা না জন্মালে বর্তমান কালোপযোগী শারীর শিক্ষার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। শারীর শিক্ষার ইতিহাস রচনা করার সার্থকতা এখানেই।

যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার কাহিনীর অনেকটাই অন্ধকারের পর্দায় আবৃত কিন্তু পৃথিবীর বুকে সেই যুগের লোকেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে রেখে গেছে তাদের জীবন ধারার কিছু চিহ্ন, কিছু ইঙ্গিতবাহী সূত্র। এছাড়া, আধুনিক আদিবাসী ও কয়েকটি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীও সেই অন্ধকার যুগের বুকে কয়েকটি আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করেছে। তারই ফলে আমরা জেনেছি, অনুমান করেছি সেই যুগের কথা যখন মানুষের বাসস্থান ছিল গুহা কিংবা বৃক্ষ-কোটরে, যখন শুধু বন্যজীবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আহার

অন্বেষণের জন্যই শারীর বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। বন্য-জন্তুর তাড়া খেয়ে প্রাণপনে দৌড় এবং তার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে লম্বা লাফ্ দিয়ে খানাখন্দ পার হওয়া, কিংবা উল্টে তাদের পিছনে ছুটে পাথরের ধারালো অস্ত্র নিক্ষেপ করা অথবা মুখোমুখী হাতাহাতি লড়াই—এ সবই ছিল সেই যুগের মানুষের দিন যাপনের অঙ্গ, এবং এরই মধ্যে নিহিত ছিল আধুনিক যুগের দৌড়, দীর্ঘলম্ফ, লৌহ বা বর্শা নিক্ষেপ, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ ইত্যাদির আদিরূপ।

শারীর শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্নযুগে নানা দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শারীর শিক্ষাকে দেখা হয়েছে। সুন্দরের উপাসক কোনও দেশ, রূপকে অপরূপ করা যাদের সাধনা, শারীর শিক্ষাকে তারা ব্যবহার করেছে সুন্দর সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ তৈরি করার কাজে। তাই, তাদের কর্মসূচীতে জিমনাস্টিক ও এ্যাথলেটিক্স প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। আবার কোনও দেশ দেশরক্ষার প্রয়োজনে শারীর শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং, সামরিক শিক্ষার সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য রাখেনি। শক্তি-শালী ও সাহসী সৈন্যদল গঠনের উদ্দেশ্যে তারা বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বা-রোহণ, দলবদ্ধ মার্চিং, রথ চালনা, শিকার, কুস্তি ইত্যাদি শরীর চর্চাকেই বেছে নিয়েছিল। আবার কোনও দেশ শারীর শিক্ষাকে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি এবং প্রায় সবরকম দলগত খেলার ব্যবস্থায় খেলার মাঠ প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জানার পরিধি বিস্তৃততর হয়, অতীতের ঘটনারাশি তার জ্ঞান ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করে। তারই ফলে, আজ বিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এসে আমরা জেনেছি মানুষের সার্বিক উন্নতির পরম সহায়ক এই শারীর শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষের শুধু শারীর পটুতা ও ক্রীড়া দক্ষতার উন্নতি ঘটায় না, তার সমাজ-বোধকে মানবিক করে, আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং হৃদয়কে উদার করে। শারীর শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার বৃত্ত কখনই সম্পূর্ণ হয় না। সেই সঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, শিক্ষার অন্য সবগুলি শাখাতেই অধিক সফলতা নির্ভর করে শারীর শিক্ষার চর্চায়।

ইতিহাস চলমান। অতীতে শারীর শিক্ষার উপর ভিত্তি ক'রে নির্মিত হয়েছে বর্তমান কর্মসূচীর ইমারত। আর, এই কর্মসূচীর সাফল্য ও অসাফল্যের পরিমাণের পরিমাপ-যন্ত্র পথ নির্দেশ করবে আগামীকালের রূপকারদের।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

প্রিয় পুত্রদ্বয়—অরণ্য ও প্রান্তর এবং
সহধর্মিণী এষা সেনের করকমলে।

অন্বেষণের জন্যই শারীর বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। বন্য-জন্তুর তাড়া খেয়ে প্রাণপনে দৌড় এবং তার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে লম্বা লাফ্ দিয়ে খানাখন্দ পার হওয়া, কিংবা উল্টে তাদের পিছনে ছুটে পাথরের ধারালো অস্ত্র নিক্ষেপ করা অথবা মুখোমুখী হাতাহাতি লড়াই—এ সবই ছিল সেই যুগের মানুষের দিন যাপনের অঙ্গ, এবং এরই মধ্যে নিহিত ছিল আধুনিক যুগের দৌড়, দীর্ঘলম্ফ, লৌহ বা বর্শা নিক্ষেপ, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ ইত্যাদির আদিরূপ।

শারীর শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্নযুগে নানা দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শারীর শিক্ষাকে দেখা হয়েছে। সুন্দরের উপাসক কোনও দেশ, রূপকে অপরূপ করা যাদের সাধনা, শারীর শিক্ষাকে তারা ব্যবহার করেছে সুন্দর সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ তৈরি করার কাজে। তাই, তাদের কর্মসূচীতে জিমনাস্টিক ও এ্যাথলেটিক্স প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। আবার কোনও দেশ দেশরক্ষার প্রয়োজনে শারীর শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং, সামরিক শিক্ষার সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য রাখেনি। শক্তি-শালী ও সাহসী সৈন্যদল গঠনের উদ্দেশ্যে তারা বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বা-রোহণ, দলবদ্ধ মার্চিং, রথ চালনা, শিকার, কুস্তি ইত্যাদি শরীর চর্চাকেই বেছে নিয়েছিল। আবার কোনও দেশ শারীর শিক্ষাকে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি এবং প্রায় সবরকম দলগত খেলার ব্যবস্থায় খেলার মাঠ প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জানার পরিধি বিস্তৃততর হয়, অতীতের ঘটনারাশি তার জ্ঞান ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করে। তারই ফলে, আজ বিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এসে আমরা জেনেছি মানুষের সার্বিক উন্নতির পরম সহায়ক এই শারীর শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষের শুধু শারীর পটুতা ও ক্রীড়া দক্ষতার উন্নতি ঘটায় না, তার সমাজ-বোধকে মানবিক করে, আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং হৃদয়কে উদার করে। শারীর শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার বৃত্ত কখনই সম্পূর্ণ হয় না। সেই সঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, শিক্ষার অন্য সবগুলি শাখাতেই অধিক সফলতা নির্ভর করে শারীর শিক্ষার চর্চায়।

ইতিহাস চলমান। অতীতে শারীর শিক্ষার উপর ভিত্তি ক'রে নির্মিত হয়েছে বর্তমান কর্মসূচীর ইমারত। আর, এই কর্মসূচীর সাফল্য ও অসাফল্যের পরিমাণের পরিমাপ-যন্ত্র পথ নির্দেশ করবে আগামীকালের রূপকারদের।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

প্রিয় পুত্রদ্বয়—অরণ্য ও প্রান্তর এবং
সহধর্মিণী এষা সেনের করকমলে।

সূচীপত্র

আদিম যুগের শরীর চর্চা

লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে যখন পৃথিবীতে মানুষের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব হলো তার অনেক আগেই কিন্তু অন্যান্য প্রাণিরা এখানে বিচরণ করতো। মানুষের আগমন প্রায় সকলের পরে অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, মানুষই প্রথম মগজের সার্থক ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীকে নিজের বাস-যোগ্য করে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম ও মহত্তম ঘটনা মানুষের আবির্ভাব। অতএব, এই আবির্ভাবকে জ্যোতির্ময় বলবো না তো কী বলবো ?

মানুষের আগমনেই সার্থক ও ধন্য হয়েছে পৃথিবী। মানুষ না এলে কে ঘোষণা করতো পৃথিবীর মহিমা ? কে জানাতো ধরণীর ধূলিকণাকে শ্রদ্ধার নমস্কার ? কে বলতে পারতো ধরিত্রীকে ধাত্রী ?

পৃথিবীর প্রথম যুগে প্রকৃতি কিন্তু আজকের মতো শান্ত ছিল না। ঋতুর আবর্তনে এমন শৃংখলা ছিল না। মাঝে মাঝেই ভূমিকম্পের নাড়া খেয়ে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যেত, গভীর সব গহ্বরের সৃষ্টি হতো। প্রায়ই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে লাভার প্লাবনে পুড়ে ছারখার হতো সবুজ ঘাসের উপত্যকা। আবার কখনও কখনও আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘন-ঘটায় সুরু হতো বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। বিরামহীন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই ধারাবর্ষণে বিপর্যস্ত হতো মানুষের জীবন। জল প্লাবনে সব কিছুই ডুবে যেত জলের তলায়। এছাড়া, ছিল প্রবল দাবানল। গভীর অরণ্যে মাঝে মাঝে বজ্রপাতে আগুন লেগে গাছপালা সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষ এবং অন্যান্য সব প্রাণিরাই প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ-পণে ছুটে পলায়ন করতো বন থেকে বনান্তরে গিয়ে আশ্রয়ের আশায়। আবার যখন সুরু হতো অবিরত তুষারপাত তখন ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শে অনিবার্যভাবে অকালে প্রাণ হারাতো।

প্রাচীন যুগের এই মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষেরা কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেছিল। মাটির নীচে খুঁজে পাওয়া এদের মাথার খুলি ও দাঁতের জীবাশ্ম নৃতত্ত্ববিদেরা কার্বন-১৪ এবং পটা-সিয়ম আর্গন পদ্ধতির সাহায্যে তাদের বয়স, দেহের উচ্চতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতিও নির্ণয় করেছেন।

নীচু কপাল আর বড়ো চোয়ালযুক্ত এই মানুষদের সরু সরু আঙ্গুলে যথেষ্ট শক্তি ছিল। আগুনের ব্যবহার যে অজানা ছিল না, কিছু ছাইয়ের গাদার সন্ধান থেকে তাও প্রতীয়মান হয়। অরণ্যে দাবাগ্নি থেকে জ্বলন্ত গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে গুহার সামনে তারা জড়ো ক'রে রাখতো। তারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে জানতো না কিন্তু রাত্রে কোনও গুহায় কিংবা চারপাশে পাথর দিয়ে ঘেরা কোনও জায়গায় আশ্রয় নিত। শুধু তাই নয়, সেখানে আচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করে নিত। রাত্রির জমাট অন্ধকারে হিংস্র জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এইরকম ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করতো। তাদের জীবন যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে ছিল দেহের শক্তি, সামর্থ্য, গতিবেগ ইত্যাদি শারীর বিদ্যার ব্যবহার। তারপর যখন কাঁচা মাংস ছেড়ে আগুনে পুড়িয়ে মাংস খেতে শিখলো তখন তাদের চোয়াল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেল, কারণ নরম মাংস খেতে ততটা চোয়ালের জোরের দরকার নেই। শুধু তাই নয়, সিদ্ধ মাংস খাওয়ার ফলে তাদের মগজের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল।

দু'টি তুষার যুগ সমাপ্তির পর বরফের পরিমাণ এবং শীতের প্রকোপ হ্রাস পেল। তখন পৃথিবীতে বলিষ্ঠ দেহধারী লম্বায় পাঁচ ফুটের মতন এক রকম মানুষ বাস করতো। তারা পরবর্তী যুগের সুসভ্য মানুষের মতন একেবারে সোজা হয়ে হাঁটতো। বন্য জন্তু শিকার ছিল এদের খাদ্য ও দেহাবরণের জন্য। চামড়ার মধ্যে গোলাকার পাথর বেঁধে একরকম অস্ত্র তারা তৈরি করতো। আবার গাছের লম্বা ডালের মাথায় ছুঁচালো পাথর বসিয়ে বানাতো একরকম অস্ত্র, যাকে অনায়াসে বর্শা বলা যায়। শুধু বনের জন্তু নয়, নদী থেকে মাছ গেঁথে তোলার জন্যও এই বর্শা ব্যবহৃত হতো। এইসব অস্ত্র নিক্ষেপ করার জন্য বিশেষ ধরণের শারীর বিদ্যা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন ছিল। এই বিদ্যা একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিত।

এরা খাদ্য ও জীবন ধারণের জন্যই বিভিন্ন বন্যজন্তু শিকার করতো। জন্তু জানোয়ারের চামড়া দিয়ে পোষাক এবং বাসোপযোগী ছোট ছোট তাঁবুর মতন আস্তানা তৈরী করেছিল।

শিকারের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল দৌড়, বর্শা নিক্ষেপের কৌশল, লাফানো এবং নানারকম শারীর কৌশল। সুতরাং বাঁচবার তাগিদেই শরীরে শক্তি সঞ্চয় করা অপরিহার্য ছিল। দুর্বলেরা ছিল সমাজের আগাছা।

তারপর কেমন করে কেউ জানে না, কোন অজানা রহস্যময় কারণে এই

সব যুগের মানুষেরা পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেল। হয়তো, সুদীর্ঘকাল ব্যাপি অবিরাম কোনও তুষার পাতে কিংবা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে, বিপর্যয়ে বা অনাহারে।

এদের নামকরণ হয়েছে, কখনও জাভা মানুষ, কখনও পিকিং মানুষ, কখনও নিয়ানডার্থাল ইত্যাদি।

মানুষের ধারাবাহিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় এখনও অস্পষ্টতায় ঢাকা। মাঝে মাঝে একেবারেই ফাঁকা। পরবর্তী যুগে আবার কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের বাসস্থান ছিল গুহা। এদের শিকারের হাতিয়ার যদিও ছিল পাথর, কিন্তু সেই পাথর তারা ধারালো করে নিয়েছিল। স্পেনের আলতামিরা পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে এই যুগের মানুষের কিছু ছবির সন্ধান মিলেছে। সম্ভবতঃ এরাই পৃথিবীর প্রথম শিল্পী। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে এই যুগের মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীর কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

শারীর বিদ্যাই ছিল শিল্পীদের প্রধান বিষয়বস্তু। শিকারের নানা ভঙ্গী ও হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার বিভিন্ন অস্ত্র ছিল শিল্প কর্মের প্রধান বিষয়বস্তু। এছাড়া কিছু বন্যজীবের মূর্তিও এঁকেছিলেন শিল্পীরা। এর থেকে বেশ বোঝা যায়, সেকালে শারীর বিদ্যা ছিল মানুষের জীবনের প্রায় সবটাই জুড়ে। তাই শিল্পীর কল্পনাও ছিল এতেই প্রায় সীমাবদ্ধ।

সুদীর্ঘ তিনটি তুষার যুগের পরিসমাপ্তির পূর্ব থেকেই নিরবচ্ছিন্ন হিমশীতল আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে সুরু করেছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল দেখা দিতে লাগলো। তখন মেঘ ছিল অভিশাপ নয়, বৃষ্টির আশীর্বাদ। সূর্য ছিল উত্তাপের মরণ জ্বালা নয়, স্নিগ্ধতার নরম স্পর্শ। নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের ধারে ধারে জন্মানো কত নিবিড় অরণ্য। তখন জন্তু জানোয়াররা আশ্রয় নিল অরণ্যের গভীরে, অন্ধকারের আড়ালে। মৎস্য ও পশুপাখি শিকারের আশায় ও খাদ্যের সন্ধানে মানুষ জলাশয়ের কাছে সবুজ অরণ্য অঞ্চলে বাস করা সুরু করলো। এই সময় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিরা একই সঙ্গে বসবাস করতো। পূর্বের মতো তখনও মানুষের জীবন যাত্রায় ছিল খাদ্যান্বেষণ ও আত্মরক্ষাই সর্বপ্রধান কাজ। আর এই রকম জীবন যাপনে শরীরের ক্ষমতাই ছিল তার সবচেয়ে বড়ো সম্বল। কখনও হায়নার তাড়া খেয়ে বনের আঁকাবাঁকা সরুপথ পেরিয়ে মুক্ত প্রান্তরে বুকের উপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। দৌড়ের

মাঝে খানাখন্দ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘলাফে অতিক্রম। আবার দমে ঘাটতি পড়লে তাড়াতাড়ি কোনও লম্বা সরু গাছে তর্‌তর্‌ করে বেয়ে ওঠা অথবা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখী মুষ্টি যুদ্ধ ও কুস্তির সমন্বয়ে সংগ্রাম। কখনও বা বাঁশের বাখারির সম্মুখ ভাগ কেটে সরু করা কোনও অস্ত্র হাতে নিয়ে চুপ করে নদীর তীরে ধৈর্য ধরে বসে থাকা, আর স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা কোনও বড়ো মাছের গায়ে সেটা বিঁধিয়ে পাড়ে টেনে তোলা। হয়তো বা কখনও গাছের ডালে উঠে অন্যমনস্ক এক নীলপাখি ধরা কিংবা বুনো লম্বা ঘাসের ঝোপের ভিতর থেকে অথবা উঁচু ঢিবির উপর থেকে পাথরের ধারালো অস্ত্রের অতর্কিত অব্যর্থ নিক্ষেপে জন্তু শিকার।

মানুষের প্রথম পোষমানা জীব মুরগী ও শূকর। এদের বাচ্চাদের নিয়ে আদিম যুগের মানব শিশুরা প্রায়ই নানা খেলায় মত্ত থাকতো। খেলা মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। তাই, না শেখালেও শিশু তার আপন উদ্ভাবন ক্ষমতায় কিছু কিছু খেলা বানিয়ে নিত। এছাড়া মাটির তলা থেকে ঐ যুগের পোড়া মাটির তৈরি কয়েক রকম খেলনাও পাওয়া গেছে।

এই নতুন আবহাওয়ার প্রসাদে মানুষের আরেক নতুন জন্ম হলো। আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল করা বৃক্ষের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সেই সব নিবিড় অরণ্য অঞ্চলে মানুষ বাসা বাঁধলো। সঠিক ঋতু আবর্তনের আমেজ, মৃগনাভির গন্ধ, পাতার সবুজ রঙ্, নানা ফুলের স্পর্শ ধীরে ধীরে মানুষের মনে জন্ম দিল তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ভালোবাসা। ভালোবাসার থেকেই সৃষ্টি খেলার। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গেই তো খেলা। তার সঙ্গে খেলাতেই তো আনন্দ।

ইরাকের জাগ্রোস পর্বতের কাছে যে আদিম যুগের কবরটি খুঁজে পাওয়া গেছে তার মধ্যেকার মৃতদেহের উপরে, নীচে, পাশে সর্বত্র ছড়ানো ছিল তার আপনজনদের দেওয়া ফুলের রাশি। অনুমান করি, সেই ফুলের পাপড়ির উপর কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও পড়েছিল। মনের কথা বলার ভাষা তখন ছিল না, কিন্তু মনের কথা বোঝাবার উপায় তো অজানা ছিল না। ভালোবাসার ভাষা ফুল, আর ব্যথার ভাষা অশ্রু—এ তারা জানতো। আমরা ভাবতেই পারি না, স্নেহভালোবাসার মধুর অনুভূতিপুষ্ট এই মানুষগুলো জানতো না কোনও খেলা। তাদের অবসর যাপনের মুহূর্তগুলি কি ছিল ক্রীড়াবিহীন, নিস্পন্দ, বোবা? বনভূমির শ্যাওলার গন্ধে ভরা সংকীর্ণ সর্পিল পথ দিয়ে ঘন ঘাসের বন পার হয়ে, শ্বাপদদের

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে সেই সব মোহময় গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর সমতল প্রান্তরে যখন দলে দলে মানুষ এসে উপস্থিত হতো তখন কি আর তারা একে অপরের সঙ্গে অথবা একদল অন্যদলের কোনও না কোনও খেলায় না মেতে থাকতে পারতো ? মাঠের টান উপেক্ষা করে তারা পা গুটিয়ে বসে থাকতো এ হতেই পারে না। তবে, কী ছিল তাদের খেলার পদ্ধতি ও সামগ্রী তা জানার আজকে কোনও উপায় নেই। কিন্তু তাদের মনোজগতের কিছু স্পষ্ট ছবি কি ইঙ্গিতে বলে দেয় না যে, কোনও কোনও ঝক্‌ঝকে আশ্চর্য সকালে আর বিকেলের বিলীয়মান আলোয় নানা খেলার আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়ে বেঁচে থাকার এক নতুন অর্থ তারা খুঁজে পেত ?

তারপর কালস্রোতের অনেক ঢেউয়ের পরে এলো শরীর চর্চা ও শারীর শিক্ষা। জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষ বিনা চেষ্টায় আগেই অর্জন করেছিল শক্তি, গতি ও সহন ক্ষমতা। এবার পিতা অথবা দলনেতার কাছে শিক্ষা পেল ধনুর্বিদ্যা, গদা যুদ্ধ, বর্শা নিক্ষেপ, অস্ত্র ও নৌকা নির্মাণ বিদ্যা কেমন করে বনপথ ধরে বন্যজন্তুর অনুসরণ করতে হয় তাও শেখানো হতো। আর শিক্ষণীয় ছিল, আসল যুদ্ধের অনুকরণে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। বস্তুত, তখন শিক্ষা মানেই ছিল শারীর শিক্ষা।

তারপর মানুষ নিজের বুদ্ধির সার্থক প্রয়োগে আবিষ্কার করলো সভ্যতার পরম ঐশ্বর্য কৃষিকার্য। শক্ত পেশী ও লাঙ্গলের মিলিত প্রয়াসে মৃত্তিকা মানুষকে যে অকৃপণ অর্ঘ্য দিল তার ফলে আহারের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে, বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। অর্থাৎ কমলো ভ্রমণ, বাড়লো অবসর। তাই আসর জমলো খেলার। সুরু হলো দৌড়, পাথর ও বর্শা নিক্ষেপ ও আরও কত বিষয়ের প্রতিযোগিতা। আর, প্রতিযোগিতা মানেই জয় পরাজয়ের খেলা, উত্তেজনায় দোলার আনন্দ এবং সেই সঙ্গে শৃঙ্খলাবোধের উজ্জ্বল উন্মেষ। সর্বোপরি, নিজেকে প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ।

নিজেকে প্রকাশের প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালের। মানুষ জানে, ফুলের কুঁড়ি হয়ে থাকায় সুখ নেই। পাপড়ি মেলে, গন্ধ ছড়িয়ে, রঙ্‌ মেখেই আনন্দের আস্বাদন। আর, কালো মেঘে জল হয়ে জমে থাকায় আছে বন্ধন। বর্ষণে বর্ষণে শুকনো ফাটা ভূমিকে উর্বর করায় আর গাছের পাতা ধুয়ে ধুয়ে সবুজ করায় আছে মুক্তির তৃপ্তি। অর্থাৎ, সংকোচন নয়, চাই উন্মোচন। এবং এর দ্বারাই দ্বার খুলে যায় সভ্যতার অগ্রগতির।

শরীর চর্চার এক মনোহর মাধ্যম নৃত্যের ছন্দে ও দোলায় একদিন দেখা গেল মানুষের এক সুপ্ত প্রতিভার দীপ্ত বিকাশ। নৃত্যের উৎস প্রকৃতি। ঝড়ো হাওয়ায় নারকেল বনের দোল, কৃষ্ণ আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক্, নদী-তরঙ্গের দোলা ও ঊর্ধ উৎক্ষেপ মানুষকে শিখিয়েছে নৃত্যের নানা ভঙ্গী ও মুদ্রা।

অগ্নি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি মাঝে মাঝে মানুষের জীবন যাত্রায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই, বড়ো ভয় ছিল এইসব ভয়ংকরের রুদ্র আবির্ভাবকে। শুধু তাই নয়, এইসব শক্তির প্রত্যেকটির পিছনেই আছে একজন দেবতার প্রত্যক্ষ প্রভাব—এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধেছিল মানুষের মনে। অতএব, অদৃশ্য এই দেবতাদের আশীর্বাদের আশায়, করুণায় কামনায় মানুষ তাঁদের ভোলাবার পথ বেছে নিল রূপে নয়, প্রার্থনায়। নৃত্যের ভঙ্গিমা ছিল সেই প্রার্থনার ভাষা। নিয়মিত নৃত্যের তালে তালে বৃদ্ধি পেল মানুষের পেশীর শক্তি, শরীরের সচলতা আর পেলবতা। দেহ পেল সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ। নৃত্যের ছন্দ মানুষের রক্তে দিল এক প্রচণ্ড দোলা। প্রার্থনা থেকে প্রসারিত হলো নৃত্য সমাজের প্রায় সব অনুষ্ঠানে। ভূমিতে বীজবপন কালে নৃত্য, ফসল ফলাবার আশায়। ফসল তোলার নৃত্য, ফসল হওয়ার খুশিতে। জন্মানুষ্ঠানে নৃত্য, এই ধরায় "সার্থক জনম আমার" এই কথাটা জানাতে। বিবাহকে শুভ ও শুভ্র করতে নৃত্য। আবার মৃতের সম্মুখে মৃত্যুর অমোঘতাকে ঘোষণা করতেও নৃত্য। এ ছাড়া, যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে প্রেরণা সঞ্চার ও যুদ্ধ জয়ের উৎসবকে মুখরিত করার জন্যও নৃত্যানুষ্ঠান ছিল অপরিহার্য।

বিভিন্ন বাদ্য সমন্বিত বিচিত্র নৃত্যানুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী উভয়ের অংশ গ্রহণ ছিল। নৃত্যের সাহায্যে তৎকালীন মানুষের জীবন যাত্রার কিছু ঘটনা ব্যক্ত করার প্রথাও ছিল। যেমন, বন্যজন্তু ও শিকারোদ্যত ব্যাধ।

গ্রীস

ইউরোপের মধ্যে গ্রীসই সর্বপ্রথম আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এশিয়া মাইনর থেকে দূরত্ব বেশি না হওয়ায়—প্রাচ্য সভ্যতার স্পর্শলাভ করার সুযোগ পেয়েছিল গ্রীস। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোমার, সাফো, সফোক্লিস, এ্যারিস্টোফেন্স ইত্যাদি জ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা গ্রীসকে এক উচ্চ সম্মান ও পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যুগ যুগ ধরে তাঁদের চিন্তাধারা পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করে চলেছে। জগতের যতোটা জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায় ও অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় ততোটাই তো মানুষের ব্যাপ্তি। এই মনীষীদের অকৃপণ দান মানুষের ব্যাপ্তিতে নিবিড়ভাবে সাহায্য করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীসে ভাস্কর্য, কাব্য, নাটক, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, স্থপতি বিদ্যা, জিমনাস্টিক প্রভৃতির পীঠস্থান রূপে চিহ্নিত হলো।

গ্রীস ইউরোপকে শিখিয়েছে বিজ্ঞানকে সম্ভ্রম করতে, শিল্পরসে সঞ্চিত হতে এবং মানুষের মুক্তিকে আহবান জানাতে। যাকে আমরা প্রগতি বলি, ইউরোপে তারই জন্ম দিয়েছে গ্রীস।

অন্ধকারের উৎস হতে গ্রীক সভ্যতার এই আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তার ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু। সমুদ্রের নৈকট্য শত্রুকে দূরে রেখেছে আর কাছে টেনেছে দূর দেশের মানুষ ও সভ্যতাকে জলপথে বাণিজ্যের সাহায্যে। আবার স্বল্পায়ু মৃদু শীতকাল এবং সূর্যালোকে প্লাবিত দীর্ঘ শুষ্ক গ্রীষ্ম গ্রীসের জনগণের স্নায়ুতে উদ্দীপনা জাগিয়ে, পেশীতে সচলতা এনে দিয়ে তাদের কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকেনি, বাহিরকে করেছে ঘর। বীজ বপন করে পার্বত্য উপত্যকাকে পরিণত করেছে সবুজ শস্য ক্ষেত্রে। এ্যাথলেটিক্স ও জিমনাস্টিক অভ্যাস করে শরীরকে মজবুত করেছে।

গ্রীক ভাষায় 'এ্যাথলীট'' শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতা, এবং প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সর্বস্তরেই ছিল প্রতিযোগিতা। ক্রীড়াক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সংগীত, রাজনীতি সর্বত্রই ছিল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাধনা। এই সাধনার বলেই গ্রীস প্রগতির পথ রেখা ধরে চলতে পেয়েছিল।

সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেই জয়ী হবার অক্লান্ত প্রয়াস ছিল প্রতিযোগীদের। কারণ বিজয়ীদের প্রাপ্য ছিল সামাজিক সম্মান, এমন কি যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির চেয়েও অধিক অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন তাঁরা পেতেন। কিন্তু তথাপি গ্রীকরা ক্রীড়াকে কখনও পেশাগত দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে কলুষিত করেনি। নির্মল আনন্দ ও সুন্দর শরীর গঠন ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কোনও ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগিতায় নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী বিনা প্রতিবাদে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা প্রতিযোগীদের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে গণ্য ছিল। ন্যায় ও সততা প্রত্যেক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো অসাধু প্রতিযোগীদের প্রাপ্য ছিল বিদ্রূপ। খেলার মাঠ ছিল মহৎ শিক্ষালয়, শরীর চর্চা ও মনোবিকাশের এক উৎকৃষ্ট স্থান।

আমরা যাদের বলি ইতিহাসের ব্যক্তি তার বাইরে কত শত মানুষের জীবন যাত্রার কাহিনী পৃথিবীর বুকে ঘুমিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। অমর মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসির পাতায় পাতায় মহাকবি হোমার লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রীসের প্রাচীন সমাজ জীবন। মহাকাব্য ইতিহাস নয়, এ কথাই বা কে জোর গলায় বলতে পারে? তখন তো আলাদাভাবে কোন ইতিহাস লেখার রীতি ছিল না। সুতরাং হয়তো মহাকাব্যই ছিল ইতিহাস, কিংবা ইতিহাসই মহাকাব্য।

হোমার যুগ ও শারীর শিক্ষা

জ্ঞান ও কর্মের সার্থক বিকাশ হোক মানুষের জীবনে এই ছিল তৎকালীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং শিক্ষায় গৃহীত হয়েছিল ইলিয়াড ও ওডিসির নায়ক যথাক্রমে এ্যাকিলিস্ ও ওডিসিয়াসের চরিত্র চিত্রণ থেকে। একজন কর্ম চঞ্চল, অপরজন জ্ঞানভাস্কর। অর্থাৎ পেশী আর মননের উৎকর্ষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এই দুই বস্তুর সমন্বয় ও উন্নতি সাধন।

গ্রীকদের জীবনের আদর্শ ছিল কোন কিছুই পরিমিত বোধের সীমা ছাড়িয়ে না যাওয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে সর্ব বিষয়ে এই নীতি বজায় ছিল। তাদের মন্দির ছিল নাতি বৃহৎ, কিন্তু গঠনে সুঠাম। পোষাকেও রঙের আধিক্য ছিল না। লম্বা সাদা কোট পরতো বেশি লোক। মজবুত দেহে মানানসই এই পোষাকে তাদের সুন্দর দেখাতো। খাদ্যেও ছিল পরিমিত। রুটি মাংস ও কাঁচা শাক-সব্জি। অর্থাৎ, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ পরিমিত আহার্য।

গ্রীকদের শারীর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের মধ্যেও ছিল পরিমিত বোধের

পরিচয়। ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরকে এক বিশাল মাংস পিণ্ডে পরিণত করায় তাদের উৎসাহ ছিল না। তার পরিবর্তে একটি সবল সুন্দর সুষমান্বিত দেহই ছিল কাম্য। দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিল পেশী, কিন্তু তা বেশি নয়। যেখানে যে পরিমাণ থাকলে শরীর সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে তেমনিই ছিল। ভিন্ দেশের লোক সেই শিল্পময় অনুপম দেহের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হয়তো ভাবতো—একই অঙ্গে এত রূপ! শক্তি ও ক্ষীপ্রতায় ভরা সেই শরীর ক্রীড়াঙ্গনে ও রণাঙ্গনে সমান চলমান ছিল।

অহংকার প্রকাশ পরিমিতি বোধের পরিপন্থী। তাই, একবার যখন স্পার্টার এক কৃতী দৌড়বীর গর্বভরে ঘোষণা করেছিল, একপায়ে সে সকলের চেয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তখন তাকে এই ব'লে শহর থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছিল যে, এ কাজে একটা সামান্য সারস পাখির কাছেও সে হেরে যাবে।

হোমার যুগে জিমনাস্টিক এ্যাথলেটিক্‌স গ্রীক সমাজে খুবই গুরুত্ব লাভ করেছিল। ধর্মানুষ্ঠান এবং কোনও মৃত বন্ধুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেও জিমনাস্টিকের ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য, সেই জিমনাস্টিক প্রদর্শনী খানিকটা নৃত্যভঙ্গীর সাদৃশ্যে পরিকল্পিত ছিল। হোমারের বর্ণনা থেকে মনে হয় এ্যাথলেটিকসের চর্চা মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল রাজপরিবার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। জনসাধারণের দর্শন মিলতো দর্শকের আসনে।

গ্রীসের কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নানারকম ক্রীড়া একের পর অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমেই থাকতো রথচালনা প্রতিযোগিতা। দুই অশ্ব-চালিত রথের সারথি হতেন স্বয়ং রথের মালিক। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা ছিল মুষ্টিযুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুষ্টি কখনও বর্মাবৃত থাকতো, কখনও অনাবৃত। ঘুসিতে ঘুসিতে বিধ্বস্ত হতো উভয়েই। তৃতীয় প্রতিযোগিতা ছিল দন্ডায়মান কুস্তি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যখন শক্ত হাতে একে অপরের কাঁধ ধরে ঠেলাঠেলি করতেন তখন দর্শকরা তাদের পিচ্ছিল প্রশস্ত পৃষ্ঠ-দেশে পেশীগুলির দ্রুত ওঠা নামা লক্ষ্য করতেন। পরাজয় ছিল ভূমিসাৎ হওয়ায়।

অতঃপর ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীরা প্রথমে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় সুরু করে মাঠ চক্কর দিয়ে আবার সেখানেই ফিরে আসতো। সর্বশেষে ছিল বর্শা নিক্ষেপ।

ওডিসি মহাকাব্যে হোমার একটি এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। নায়ক ওডিসিউস ঘুরতে ঘুরতে একবার ফিসিয়ানদের দ্বীপে এসে উপস্থিত হলে সেখানকার রাজা এ্যানিসিনাস্ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করলেন। সেই সভায় রাজা সদ্য-যৌবন প্রাপ্ত যুবকদের আদেশ দিলেন নৃত্য প্রদর্শনের জন্য, ওডিসিউস অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন নৃত্যরত তরুণদের অসাধারণ দ্রুত পদক্ষেপ ও নিখুঁত অঙ্গ ভঙ্গিমার লালিত্য ও শৌর্য।

উৎসবান্তে রাজার নির্দেশে যুবকরা ওডিসিউসের মনোরঞ্জন ষোলো কলায় পূর্ণ করার জন্য তাদের জানা নানা ক্রীড়া দেখাতে লাগলো। দৌড়, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, লাফানো ও ডিসকাস নিক্ষেপে নিজেদের কুশলতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করলো। অবশেষে তারা ওডিসিউসকে আহ্বান জানালো তাঁর নৈপুণ্য দেখাবার জন্য। ঐ যুবকরা যে ডিসকাস নিক্ষেপ করেছিল তারচেয়ে আকৃতিতে বৃহৎ এবং ওজনে অধিক একটি পাথরের ডিসকাস হাতে তুলে নিলেন ওডিসিউস। তারপর সেটা কব্জির মোচড়ে ঘুরিয়ে এত জোরে নিক্ষেপ করলেন যে, শূন্যপথে যাবার সময় সেই ঘূর্ণায়মান প্রস্তরখণ্ড থেকে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল এবং যুবকদের নিক্ষেপের সীমা অনায়াসে অতিক্রম করে আরও অনেক দূরে গিয়ে পড়লো।

এই যুগে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে মানুষকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শরীর ও মনের সর্বরকম উন্নতি সাধনার্থে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিল প্রাচীন এথেন্স। দেবতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন প্রত্যেক এথেন্সবাসীর অবশ্য কর্তব্য ছিল। এথেন্সবাসীদের জন্য শুধু সামরিক শিক্ষাদানই নয়, সেই সঙ্গে মনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ইচ্ছাও জাগানো হতো। শরীর ও মন, যুদ্ধ ও শান্তি—এ সবই ছিল শিক্ষার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য : এথেন্স

এই যুগেই শরীর শিক্ষা পেল তার শ্রেষ্ঠ সম্মান। শিল্পীকুল সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর দেহাবয়বের রূপদান করলেন শিল্পকর্মে। সাহিত্যিক-দের লেখনীতে শারীর শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিচিত্র ঘটনা পেল গল্পরূপ। সংগীতজ্ঞরা নিপুণ ক্রীড়াবিদের জয়গান গাইলেন সুললিত কণ্ঠে। এইভাবে

ভাস্কর্য, চিত্রাংকন, সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে সংযুক্ত হলো শারীর শিক্ষা। এ সম্মান শারীর শিক্ষায় প্রেরণা সঞ্চার করলো। শারীর শিক্ষার সঙ্গে সুন্দরের এই সহাবস্থান ছিল এথেন্সের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জিমনাস্টিক ও এ্যাথলেটিকসের নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতা, নৃত্য এবং অলিম্পিকের আসরে ধীরে ধীরে এথেন্সের যুবকরা পেল মুক্তির আস্বাদ। ক্রীড়া প্রাঙ্গণেই যে অন্য দেশের সঙ্গে এক সুরে বীণার তার বাঁধা যায়, কন্ঠ মিলিয়ে ঐক্যের গান গাওয়া যায়—এই ভাবনা ও চেতনার জন্মস্থানের নাম এথেন্স।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এথেনীয়রা কিন্তু কোনও প্রতিযোগিতাতেই শক্তি, গতি ও সামর্থ্যের রেকর্ড স্থাপন বা জয়লাভকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়নি। কেননা তাদের মন ছিল উচ্চ শিল্প-রসে সিঞ্চিত। সুতরাং, প্রতিযোগী তাঁর ক্রীড়ায় কতখানি লাবণ্য সঞ্চারে সমর্থ হলো এবং তার নিপুণতার সূক্ষ্মতা শিল্পসম্মত কিনা, এই সব বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। শারীর শিক্ষার ফসল যেন সকল শিল্পের মতন সব দিক দিয়ে তার ভারসাম্য বজায় রাখে, কেননা বল্গাহীনতা কখনও শিল্পে সুষমা আনে না। এই কারণেই এথেন্সে শারীর সৌন্দর্যের আদর ছিল, কদর ছিল। একমাত্র অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল মেদ বহুল অপটু শরীর ধারণ করে বিচরণ করা। এরা ছিল সমাজে সকলের উপহাসের পাত্র।

এথেন্সের শারীর শিক্ষা শুধু সৌন্দর্যকেন্দ্রিক ছিল তাই নয়, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল বিভিন্ন মানবিক গুণ। সংযম, সাহস, বিনয়, মনোবল এবং খেলোয়াড় সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী শারীর শিক্ষার কর্ম-সূচীর মাধ্যমে বালকদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হতো। সুতরাং, তৎকালীন এথেন্সের শারীর শিক্ষা ছিল শক্তি ও বিনয়ের সমন্বয়। বলা যায়, শাক্ত আর বৈষ্ণবের বৈভবে সমুজ্জ্বল। প্যালেস্ট্রা ও ডিকাসকেলিয়াস এই দুটি ছিল এথেন্সের মূল শিক্ষা কেন্দ্র। প্রথমটিতে শারীরশিক্ষা ও দ্বিতীয়টিতে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল সাহিত্য, সংগীত ও গণিত। কোনও কোনও প্যালেস্ট্রার চতুর্দিকে ঘর ও মাঝখানে খোলা জায়গায় কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ এবং নানারকম জিমনাস্টিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ঘরগুলি শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছদ পরিবর্তন, তৈল মর্দন ও স্নানের জন্য ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া,

প্যালেস্ট্রা ও
ডিকাসকেলিয়াম

নানরকম ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈল পাত্র এই সব ঘরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। তেলের চাহিদা খুব বেশি ছিল, কারণ পেশীকে নমনীয় করার জন্য তেল মালিশ করার প্রথা ছিল। প্যালেস্ট্রাতে কুস্তিরও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীদের ক্রীড়াধারা সঠিক পথে চালনা করার জন্য প্রত্যেক প্যালেস্ট্রাতেই একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক থাকতেন। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজস্ব প্যালেস্ট্রা চালাতেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দক্ষিণা ধার্য করে। প্যালেস্ট্রাতে বার্ষিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হতো। হাতে একটা লম্বা ছড়ি নিয়ে এই শিক্ষকরাই রেফারির কাজ করতেন। প্রতিযোগীরা কোনও রকম নিয়ম লঙ্ঘন করতে উদ্যত হওয়া মাত্র তাদের শরীরে ছড়ির খোঁচা দিয়ে তিনি সতর্ক ক'রে দিতেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ দান করা হতো।

প্যালেস্ট্রার লাগোয়া প্রান্তরে লাফানো, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ এবং নিয়মিত দৌড় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোনও কোনও বৃহৎ প্যালেস্ট্রাতে সন্তরণ শিক্ষার জন্য পুকুরও ছিল।

প্যালেস্ট্রাতে মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির সমন্বয়ে একটি দ্বৈত সংগ্রামের খেলা প্রচলিত ছিল। তার নাম প্যানক্রেসিয়াম। এই মারাত্মক খেলায় একজন অঙ্গুলি নির্দেশে পরাজয় বরণ করলে তবেই বিচারক ক্রীড়ার প্যানক্রেসিয়াম সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। বর্তমান যুগের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও অমিল ছিল অনেক। চক্ষু, কর্ণ, গলা কোথাও অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা নিষিদ্ধ ছিল। দংশনও ছিল নিয়ম বিরুদ্ধ। অবশ্য, লাথিমারার অনুমতি ছিল। বর্তমান ফ্রি-স্ট্রাইল কুস্তির মতন পাদমূল শক্ত ক'রে ধরে মোচড় দেওয়া হতো এবং স্বেচ্ছায় হার স্বীকার না করা পর্যন্ত চলতো মোচড়ের পর মোচড়। এই প্যাঁচের নাম ছিল ডাম্বেল-কৌশল। প্যানক্রেসিয়ামে ল্যাডার ট্রিক বা মইয়ের কৌশল নামে আর এক রকমের প্যাঁচ ছিল। একজন চট্ ক'রে আর একজনের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে তার শরীরটাকে খুব শক্ত করে ধরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করতো। সেই সঙ্গে চলতো ঘাড়ে ও গলায় সাঁড়াশির মতন ক'রে দুই বাহুর প্রবল পিষ্টন। এই দ্বৈত চাপ সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে অঙ্গুলি নির্দেশে পরাজয় বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রেফারি তখন কাল বিলম্ব না ক'রে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করতেন।

একদা এক প্রতিদ্বন্দ্বী এইভাবে পরাজয় বরণের চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয়

ভেবে অঙ্গুলি নির্দেশ না ক'রে দম বন্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দেয়। গভীর বেদনাদায়ক এই মৃত্যুতে সেদিন সমগ্র ক্রীড়া প্রাঙ্গণে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল।

তৎকালীন জিমনাসিয়ামের সঙ্গে সাধারণত প্রশস্ত প্রান্তর আর তার সঙ্গে লাগোয়া থাকতো কয়েকটি মাঝারি এবং একটি বড়ো হল ঘর। মাঠে সব রকম এ্যাথলেটিক্স চর্চা এবং কয়েকটি খেলার ব্যবস্থা ছিল। জিমনাসিয়াম স্নানাগারও ছিল ব্যায়ামান্তে ব্যবহারের জন্য। কোনও কোনও জিমনাসিয়ামের অঙ্গীভূত ছিল প্যালেস্ট্রাও। সেখানে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল কুস্তি। অবশ্য, গ্রীক ভাষায় প্যালেস্ট্রা শব্দটি কুস্তির অর্থই বহন করে। শরীরের শক্তি, সচলতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য কুস্তিই সবচেয়ে উপযোগী মনে করা হতো।

সাধারণত, নদীর নিকটবর্তী স্থানই মনোনীত হতো জিমনাসিয়াম স্থাপনের জন্য। কারণ সেখানে জল সহজলভ্য এবং বড়ো বড়ো গাছ ছায়া মেলে ধরতো। শহরের উপকণ্ঠই ছিল এর উপযুক্ত স্থান। সব সাধনাতেই নির্জনতাই তো সর্বজনের পছন্দ।

এথেন্সের তিনটি বৃহৎ ও বিখ্যাত জিমনাসিয়ামের নাম আকাদেমি, লাইসিয়াম ও সাইনোসারগাস। যেহেতু এথেন্স শরীর ও মনন চর্চা দ্বারা শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দানের পক্ষপাতী, তাই জিমনাসিয়ামে শারীর শিক্ষার সঙ্গে দর্শন ও সাহিত্য অনুশীলনও চলতো। বাস্তবিক পক্ষে, এই তিনটি জিমনাসিয়ামের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল সেখানে তিন দিক্‌ পাল দার্শনিকের প্রায় নিয়মিত উপস্থিতি। আকাদেমিতে প্লেটো, লাইসিয়ামে এ্যারিস্টটল ও সাইনো সারগাসে এ্যান্টিসথেনিস। আর, এঁদের আগমন মানেই আলোর বিকিরণ, চেতনার উন্মোচন।

এই তিনটি জিমনাসিয়ামের মধ্যে আকাদেমি ও লাইসিয়ামের আয়তন ছিল বিশাল। সেখানে অশ্বচালনা ও সামরিক প্যারেড অনুশীলনেরও স্থান ছিল।

পুরুষ নাগরিকদের জীবনে যথেষ্ট অবসর ছিল। তাঁরা এই সব জিমনাসিয়ামে অনেকটা সময় অতিবাহিত ক'রে জীবনকে তাৎপর্যময় করে তুলতেন।

এথেন্সের মেয়েরা কিন্তু বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত গৃহেই অবস্থান করতেন। গৃহের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনই ছিল তাঁদের কর্মের মধ্যে মুখ্য। মূর্খও বলা যেতে পারে তাঁদের, কারণ অক্ষর জ্ঞানে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন। কোনও

শারীর শিক্ষাও তাঁরা পেতেন না। অবশ্য, ক্রীতদাসীদের মধ্যে কেউ কেউ নৃত্য ও কঠিন শারীর ক্রিয়ার পারদর্শিতা প্রদর্শন ক'রে ভোজ সভায় পুরুষদের মনোরঞ্জন করতেন এমন নজির আছে।

এথেনীয়রা পঞ্চাশের চেয়েও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ করতো। তার মধ্যে লাট্টু খেলা হোমার যুগ থেকেই ছিল শিশুদের প্রিয় খেলা। নীল আকাশের বুকে ঘুড়ি ওড়ানো আর সমতল রাজপথের উপরে কাঠের চাকা গড়ানো, এই দুই খেলাতেই বালকরা খুব আনন্দ পেত। আর, ঘুড়ি যখন ছিল তার সঙ্গে "ভোকাট্টাও" হয়তো ছিল। দোলা খাওয়ার সুখ থেকেও শিশুরা বঞ্চিত ছিল না। গাছের ডালে দড়ি বেঁধে শিশুরা দোল খেতে খেতে হাসতো, কেউ ফোকলা দাঁতে, কেউবা বিনা দাঁতে। খেলা শুধু বাইরে নয়, ঘরে বসে খেলার জন্যও ছিল রঙ্‌চঙে কত রকম মাটির পুতুল—ঘোড়া, হাতি, গাড়ী, সৈন্য আরও কত কী! আবার কাঠের রণপায়ে চড়ে বড়দের সঙ্গে ছোটরাও যোগ দিত।

খেলাধূলা ও এ্যাথলেটিক্‌স

সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করা মাত্রই প্যালেস্ট্রাতে প্রেরণ করা হতো শিশুদের। সেখানে তারা হাতের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রজ্জু বেয়ে ঊর্ধ্বগমন, পায়ের জন্য ব্যাঙের লাফ এবং দম, ক্ষীপ্রতা ও শারীর পটুতার জন্য দৌড় ঝাঁপে লিপ্ত থাকতো। তারা রপ্ত হতো ছোট মাপের বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপেও। অবশ্য, বারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সব ব্যায়ামই ছিল কিঞ্চিৎ লঘু মাত্রার। এই সময় থেকেই তাদের শরীরের গঠনকে সুঠাম করার প্রতি প্যালেস্ট্রার প্রশিক্ষকের লক্ষ্য ছিল মুখ্য। এইভাবে পাঁচ বছর নানারকম ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরকে সচল ও পরবর্তী কঠিনতর ব্যায়ামের উপযোগী করে নেওয়া হতো। সেই ব্যায়ামগুলি হলো কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, প্যানক্রেসিয়াম, রথচালনা ইত্যাদি। তার সঙ্গে দৌড় ঝাঁপ বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপের চর্চা ছিল বিশেষভাবে। শুধু শরীর গঠনে নয়, বিভিন্ন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণেও সাহায্য করতো এই শারীর শিক্ষার চিন্তা প্রসূত কর্মসূচী।

বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের অনুপ্রেরণায় এথেন্সে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠান শারীর শিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়ক ছিল। সেই অনুষ্ঠানে এ্যাথলেটিক্‌স, সঙ্গীত, নাটক, কাব্য, শিল্প প্রভৃতির প্রতিযোগিতা ছিল। তবে এ্যাথলেটিক্‌সের জৌলুসই ছিল সর্বাধিক। সুতরাং, দৌড় ঝাঁপ ও নিক্ষেপের বিজয়ীরাই অধিকাংশের সপ্রশংস দৃষ্টিতে নন্দিত হতেন।

ইতিহাস বলে, গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এথেন্স এ্যাথলেটিকসের পারদর্শিতায় সর্বোত্তম ছিল না, কিন্তু আয়োজিত প্রতিযোগিতার সংখ্যায় ও বৈচিত্রে এবং তার প্রতি আকর্ষণে এথেন্সের জুড়ি ছিল না। এথেনীয়রা কাতারে কাতারে, হাজারে হাজারে উপস্থিত হতো এইসব অনুষ্ঠানে প্রতি-যোগী অথবা দর্শক হিসাবে। সেখানে সঙ্গীতের সুর সমুদ্রে অবগাহনে তারা হতো পবিত্র, নাটকের হাসি-কান্নায় উদ্বেলিত আর এ্যাথলেটিকসের জয় পরাজয়ে হর্ষ বিষাদের আনন্দ গায়ে মেখে তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতো।

স্থানীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও চারটি জাতীয় উৎসব ছিল। গুরুত্বের বিচারে এগুলি ছিল সবার উপরে। অলিম্পিক, ইস্থামিয়ান, পাইথিয়ান ও নিমিয়ান নামে চিহ্নিত ছিল এই চারটি উৎসব। প্রথম পর্যায়ে এই উৎসবগুলিতে ধর্মের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক এবং তদনুসারে দেবতার চরণে বলিদান প্রথা ছিল এর অন্যতম অনুসঙ্গ। ক্রমশঃ, এ্যাথ-লেটিকসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শুধু মাত্র উদ্বোধন কর্মসূচীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

বলাই বাহুল্য, এই চারটি উৎসবের মধ্যে অলিম্পিকই ছিল গুরুত্বে ও উৎকর্ষে শীর্ষে। অলিম্পিয়াতে প্রতি চার বছর অতিক্রান্তে আগস্ট মাসের রৌদ্র করোজ্জ্বল পাঁচটি দিনে এই আনন্দ আসর বসতো। দেবতা অলিম্পিক জিউসকে স্মরণ ক'রে এবং কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদিত হতো। যদিও গ্রীসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ সংঘটিত হতো এবং অসদ্ভাবের অভাব ছিল না তথাপি অলিম্পিকের প্রাঙ্গণ ছিল সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। সেখানে হাত বাড়ালেই বন্ধু। সব কথাই প্রীতির কথা। সব জনই আপন জন।

গ্রীসের সবগুলি রাজ্যের কৃষক থেকে ধনবান, সর্বশ্রেণীর লোকের অবিরাম স্রোত এসে থামতো অলিম্পিকের আসরে। রঙ বেরঙের তাঁবুতে ব্যবস্থা হতো তাদের আস্তানার। নানা সাজ পোষাকে সজ্জিত এই লোকেরা পাঁচ দিন ব্যাপি অলিম্পিকের প্রাণ প্রাচুর্যের খেলার মেলায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত। এই পুণ্যতীর্থ, সকলের বিত্ত পূর্ণ ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন পথে মশাল জ্বালিয়ে দিত।

অলিম্পিকের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও গাথা প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে যুক্তি সঙ্গত মনে হয় রাজা ইফিসিয়াসের কাহিনী।

এলিসের রাজা ইফিসিয়াস বিভিন্ন গ্রীক রাজ্যের নিয়ত সংঘর্ষ আর বিবাদে বড়ই বিষন্ন বোধ করেছিলেন। একই আবহাওয়ায় যাদের জীবন যাপন, একই ভাষায় কথন বচন, তাদের কি সাজে নিত্য যুদ্ধ? তাই রাজা ইফিসিয়াস আহবান জানালেন অলিম্পিকের আলো জবালাতে। আশা ছিল, খেলার মাঠের সবুজ ঘাস এনে দেবে ভ্রাতৃবন্ধন, যে বন্ধনে আছে মুক্তির আস্বাদন।

দেবতা জিউসের বেদী থেকে পেলপসের সমাধি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে সুরু হয়েছিল দৌড়ের প্রতিযোগিতাগুলি। তিন রকমের দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল। কম দূরত্ব, মাঝারি দূরত্ব ও দূর পাল্লার দৌড়। কম দূরত্ব মানে প্রায় ২০০ গজ, মাঝারি তার দ্বিগুণ আর দূর পাল্লা প্রায় ৫০০ গজ। তৎকালীন দৌড়বীররা এখানকার মতন নীচু না হয়ে প্রায় সোজা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় সুরু করতো।

দর্শকের আসন ছিল ঘাসের উপর এবং উঁচু ঢালু মাটির ঢিবির উপর। সেখান থেকেই তারা প্রতিযোগীদের দৌড়ের গতিবেগ নিরীক্ষণ ক'রে স্পন্দিত হতো আর উচ্চকণ্ঠে উৎসাহ দান করতো। মনে রাখা প্রয়োজন, যে কোনও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেই দর্শকদের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারা সামান্য নয়। দর্শকদের সামনে নিজেদের গুণের রাশি মেলে ধরার জন্যই প্রতিযোগীদের দীর্ঘ সাধনা এবং দর্শকদের স্বীকৃতিতেই তাদের সার্থকতা।

প্রথম যুগে অলিম্পিকে শুধু কয়েকরকম দৌড় ছিল একমাত্র প্রতিযোগিতার বিষয়। তারপর ধীরে ধীরে যুক্ত হয় অন্যান্য বিষয়ের প্রতিযোগিতা। এলো কুস্তি, মুষ্ঠিযুদ্ধ, প্যানক্রেসিয়াম, পেণ্টাথলন প্রভৃতি। তখন কুস্তি ছিল দণ্ডায়মান অবস্থায়। তিনবার একজন ভূমিসাৎ হলেই পরাজয়। শরীরে তেল মেখে আর বালি ছিটিয়ে কুস্তিগীররা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতো। মুষ্টিযোদ্ধারা হাতে দস্তানা ব্যবহার করতো না। তার পরিবর্তে দশ বারো ফুট লম্বা চামড়ার দড়ি জড়ানো থাকতো আঙ্গুল, মুষ্টি এবং কব্জিতে। শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকতো মুক্ত। এই আবরণের নাম ছিল কেস্টাস। সহজেই অনুমেয়, এই রকম মুষ্টির এক একটি আঘাত কিরকম প্রচণ্ড ছিল। আধুনিক মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য বিস্তর। কোনও নির্দিষ্ট রিং ছিল না, গোলাকারে দণ্ডায়মান দর্শকরাই ছিল সীমা রেখা। দেহের ওজন অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণত, যারা ওজনে বেশি ভারি তারাই

মুষ্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো। পরাজয়ের নিয়মও ছিল স্বতন্ত্র। ক্লান্ত হয়ে অথবা ঘুসিতে ঘুসিতে বিধ্বস্ত হয়ে হাত তুললে তবেই পরাজয়।

অলিম্পিকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও নানারকম ক্রীড়া বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলো। তার মধ্যে শিঙ্গাধ্বনি দিয়ে সুরু করা রথ চালনা প্রতিযোগিতায় ছিল বেগ আর আবেগের চাঞ্চল্য। চারটি বলবান ক্ষীপ্রগতি অশ্বে টানা দুই চক্রযুক্ত রথ প্রবল বেগে তেইশ চক্কোর ঘুরে আসতো। এই প্রতিযোগিতায় দেখা যেত সারথির নিপুণতা ও সাহস। তবে প্রায়ই ঘটতো রথে রথে সংঘর্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে সারথির পতন ও মূর্চ্ছা।

অলিম্পিকের প্রথম যুগে বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী যথা, গরু, ঘোড়া, মহিষ এবং শস্য। পরবর্তীকালে অলিভ পাতার মুকুট এবং অন্যান্য বস্তু প্রদত্ত হতো। চিরকালই অলিম্পিকে বিজয়ীদের সম্মান ছিল আকাশ স্পর্শী।

পাইথিয়ান

গুরুত্বের পর্যায়ে অলিম্পিকের পরেই স্থান ছিল পাইথিয়ান উৎসবের। দেবতা এ্যাপোলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সুরু হয় এই উৎসব। প্রথমে শুধু সংগীত প্রতিযোগিতাই ছিল একমাত্র বিষয়। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত হলো এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন খেলা, অশ্বারোহণ ও রথ চালনা প্রতিযোগিতা। কিছুকাল পরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও এর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে বৃদ্ধি পেল উৎসবের মর্যাদা। প্রতি চার বছর অন্তর এই পাইথিয়ান উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এখানেও বিজয়ীরা পরতো পাতার মুকুট।

ইস্থামিয়ান উৎসব

সমুদ্রের সম্মানিত দেবতা পোসিডনের স্মরণোৎসব হিসাবে চিহ্নিত ছিল ইস্থামিয়ান উৎসব। এই দেবতার নামে গ্রীকরা ইস্থমাস নামক স্থানে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছিল। এই প্রাচীন উৎসবটি প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো। যদিও এর উদ্যোক্তা ছিল কোরিন্থের বাসিন্দারা তথাপি এথেনীয়রাই এখানে যোগ দিত বেশি। এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। সোলনের প্রবর্তিত আইনানুযায়ী এথেনীয়রা ইস্থামিয়ান প্রতিযোগিতার কোন বিষয়ে জয়ী হতে পারলে মোটা অঙ্কের অর্থলাভ করতো। শুধু তাই নয় এথেনীয় দর্শকদেরও আসন ছিল পৃথক ও উন্নত ধরণের।

এ্যাথলেটিক্স ও অশ্বচালনা ছাড়াও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রতিযোগিতাও ছিল। আবার, পৃথকভাবে সমুদ্রের দেবতা পোসিডনের

সম্মানার্থে নৌকাচালনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো আড়ম্বর সহকারে।

নিমিয়ান উৎসব — আর্গোলিসের সবুজ উপত্যকায় বসতো নিমিয়ান প্রতিযোগিতার উৎসব। দেবতা হিউসের একটি মন্দির এখানে অবস্থিত থাকায় এটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হতো। হিউসের সম্মানার্থেই এই অনুষ্ঠানে আসর বসানো হতো।

প্রতি দুই বছর অন্তরের এই অনুষ্ঠানে অলিম্পিকের অনেকগুলি বিষয়ের প্রতিযোগিতা ছিল তবে রথচালনা ছিল বাদের তালিকায়। সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, নাটক, সংগীত, এ্যাথলেটিকস্ এ সবই ছিল।

পাইথিয়ান ও নিমিয়ান এই দুইটি অনুষ্ঠানই ছিল মোটামুটি আঞ্চলিক। অলিম্পিকের ব্যাপকতা সেখানে ছিল না।

অলিম্পিক, পাইথিয়ান, ইস্থামিয়ান এবং নিমিয়ান এই কয়টি উৎসবের একটি বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ মিল। সব বিষয়ের বিজয়ীদের একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পত্র নির্মিত মুকুট পরিয়ে সম্মানিত করা হতো। তারপর তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ছিল এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব মুখরিত অনুষ্ঠানে চিহ্নিত। নানা বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত বাদন সহ এক শোভাযাত্রায় যুদ্ধজয়ী বীরের মতন তাদের জনপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। পথের দু'ধারে সারিবদ্ধ জনতা জ্ঞাপন করতো তাদের অভিনন্দন। কখনও কখনও তাদের অনেক রকম সামাজিক সুবিধা দেওয়ার নজিরও আছে।

উপরোক্ত চারটি জাতীয় উৎসব ছাড়াও প্রায় প্রতিমাসেই এথেন্স কিছু না কিছু আঞ্চলিক উৎসবে মুখরিত থাকতো। দেবী এথেনাকে স্মরণ করে এইরকম একটি উৎসব ছিল সর্বোত্তম। কয়েকদিন ব্যাপি এই উৎসবে এ্যাথলেটিকস্, অশ্বচালনা থেকে সুরু ক'রে মশাল হাতে দৌড়, আবৃত্তি, সংগীত, নৌকাবাওয়া, শারীর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।

এথেন্সের বালক ও যুবকদের মধ্যে যাদের বাস ছিল নদী বা কোনও জলাশয়ের নিকটবর্তী তারা প্রায় সকলেই সন্তরণে পটু ছিল। এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে যার দ্বারা বোঝা যায়, সাঁতারের অন্যতম ভঙ্গী ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বক্ষ-সাঁতারও তাদের অজানা ছিল না। একজনকে পৃষ্ঠলগ্ন ক'রে সাঁতারের উল্লেখও পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে। আর সন্তরণ প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল হার্মিয়ন শহরের জলাশয়।

নৃত্য ছিল এথেন্সের জনজীবনের নিত্য সাথী। শারীর শিক্ষার

অন্যতম শাখা এই নৃত্যের অনুষ্ঠান ছিল গৃহস্থের বাড়ীর প্রত্যেক শিশুর জন্মলগ্নে, বিবাহে এবং মৃত্যুকালে। সারা বছরই এথেন্সে লেগে থাকতো নানা উৎসব অনুষ্ঠানের কর্মসূচী। তার মধ্যে অনেকগুলিতেই নৃত্য ছিল অপরিহার্য। রসজ্ঞান সমৃদ্ধ এথেনীয় গুণীরা নৃত্যকে ব্যবহার করলেন বিনা কথায় বিভিন্ন ভাব প্রকাশের উপায় হিসাবে। অবশ্যই এই নৃত্যে সৌন্দর্য ও শক্তির যুগ্ম প্রকাশ ছিল। গ্রীক নাটকের অভিনয়েও নৃত্য তার যোগ্য আসন পেয়েছিল।

এথেন্সের শিক্ষা পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য শরীর ও মননের সম উন্নয়ন এই নৃত্যের মাধ্যমে উত্তমরূপে সাধিত হতো কারণ নৃত্যের সাহায্যে যেমন বিভিন্ন আবেগ, ভঙ্গী ইত্যাদি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল তেমনি সব অঙ্গেরই সঞ্চালনে শরীরে শক্তি ও সচলতা সঞ্চার হতো।

এথেন্সের ক্রীড়াজগতে ধর্মের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। গ্রীক দেবতাদের বল ও রূপের কাহিনী যুবকদের অনুপ্রাণিত করতো তাঁদের সমান হবার সাধনায়। সাহিত্যের বীর চরিত্র কাহিনী ও তাদের শারীরিক শক্তির বর্ণনা মানুষের মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চের সৃষ্টি করতো।

গ্রীসের শারীর শিক্ষা সর্বদাই উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁরা মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, নৃত্য এবং অন্যান্য শারীর ক্রিয়া শিক্ষাদানের জন্য অনেকগুলি নির্দিষ্ট ব্যায়াম ধারা বা ড্রিলের সূচী তৈরি করেছিলেন। বারবার সেগুলি অভ্যাস করানোর ফলে ছাত্রদের স্ব স্ব বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না।

শিক্ষকেরা সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমী। সুতরাং, দেশের ছেলেদের শিক্ষাদানে কার্যে তাঁদের নিষ্ঠা ছিল নিখাদ। প্রয়োজনবোধে তাঁরা ছাত্রদের বেত্রপ্রহার থেকে বিরত হতেন না। দেশ গড়ার এই কারীগররা বিভিন্ন ক্রীড়ার সাহায্যে ন্যায় বোধ, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও শক্তি জাগিয়ে তুলতেন এথেন্সের যুবকদের রক্তধারায়।

পারস্য যুদ্ধে জয়ী হবার পর থেকে এথেন্সে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসে গেল। যুবকরা শরীর চর্চার মহান আদর্শকে প্রায় জলাঞ্জলি দিতে বসলো। এ্যাথলেটিকসের জগতে দেখা দিল পেশাদারী মনোভাব।

পরবর্তী এথেনীয় যুগের শারীর শিক্ষা

সুতরাং অন্তর্হিত হলো এ্যাথলেটিকসের সততা, পবিত্রতা ও নীতিবোধ। জয়লাভই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য, ধূলায় লুটালো শুধু অংশ গ্রহণের গৌরব।

এমন কিছু সংখ্যক এ্যাথলেটিকস্ প্রশিক্ষকেরও আবির্ভাব হলো যারা এ্যাথলিটদের ক্রীড়াচর্চার দ্বারা শরীরকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার বদলে এবং শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শৃংখলাবোধ, নীতিবোধ এবং অন্যান্য মানবিক গুণ বিকাশের পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করানোর জন্য তাদের বিশেষ ধরণের অনুশীলন করাতেন। এই প্রশিক্ষণের বিনিময়ে তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। এই এ্যাথলিটরা অবশ্য কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ক্রীড়াজীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী কারণ তাদের প্রতিযোগিতায় সফল করানোর জন্য যে অনুশীলনগুলি নির্দিষ্ট ছিল সেগুলি যেমন কঠোর তেমনি দীর্ঘ সময় ব্যাপি। অত্যন্ত ক্লান্তিকর ছিল সেই অনুশীলন।

প্রাচীন এথেন্সের এ্যাথলিটরা অলিম্পিকের আসরে নিজেদের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব ক'রে গর্ব অনুভব করতো, কিন্তু এই যুগের পেশাদার এ্যাথলিটরা অনায়াসে নিজের রাজ্যের পরিবর্তে অন্য রাজ্যের কাছে স্বেচ্ছায় বিক্রিত হয়ে সেই রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে দ্বিধা বোধ করতো না। এমন নজিরও পাওয়া যায়, যেখানে অলিম্পিকে জয় পরাজয় উৎকোচ গ্রহণের দ্বারা স্থিরিকৃত হয়েছে।

শারীর শিক্ষাকে তার উচ্চ আসন থেকে নামিয়ে আনা এবং মনন শিক্ষা ও শারীর শিক্ষায় বিচ্ছেদ টানার নির্বুদ্ধিতার ক্ষণে এথেন্সের বিদ্বজ্জনেরা নীরব ছিলেন না।

মনীষী জেনোকেন শোনালেন সক্রেটিসের বাণী ঃ কোনও নাগরিকের অধিকার নেই শরীর চর্চায় বিন্দুমাত্র অবহেলা করার। রাষ্ট্রকে যে কোনও সময় যে কোনও রকম সাহায্য করার জন্য সর্বদা শরীরকে মজবুত ক'রে প্রস্তুত রাখতে হবে। নিজের শরীরকে মনোহর বানালে তার থেকে কী সৌন্দর্যের বিকিরণ হয়—শক্তিতে ভরপুর রাখলে তা দিয়ে কী অসাধ্য সাধন করা যায়—এখবর না জেনে যদি কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায় তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ আছে কি? শরীরের সক্ষমতা যতদূর পারা যায় বৃদ্ধি করো। এর প্রয়োজনীয়তার কোনও সীমা রেখা নেই। জ্ঞানের আধার হবার জন্যও চাই সুস্থ বলশালী দেহ।

সক্রেটিসের যোগ্য শিষ্য প্লেটোর সাবধান বাণী শ্রুত হলো ঃ পাপের উৎস হলো কুশিক্ষা ও বিকৃত শরীর শিক্ষা। জিমনাস্টিক ক্ষমতা রাখে পাপ কার্য থেকে মানুষকে দূরে রাখতে। তিনি আরও বলেন, পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে, খেলাধূলায় দৈহিক মূল্যের চেয়ে নৈতিক মূল্যের

পরিমাণ ঢের বেশি। অ্যারিষ্টটল বললেন, দৈহিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের উপরেই নির্ভরশীল মানসিক স্বাস্থ্য। অতএব, শারীর শিক্ষাকে সর্বদাই অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য।

আমরা জানি, কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দ্বৈত লড়াই, বর্শা নিক্ষেপ ও অন্যান্য খেলা মানুষকে তার অন্তর্নিহিত পশু শক্তি চরিতার্থ করার সুযোগ দিয়ে তাকে ভারমুক্ত করে এবং উত্তরণের পথের আলোক বর্তিকা দেখায়।

চতুর্দিকে পাহাড়ের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা গ্রীসের এক উপত্যকার নাম হলো স্পার্টা নগরী। স্পার্টাকে অনায়াসে বলা যেতে পারতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক শিবির বিশেষ যেখানে প্রায় সব মানুষই ছিল সৈনিক।

স্পার্টা

যুদ্ধ আর তার কৌশল শিখতে শিখতে জানতে জানতে তারা সম্ভবত সব আবেগ আর উচ্ছ্বাস ভুলে গিয়েছিল।

তবে বরাবরই তারা এমন ছিল না। চিরকালই যে তারা অস্ত্রের ঝলসানির আলোয় সব কিছু দেখতো তা নয়। এমন সময়ও একদা ছিল যখন তাদের সমাজে সংস্কৃতির চর্চা হতো আর নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতার, মিত্রতার। একের সঙ্গে অপরের গড়ে উঠতো তখন মধুরতম সম্পর্ক। স্বাধীন চিন্তাধারায় কোনও বাধা ছিল না। স্পার্টানরা তখন বুক ভরে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস নিত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে স্পার্টা পরিবর্তন করলো তার মূল্যে বোধ, নীতি ও আদর্শ। সেই যুগে সামরিক শক্তিতে বলশালী দেশই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজাদের নিরাপত্তা সেখানেই ছিল সকলের চেয়ে অধিক।

প্রত্যেক শক্তিধরই চেষ্টায় থাকে তার শক্তিকে বৃদ্ধি করার। সেই নিয়মেই স্পার্টা তার আগ্রাসী হস্ত প্রসার করলো গ্রীসের অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রতি। দক্ষিণ গ্রীসের পূর্ণ গ্রাস সম্পন্ন হবার পর নববিজিত রাজ্যগুলিকে পদানত রাখার সমস্যা দেখা দিল। তখন স্পার্টা সুরু করলো নিজের প্রজাদের কঠোরতম শৃংখলায় আবদ্ধ ক'রে সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিত করতে। নচেৎ কী ভাবে সম্ভব হবে ঐ সমস্ত রাজ্যের কর্তৃত্বের শাসন বজায় রাখা? সমস্ত নাগরিকদের সম্মুখে শুধু একটাই বাণী তুলে ধরা হলো—সৈনিক হও, দেশকে রক্ষা করো।

যে কোনও জাতির মনে কোনও নতুন চিন্তার বীজ বপন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় তার শিক্ষাধারা ও শিক্ষাদর্শের উপর হস্তক্ষেপ করা।

এ কৌশল স্পার্টার অজানা ছিল না। তাই, স্পার্টার শিক্ষার পরিবর্তন করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলো। তার ফলে, নতুন যে শিক্ষা প্রবর্তিত হলো তার নাম সামরিক শিক্ষা। ক্রমে ক্রমে স্পার্টার সব শিক্ষাই পরিণত হলো সামরিক শিক্ষায়। অর্থাৎ শিক্ষা মানেই সামরিক শিক্ষা, এই কথা সকলে জানলো ও বুঝলো। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হয়ে গেল স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ, বলশালী এক দল সাহসী যোদ্ধা তৈরি করা। নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হলো, কারণ একমাত্র সবলা নারীই জন্ম দিতে সক্ষম উত্তম স্বাস্থ্যের শিশু। যে-শিশু জন্ম রুগ্ন, তার অধিকার ছিল না স্পার্টার নিঃশ্বাস নেবার। অবিলম্বে তাকে ফেলে আসা হতো মাউন্ট টেগেটাস পর্বতে শুকিয়ে মরার জন্য। কারণ, সে ভবিষ্যতে সৈন্যদলে অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। প্রত্যেক স্পার্টানকেই তো হতে হবে সৈন্য। জন্ম মাত্রেই সে সৈনিক ব্রতের জন্য নিবেদিত।

রাষ্ট্রের প্রতি কোনও প্রজার পূর্ণ আনুগত্যের বিন্দুমাত্র অভাব যাতে দেখা না দিতে পারে তার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো যার ফলে স্পার্টাকে অনায়াসে তুলনা করা যায় কুয়োর ব্যাঙের সঙ্গে। রাজ্যের বাইরে গমনাগমন বারণ, অন্য রাজ্যের শিক্ষাচিন্তার অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। নাগরিকরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

স্পার্টার শাসকদের সম্ভবত অজানা ছিল যে, বাইরের মুক্ত হাওয়া আটকে দিলে এক দিন ভিতরের বদ্ধ হাওয়া আর নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, দম বন্ধ হয়ে যায়। যাই হোক, অনমনীয় দৃঢ়তায় সামরিক আদর্শ চাপানো হলো রাজ্যের বুকে। মানুষের পারিবারিক জীবনের বন্ধনের গ্রন্থি ধরেও সজোরে টান দেওয়া হলো। সাত বছরে পদার্পণ করলেই শিশুপুত্রকে রাষ্ট্রের নিজস্ব পদ্ধতি মানুষ করার জন্য বোর্ডিং-এ প্রেরণ করা হলো। জননী ও শিশুর স্নেহের জগৎ বিলুপ্ত হলো। সৈনিকের যুদ্ধযাত্রায় মাতৃস্নেহ যাতে প্রতিবন্ধক না হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই নিয়মের প্রবর্তন।

শারীর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলো। জিমনাস্টিক, এ্যাথলেটিক্স এবং অন্যান্য শরীর চর্চাগুলি সৈন্য তৈরির কাজে লাগানো হলো। সুতরাং, স্পার্টার শারীর শিক্ষার ফসল হলো কষ্ট সহিষ্ণু, সাহসী, শক্তিশালী এক বিশাল সেনাবাহিনী। জ্ঞান জগতের সব দরজাই তাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সাধারণত, আচ্ছাদনহীন খোলা মাঠেই সব রকম শারীর শিক্ষার

অনুশীলন করানো হতো। শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যারাকে সব রকম সাচ্ছন্দ্য সযত্নে পরিহার করা হত। সব রকম আরামই তাদের কাছে ছিল হারাম। সব শিশুই একত্র আহার বিহার, একই রকম খাদ্য ও একই রকম কঠোর জীবন যাপনের ফলে হয়ে উঠলো প্রায় একই মনোভাবাপন্ন। সুযোগ রইলো না স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবার।

শিক্ষার্থীদের আহার ছিল যৎ সামান্য। বালকদের ক্ষুধার্ত রেখে খাদ্য চুরি ক'রে সংগ্রহ করায় উৎসাহ দেওয়া হতো। আবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার কঠোর শাস্তি প্রাপ্য ছিল। কৌশল ও সাহস পরীক্ষার ট্রেনিং ছিল এটা। কখনও কখনও বালকদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে হাতাহাতি লাগিয়ে দেওয়াও ছিল সামরিক শিক্ষার অঙ্গ। বালকদের প্রথম বয়সে পায়ের পেশী মজবুত করার জন্য দৌড়-ঝাঁপই বেশি করানো হতো। সতের আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় সব ছেলেরাই বল খেলতো। আঠারোতে পেঁছালে তাদের মাঝে মাঝে কাছাকাছি গ্রাম্যঞ্চলে গিয়ে লুঠ তরাজ করতেও পাঠানো হতো। ব্যায়াম ছিল ক্রমে ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর। দৌড়-ঝাঁপের সঙ্গে যুক্ত হয় বর্শা নিক্ষেপ, খালি হাতে মুষ্টি যুদ্ধ, কুস্তি ইত্যাদি। এ সবই ছিল তৎকালীন যুদ্ধে অপরিহার্য। প্যানক্রেসিয়ামের বীভৎসতা ও শিকারের উন্মাদনাও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া, পাইরিক নামে এক প্রকার সমর-নৃত্যও ছিল। বর্শা ও ঢাল হাতে এই নৃত্যে যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠতো।

আর এক রকমের খেলায় নিয়ম ছিল পনের জনের একটি দল খাল বেষ্টিত এক জায়গায় অবস্থান করবে। আর অপর দল তাদের ঠেলে খালে ফেলে দেবার চেষ্টা করবে। এই খেলায় ধাক্কার সঙ্গে লাথি ও কামড়ানোও চলতো।

আঠারো বছর বয়স থেকে পুরোপুরি সামরিক শিক্ষায় যোগদান ছিল আবশ্যিক। এই সময় নানারকম সামরিক বিদ্যায় তারা রপ্ত হতো। তারপর কুড়ি বছরে সৈন্য হিসাবে শপথ গ্রহণ ও প্রয়োজন মতো প্রকৃত যুদ্ধে যোগদান। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত দৈনিক শরীর চর্চায় রেহাই ছিল না। সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলতো শরীর চর্চার নির্দিষ্ট কর্মসূচী। তিরিশ বছরে পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভের অধিকার জন্মাতো। তখন মিলতো বিবাহের অনুমতি। তবে নিয়মিত গার্হস্থ্য

জীবন যাপন নিষিদ্ধ ছিল। খাওয়া দাওয়া ছিল ব্যারাকে সকলের সঙ্গে একই টেবিলে। তারপর যখন প্রাকৃতিক নিয়মে হ্রাস পেত শরীরের ক্ষীপ্রতা ও শক্তি সামর্থ্য তখন অল্প বয়সীদের শারীর শিক্ষাদানের ভার পড়তো এই প্রৌঢ় সৈনিকদের উপর। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষকেরা শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকতেন।

মাঝে মাঝেই যুবকদের শারীর শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল। নগ্নদেহে জনসাধারণের সম্মুখে তাদের উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার জন্য দাঁড়াতে হতো। সকলের প্রশংসা-বাণী বর্ষিত হতো যদি তাদের শরীরে পাথরে খোদিত আদর্শ মূর্তির সাদৃশ্য থাকতো। কিন্তু তার বদলে দেহে মেদের বাহুল্য দেখা দিলে বেত্রাঘাত প্রাপ্য ছিল।

স্পার্টার নারীদের জন্যও শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সংগীতের সঙ্গে জিমনাস্টিক এবং দৌড়-ঝাঁপ, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ ও অশ্বারোহণ বিদ্যা ছিল তাদের শিক্ষণীয় বিষয়। সাঁতার ও কুস্তিতেও স্পার্টার নারীরা অংশ গ্রহণে বিমুখ ছিল না। অবশ্য, বোর্ডিং বা ব্যারাকের বদলে তাদের শারীর শিক্ষার স্থান ছিল গৃহাঙ্গন ও প্রান্তর। বিবাহের পরে নারীদের কোনও রকম শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হতো না।

যে দিন থেকে স্পার্টা শারীর শিক্ষাকে সামরিক শিক্ষায় পরিণত করলো তখন থেকেই স্তব্ধ হলো তার সর্বরকম প্রগতি। অলিম্পিকের প্রাঙ্গণেও স্পার্টার সাফল্যের ছাপ আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগলো। স্পার্টা রেখে যেতে পারলো না এই পৃথিবীতে কোনো স্থাপত্যের নিদর্শন কিংবা কাব্য-নাটকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বাহিরের শত ঐশ্বর্যও আর আবৃত রাখতে পারলো না তার আভ্যন্তরীণ রিক্ততার অসহায়তাকে। স্পার্টার সমাজ ব্যবস্থা একদিন ভেঙ্গে পড়লো।

সভ্যতার এক অর্থ যদি হয় বিস্তার, সংকীর্ণতার দেওয়াল ভাঙ্গা, ক্ষুদ্রতার অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে বিরাটকে আহ্বান জানানো, অর্থাৎ কবিগুরুর ভাষায় "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়" তাহলে বলতেই হবে স্পার্টা হয়েছিল বিপথগামী।

একদা ইউরোপের শারীর শিক্ষার গগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র গ্রীস

আধুনিক গ্রীস

বর্তমানে স্তিমিত দীপশিখায় পরিণত।

তুরস্কের শাসনে চারশো বছরের পরাধীনতার পর গ্রীস ১৮৩০ সালে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স গ্রীসের এই

স্বাধীনতা লাভের প্রধান সহায়ক ছিল। অবশ্য, ১৯৪৯ সালের পূর্বে গ্রীসে রাজনৈতিক স্থিরতা ঠিক ভাবে আসেনি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় চার বছর জার্মানি, ইতালি ও বুলগেরিয়ার সেনাবাহিনী গ্রীসে অবস্থান করেছিল এবং এছাড়া অন্তর্কলহের অশান্তিও ছিল। তারপর থেকে গ্রীসের বিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষা কিছুটা গুরুত্ব লাভ করলো। সপ্তাহে দুই তিন পিরিয়ড শারীর শিক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকলো। সুইডেন প্রথার জিমনাস্টিক ও লোক নৃত্য প্রচলিত হলো খুব বেশি। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা সাঁতার ও এ্যাথলেটিকসে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু দলগত খেলায় উৎসাহ বেশ স্তিমিত। তবে ১৯৬০ সালের পর থেকে বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ফুটবল এবং ভলিবল প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছেলে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করা সুরু করেছে। গ্রীসে খেলাধূলার অনুশীলন ও অংশগ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।

১৯৩৯ সালে এখানে শারীর শিক্ষার একমাত্র কলেজ ন্যাশনাল আকাদেমি অফ্ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হয়। এখানে তিন বছরের পাঠক্রম সমাপ্ত ক'রে স্নাতকেরা মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে শারীর শিক্ষা দান করেন। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শারীর শিক্ষকদের কোনও ট্রেনিং নেই। যার ফলে, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের সমান মর্যাদা তাঁরা পান না।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই হ্যান্স্ ম্যাসম্যানের চেষ্টায় গ্রীস জার্মানীর শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সুইডেনের জিমনাস্টিক প্রথার আকর্ষণে সব কিছু ভেসে গেল। সুইডেনের বিখ্যাত শারীর শিক্ষাবিদ হেনরিক লিং-এর কর্মসূচী ইউরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গ্রীসেও প্রচলিত হলো লিং-এর চার রকম জিমনাস্টিক ঃ—শিক্ষামূলক, সামরিক, মেডিক্যাল ও সৌন্দর্যমূলক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পৌনে একশত বছর গ্রীসের বালক বালিকা যুবক যুবতীরা এই প্রথায় জিমনাস্টিক অনুশীলন করেছে। তার মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী ব্যায়ামগুলি গ্রীসের স্কুলগুলিতে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। ওয়াই, এম, সি, এ-র শিক্ষকরা এসে এখানে শারীর শিক্ষাদান কার্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গ্রীসের স্কুলগুলিতে শারীর শিক্ষার পরীক্ষাও আবশ্যিকভাবে স্থান পেল।

১৮৯৬ সালে ফরাসী শারীর শিক্ষাবিদ ব্যারণ পিয়ের ডি কুবার্তিন

যখন আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করলেন তখন তিনি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে গ্রীসকেই দিয়েছিলেন অনুষ্ঠান-ভূমি হবার সম্মান। এথেন্সের প্রাচীন স্টেডিয়ামের অনুসরণে নির্মিত হলো নতুন স্টেডিয়াম। পৃথিবীর সেরা ক্রীড়াবিদদের আগমনে গ্রীস আবার চঞ্চল হলো প্রতিযোগিতার উল্লাসে, নানা খেলার নব জাগরণে।

তদবধি, প্রত্যেকটি অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মার্চপাস্টে গ্রীসের এ্যাথলিটদেরই রাখা হয় সকলের সামনে। এইভাবে প্রাচীন অলিম্পিকের জন্মদাতা গ্রীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়।

বর্তমানে গ্রীসে প্রায় ২০০০ টি খেলাধুলার ক্লাব আছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা এবং যুবক যুবতীরা দলে দলে যোগদান ক'রে মনোমতন খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল ও সাঁতারের জনপ্রিয়তা ঊর্দ্ধমুখী।

জাতীয় অলিম্পিক কমিটির উদ্যোগে ১৯৬১ সালে গ্রীসে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক আকাদেমির প্রথম অধিবেশন বসেছিল। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে অলিম্পিয়াতে এই আকাদেমির অধিবেশন বসে। সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে শারীর শিক্ষার শিক্ষক, ছাত্র এবং ক্রীড়াবিদরা সমবেত হ'য়ে নানা রকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করত। ক্রীড়া বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতাও প্রদত্ত হয়। বলাই বাহুল্য, ক্রীড়ার সার্বিক উন্নয়নই এই আকাদেমির মূল উদ্দেশ্য।

রোম

রোম শহরের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে নাকি রোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার এই দুই ভাইকে লালন পালন করেছিল এক নেকড়ে বাঘ। এট্রুসকান নামে যে জাতি এশিয়া মাইনর থেকে আগমন করে খ্রীষ্টপূর্ব ৬১৮ অব্দে রোম জয় করেছিল তাদের ভাষায় নদীকে বলা হয় রুমন। সুতরাং টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত রোম শহরটির নামের উৎপত্তি বা উৎস হয়তো বা এই রুমন শব্দটিই। এট্রুসকানরা শত বৎসর রোমে রাজত্ব করে তথাকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সামরিক জাতি হওয়ার দরুণ স্বভাবতই তাদের আকর্ষণ ছিল শিকারে। ক্রীড়াচর্চা ছিল তাদের ডিসকাস নিক্ষেপ, পোল ভল্ট্, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্ল প্রভৃতি।

রোম

এট্রুসকান ছাড়াও রোমের বাসিন্দা ছিল লাটিনীয় এবং স্যাবাইনরা। ৫০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এট্রুসকানদের কবলমুক্ত হলো আর তারপর আড়াইশো বছরের মধ্যে ইতালি ইত্যাদি শহরগুলি দখল করে রোম একটি অখণ্ড রাজ্যে পরিণত হলো।

প্রাচীন কাল থেকেই রোমের জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল সরকারাধীন। সবল ও স্বাস্থ্যবান শিশুই ছিল রোমের কাম্য আর রুগ্ন, বিকৃতাকৃতি শিশুদের জন্য ছিল মৃত্যু। শিশুদের খেলার সামগ্রী ছিল নানারকম খেলনা, পুতুল, স্কিপিং এর-দড়ি, কাঠের ঘোড়া, ঘুড়ি ইত্যাদি। দড়ি টানাটানি ও লুকোচুরি খেলাও শিশুদের খুব প্রিয় ছিল।

প্রাচীন রোমানরা উপলব্ধি করেছিল যে, যোগ্যতার সঙ্গে দেশকে সেবা করার জন্য এবং নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য, খামার সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত শারীর শিক্ষা। শুধুমাত্র এই নয়, চাই পিতামাতা ও দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, আচরণে নম্রতা, আইনের প্রতি আনুগত্য, আদেশ পালনের প্রবৃত্তি ও সর্বোপরি সর্বদা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি শিক্ষা। শিশুদের প্রথম শিক্ষা ছিল পরিচারিকাদের হাতে ন্যস্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তারা পড়তে যেত ৭ বছর বয়সে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন গ্রীক। আর শিক্ষিত ক্রীতদাসরা তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং তাদের গ্রীকভাষা শিক্ষা দেওয়া ও

আচার আচরণে ভব্য করে তোলাও ছিল তাঁদের কর্তব্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লিখতে পড়তে শেখা ও গণিত। মেয়ে ছাত্রীদের নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর হিটলারের মত প্রাচীন রোমানদের ধারণা ছিল, সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করার জন্য তাদের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ আছে। অতএব, তাদের শারীর শিক্ষার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—যুবকদের যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী করে তৈরি করা। এই জন্য প্রাচীন রোমের শারীর শিক্ষার কার্যক্রমে শরীরকে বলশালী করা, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন, দুই বাহুর দ্রুত সঞ্চালনের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে উত্তম শিক্ষার নির্দেশ ছিল। ছিল না গ্রীকদের সেই আদর্শ, শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শরীরকে মনোহর করা, শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে আপাদমস্তক মণ্ডিত করা।

বল খেলা রোমে খুব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার বলের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলির কোনোটার ভিতরে ভরা ছিল লোম, কোনটিতে পালকের ঝাঁক অথবা হাওয়া। বল ছোঁড়া ও ধরা এই খেলা বেশ প্রিয় ছিল ছেলেদের। অবশ্য বলের আকৃতির ছোট বড়র উপর নির্ভর করতো সেটা কোন্ খেলার উপযোগী। অনেক রকম বল খেলাতেই মেতে উঠতো রোমের বালকেরা। হ্যাণ্ডবল নামে একরকম খেলায় দেওয়ালের গায়ে কে কতবার ছুঁড়ে আবার ধরতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলতো! ট্রিগন নামে এক বল খেলা ছিল যাতে একটি ত্রিভুজের তিন কোনে তিনজন দাঁড়িয়ে একাধিক বল দিয়ে খেলতো। আবার শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে নানারকম ঘুঁটির সাহায্যে কয়েকটি খেলা প্রচলিত ছিল। আর একটি খেলা ছিল যার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে দাবা এবং লুডো খেলার। যুবকেরা নানারকম শারীরিক ব্যায়ামে নিয়োজিত থাকতো। প্রাচীন রোমে নৃত্য অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দৌড়, সাঁতার, লাফানো, বর্শা নিক্ষেপ, তরবারি চালনা এবং তীরন্দাজী বিদ্যার মাধ্যমে সৈনিক হওয়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ ছিল। প্রতি মাসে তিনবার কুড়ি মাইল মার্চ করানো হতো এবং ঘণ্টায় চার মাইল পথ অতিক্রম করা ছিল আবশ্যিক। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য রন্ধনের বাসনপত্র বহন করে স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রায়ই যেতে হতো।

যুবকদের সৈনিকব্রতে দীক্ষা দানই ছিল শারীর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবিলম্বে আদেশ পালন করা ছিল রোমের যুবকদের

অবশ্য কর্তব্য। এর অন্যথায় শাস্তি ছিল গুরুতর। এই অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান ছিল। সর্বদা যুদ্ধ ও বীর যোদ্ধাদের কাহিনী শুনে শুনে যুবকদের মানসিক প্রস্তুতিও তৈরি হয়ে যেত যুদ্ধ করা এবং সৈনিকব্রত অবলম্বন করার জন্য। এর ফলস্বরূপ রোমের যুবকেরা বাস্তবিকই তৈরি করতে পেরেছিল সহস্র সহস্র রুক্ষ সৈনিক যারা যুদ্ধবিদ্যায় ছিল দক্ষ, নিষ্ঠুরতায় দ্বিধাহীন।

কালক্রমে রোম যখন বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হলো তখন স্বভাবতই, গ্রীস এবং প্রাচ্যদেশগুলির সংস্পর্শে আসতে হলো। তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের দৈন্য দেখে তারা আঁতকে উঠেছিল। প্রচুর ধন সম্পদ এবং প্রতিপত্তি দিয়ে এই শূন্যকে ভরাট করা সম্ভব নয়, এ সত্য তারা উপলব্ধি করলো। তখন তাদের নিজস্ব স্বভাবসুলভ সৈনিকের মনোভাবের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে লুঠ করা সুরু করলো বিদগ্ধ দেশের গ্রন্থাগার, শিল্পকার্যের সামগ্রীগুলি রোমের মানুষকে আলোক প্রাপ্ত করাই ছিল এই লুঠের উদ্দেশ্য। গ্রীক দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা হলো।

পরবর্তীকালে, যদিও রোম তার সৈন্যদের জন্য কঠোর শরীর চর্চায় বিশ্বাসী ছিল এবং সৈনিকরা শরীর চর্চাকে একমাত্র তাদের পেশার প্রয়োজন হিসাবেই গ্রহণ করতো জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র পেশাদার এ্যাথলিটরা বাদে আর কেউ শারীর শিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দিল না। কারণ সৈন্যদলে সকলে তো নাম লেখাবে না। আনন্দের সামগ্রী হিসাবে নাম মাত্র বেশি কিছু করা তারা পছন্দ করলো না। একমাত্র অসুস্থতা কিংবা দুর্বলতার হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে তারা শারীর শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করা সুরু করলো। অবশ্য কিছুটা পরিমাণে জিমনাস্টিকের চর্চা চলতে লাগলো প্রধানত স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত। এ সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক চিকিৎসক গ্যালেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। গ্যালেন যদিও জাতিতে ছিলেন গ্রীক, তিনি সুদীর্ঘকাল এ্যাথলীটদের চিকিৎসক হিসাবে রোমে বসবাস করেছিলেন। গ্যালেন এ্যাথলীট এবং গ্ল্যাডিয়েটরদের জন্য নির্দিষ্ট কঠোর শারীরিক ব্যায়াম ও ট্রেনিং এর বিরোধীতা করেছিলেন। তার পরিবর্তে, তিনি বললেন, যে-শারীর শিক্ষা মানুষের শরীরকে মজবুত ও পটু বা সচল করে এবং দেহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি গঠন করতে সাহায্য করবে আর দেহে এনে দেবে স্বাস্থ্যের দীপ্তি শুধু সেই শারীর শিক্ষাই কাম্য।

তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেল নানারকম খেলা। বৃদ্ধি পেলো তার বৈচিত্র, এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যা। এই অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু খেলা নয়, অন্যান্য আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য বছরে ৭৬ দিন নির্দিষ্ট ছিল। তারপর ৩৫৪ খৃষ্টাব্দে এর জন্য বছরে ১৭৫ দিন ছুটি থাকতো। টাইবার নদীর তীরে ক্যাম্পাস্ মার্টিয়াস নামে যে বিখ্যাত প্রান্তর ছিল যেখানে রোমের যুবকেরা দৌড়-ঝাঁপ, বর্শা নিক্ষেপ এবং নানা রকম সামরিক ব্যায়াম ও শারীর ক্রিয়া অভ্যাস করতো ধীরে ধীরে সেখানে হ্রাস পেলো ক্রীড়াবিদের সংখ্যা। হ্রাস পেলো অ্যাথ-লীটদের প্রতিযোগিতা এবং মল্ল মুষ্টিযুদ্ধের সুস্থ দ্বৈত প্রতিদ্বন্দিতা। রোমানরা তার চেয়ে বেশি আমোদ পেলো কয়েকটি উত্তেজনাপূর্ণ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায়। উত্তেজনাপূর্ণ ছিল রথচালনা প্রতিযোগিতা আর নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ছিল গ্ল্যাডিয়েটোরিয়াল কম্ব্যাট বা মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা পশুর দ্বৈতযুদ্ধ। এছাড়া সন্ধ্যায় যুবকরা ভালবাসতো থার্মার দেহ-মালিশ ও উষ্ণ জলের স্নান। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা অতিবাহিত করতো নানারকম বল খেলায় আর জুয়ার টেবিলে।

যেদিন নির্দিষ্ট থাকতো রথচালনা প্রতিযোগিতার, সেদিন অনুষ্ঠানের অনেক পূর্ব থেকেই সর্বশ্রেণীর নারীপুরুষের সমাগম হতো! ধনীরা বাজী ধরতো তাদের প্রিয় রথচালকের নামে। আর, অন্যদের মধ্যে চলতো আলোচনা, বাদানুবাদ ইত্যাদি।

এই প্রতিযোগিতা ছিল যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিহরণপূর্ণ। রথগুলিকে উল্টে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হতো নীচু এবং হাল্কা করে। কোনও কোনও সময় সাতটি ঘোড়াও জুড়ে দেওয়া হতো রথের সম্মুখে তবে সাধারণত চারটি ঘোড়াই থাকতো। আবার মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বারোটি ঘোড়াও রথ টানতো তীব্র বেগে। তিন মাইলের সেই বুক-কাঁপানো প্রতিযোগিতা সুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে রথগুলি সারিবদ্ধ ভাবে যাত্রা আরম্ভ করার জন্য অপেক্ষা করতো। সংকেত পেয়ে যাত্রার সুরু থেকেই রথগুলি একে অপরকে অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা করতো তীব্রগতিতে অগ্রসর হয়ে। বিজয়ী হবার জন্য রথচালকদের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। শুধু গতিবেগ নয়, মোড় ঘোরাবার কৌশল জানাও এক রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এবং অন্য রথের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর দায় ছিল প্রায় প্রতি মুহূর্তেই। কেননা, ঐ তিন মাইলের দূরত্ব সোজা পথে অতিক্রমের বদলে কয়েক বার পাক দিয়ে

সম্পূর্ণ করতে হতো। সেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনাপূর্ণ রথ প্রতিযোগিতায় মাঝে মাঝে বাদানুবাদ, মারামারি ও রক্তপাত ঘটতো।

সরকার অথবা উৎসাহী ব্যক্তিরা এই প্রতিযোগিতার ব্যয়ভার বহন করতেন।

বিভিন্ন রথ চালকেরা পৃথক বর্ণের পোষাক পরতেন। ফলে, তাদের সমর্থকদের সুবিধা হতো নিজের দলকে চিনে নিতে। নইলে, সমর্থকদের উল্লাস ও চিৎকার হবে কেমন করে? যে স্থানে সাধারণত এই রথ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো তার নাম ছিল সার্কাস ম্যাক্সিমাস। এর আয়তন ছিল ২০০০ ফুট লম্বা এবং চওড়া ৬০০ ফুট এবং সেখানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার দর্শকের বসার আসন ছিল।

থার্মা শব্দের অর্থই হলো উষ্ণ জল। রোমে প্রতিষ্ঠিত থার্মাতে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। তবে সেখানে যে শুধু স্নানই হতো তাই নয়। গ্রীসের প্যালেস্ট্রা এবং জিমনাসিয়ামের অনুকরণে সেখানে নানা-

থার্মা

রকম শরীর চর্চার ব্যবস্থা ছিল। বক্সিং ও কুস্তি ছাড়াও উন্মুক্ত জায়গায় দৌড়-ঝাঁপ, ডিসকাস ও বর্শা নিক্ষেপ চর্চা চলতো। কিছু কিছু বল খেলাও সেখানে হতো। অবশ্য, শুধুমাত্র বড় থার্মাতেই এইসব শরীর চর্চা ছিল। অন্যত্র কেবল গরম জলে স্নান ইত্যাদি। কয়েকটি বড়ো থার্মাতে দাবা ও ঘুঁটির খেলাও হতো। আবার সাংস্কৃতিক চর্চার জন্যে গ্রন্হাগারও ছিল। সেখানে প্রায়ই আগমন হতো জ্ঞানী দার্শনিকদের। পড়াশুনা ছাড়াও নানা বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা লাভবান হতেন ঐ জ্ঞানবানদের সাহচর্যে। সঙ্গীত চর্চাও অবহেলিত ছিল না। তার জন্যে পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। অবসর বিনোদনের এই সুন্দর উপায়টি রোমানদের মধ্যে যাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের তৃপ্তি ও শ্রোতাদের উপভোগ, এই উভয় ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন। সম্ভবত, গ্রীকদের জিমনাসিয়ামের এই ধরণের ব্যবস্থা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি থাকা সত্ত্বেও থার্মাতে সর্বাপেক্ষা ভিড় হতো স্নানাগারেই। এগুলোকে গণস্নানাগার বলতে বাধা নেই কেননা, ধনবানদের বাড়ীতে নিজস্ব স্নানাগার ছিল প্রায় সকলেরই। নীরোর নিজস্ব স্নানাগারে একই সঙ্গে ১৬০০ লোকের স্নান করার সুযোগ ছিল।

থার্মার গণস্নানাগারে স্নানের জন্য সামান্য দক্ষিণা ধার্য ছিল তবে স্নানের জন্য তেল বিনা পয়সাতেই দেওয়া হতো। তেল মালিশ করে সর্ব-

শরীরে রক্ত চলাচল করে নিতেন স্নানার্থীরা। তারপর প্রথমে থার্মার গরম ঘরগুলিতে গিয়ে দেহে ঘামের সঞ্চার করে নিতেন। অতঃপর স্নান। গরম জলের পরে ঠাণ্ডা জলে স্নান সাধারণত তারাই করতেন যাঁরা বাত অথবা ঐ জাতীয় কোনও রোগে আক্রান্ত। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, গরম-ঠাণ্ডা জলের স্নান ঐ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। যে থার্মাগুলিতে স্ত্রীলোকদের স্নানের ব্যবস্থা ছিল সেখানে সকালবেলা স্ত্রীলোকদের এবং বিকেলে পুরুষদের জন্য পৃথক স্নানাগার খোলা রাখা হতো। কয়েকটিতে আবার নারীপুরুষের একত্র স্নান প্রচলিত ছিল।

স্নানের শেষে সর্বশরীরে জলপাই তেল মালিশ করে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর ধাতু নির্মিত স্ট্রিজিল নামে একপ্রকার ঘর্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ তেল শরীর থেকে তুলে ফেলা হতো।

থার্মাগুলির নির্মাণকার্য ছিল খুবই ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ। কারুকার্যমণ্ডিত বড়ো বড়ো থাম, মার্বেল বা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল আর মোজেইক করা মেঝে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

আয়তনেও সুবৃহৎ ছিল থার্মাগুলি। ডায়োক্লেশিয়ানের থার্মাতে একত্রে ১৬০০ এবং ক্যারাকালার থার্মাতে একত্রে ৩২০০ লোকের স্নান করা সম্ভব ছিল। ক্যারাকালার থার্মার আয়তন ছিল সম্ভবত ২২০ মিটার দীর্ঘ এবং ১১৪ মিটার চওড়া। এর থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় রোমের জনসাধারণের কাছে থার্মার এই স্নানাগারগুলির জনপ্রিয়তা কী বিপুল ছিল।

এই থার্মা নির্মাণ থেকে অবশ্য এ ধারণা করলে ভুল হবে যে রোমের অধিবাসীরা সকলেই থার্মাতে স্নান করতো। ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। টাইবার নদীর নির্মল জলে অবগাহন স্নানেও শীতল হতো রোমানদের শরীর। টাইবারের ঢেউয়ে বুক ঠেকিয়ে সাঁতার কাটতো রোমের কত নারী পুরুষের দল!

"গ্ল্যাডিয়াস" শব্দের অর্থ তরবারি। এই শব্দটিই সৃষ্টি করলো শরীর চর্চা বিদ্যার কৃষ্ণতম অধ্যায়, ঘৃণ্যতম রুচি এবং নৃশংসতম উল্লাস—গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাট। চার্লস্ মেরিভেল রচিত রোমের

গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাট

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দে প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়টাই ছিল এই কম্ব্যাট বা লড়াইয়ের উৎপত্তির সমসাময়িক কাল। মার্কাস ও ডেসিমাস ব্রুটাস নামে দুই ভাই পিতার মৃত্যুর পরে এক প্রদর্শনী তরবারি খেলায় ব্যাপৃত হয়। উপস্থিত

দর্শকদের এই তরবারি যুদ্ধ এতই মনোরঞ্জন করেছিল যে, কোনও সুযোগ পেলেই এই জাতীয় যুদ্ধের আয়োজন করা হতো। ক্রমে ক্রমে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে আয়োজনের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রথম যুগে কবরের পার্শ্ববর্তী স্থানেই অনুষ্ঠিত হতো গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাট। "গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাট" শব্দটির পরিবর্তে কোনও সঠিক বাংলা শব্দ খুঁজে না পেয়ে এবার থেকে এর বদলে "কালো দ্বন্দ্ব" শব্দদ্বয় ব্যবহার করা যাক।

এই কালো দ্বন্দ্ব অনেক লোককে একত্রে দেখাবার জন্য তৈরি হলো অ্যাম্ফিথিয়েটার বা কলোসিয়াম্। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ২৮৭ ফুট এবং ১৮০ ফুট ছিল এর আয়তন। চতুর্দিকের দেওয়ালের বেষ্টনের উচ্চতা ছিল ১৫ ফুট। এই অ্যাম্ফিথিয়েটারের নাম ছিল ফ্ল্যাভিয়ান্ এ্যাম্ফিথিয়েটার। এখান থেকে দ্রুত নির্গমনের জন্য ৮০ টি দরজা ছিল।

রোমের সঙ্গে যুদ্ধে যে বিদেশীরা বন্দী হতো এই কালো দ্বন্দ্বের প্রথম যুগে তাদের দিয়েই লড়ানো হতো এই যুদ্ধ। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থামতে দেওয়া হতো না লড়াই। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ লড়াকুদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুললেন। সেখানে দলে দলে লড়াকু তৈরি করে এ্যাম্ফিথিয়েটারে তাদের দিয়ে কালোদ্বন্দ্বের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখন রোমে জনপ্রিয় হবার এই মাধ্যমটি বেশ কার্যকরী ছিল। সম্রাট ক্যালিগুলার শিক্ষণ কেন্দ্রে ২০,০০০ শিক্ষার্থী ছিল। অবাক হবার মত সংখ্যা। বিদেশী বন্দীদের পাওয়া যখন দুষ্কর হলো তখন নিযুক্ত করা হলো মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী এবং ক্রীতদাসদের। কিছু দরিদ্র ব্যক্তি যারা আসামীও নয়, ক্রীতদাসও নয় তারা বেতন ও আহারের প্রলোভনে যোগ দিত এই মারাত্মক দ্বন্দ্বে। রোম শহরে এই রকম চারটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং অন্যান্য শহরেও কয়েকটি ছিল।

ফ্ল্যাভিয়ান এ্যাম্ফিথিয়েটারের রৌদ্র-বৃষ্টি আড়াল করা সুন্দর আচ্ছাদনের নীচে গদী আঁটা চেয়ারে বসে সুগন্ধী ঝর্ণার জলের উপর দিয়ে ভেসে আসা মৃদু বাতাসের স্পর্শে আরাম পেতে পেতে রোমের নাগরিকরা উপভোগ করতো কত রকম কালো দ্বন্দ্বের মরণ-খেলা। একরকম দ্বন্দ্ব ছিল যার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে থাকতো শুধু একটি ছোরা ও বড় একটি জাল, অপরজন কিন্তু সামরিকভাবে সুসজ্জিত। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী জাল দিয়ে অপরকে আটকে ফেলার চেষ্টা

করতো এবং দ্বিতীয় জন তাকে সামরিক অস্ত্রের দ্বারা নানাভাবে আহত করতে উদ্যত হতো। উভয়েই আহত হয়ে রক্তে স্নান করতো। তারপর একজন ক্লান্ত, দুর্বল হয়ে লুটিয়ে পড়লে জয়ী যোদ্ধা দর্শকদের দিকে মুখ তুলে তাকাতো, তারা এই যুদ্ধের শিহরণে তৃপ্ত কিনা জানবার জন্য। দর্শক তৃপ্ত হলে যুদ্ধ শেষ। তবে বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বী জীবন রক্ষা পেয়ে গেল। নচেৎ, চলবে আবার লড়াই যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে। দর্শকরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নীচু করলে বোঝা যেত তাদের পিপাসা তখনও মেটেনি।

কালো দ্বন্দ্বের আরও খেলা ছিলো অস্ত্রবিহীন মানুষের সঙ্গে হিংস্র জন্তুর লড়াই বা দুই পক্ষেই জন্তু। তবে সবচেয়ে বীভৎস লড়াই ছিল মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত দুই সৈন্যদলের মুখোমুখী লড়াই। এই যুদ্ধের সময়ে রণপ্রাঙ্গণ জলমগ্ন করে দেওয়া হতো যাতে সৈন্যদের রক্তধারা আর জলধারার মিশ্রণে মনে হয় এক রক্তনদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একবার এইরকম এক কালো দ্বন্দ্বে ১৯,০০০ মানুষকে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করা হয়।

রক্ত দেখে দেখে রোমের মানুষ আর যুদ্ধে ভয় পেতো না। দ্বিধা ছিল না প্রাণ নিতে বা দিতে।

রোমের শারীর শিক্ষার এই কলঙ্কজনক কালো দ্বন্দ্বের আকাশে মাঝে মাঝে সোনালী রেখাও দেখা দিয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের স্নিগ্ধ প্রভাবে রোমের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এই পৈশাচিক মরণখেলায় ব্যথিত হলো। তাদের জন্মগত অনেক পুরাতন বিশ্বাসে ফাটল দেখা দিল। শান্তিলাভের জন্যই যুদ্ধ প্রয়োজন—এই বাণীতে আস্থা হারালো রোমের অনেক মানুষ। এই প্রসঙ্গে ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অ্যাম্ফিথিয়েটারেসেই কালোদ্বন্দ্বের আসরের একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। দুই সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বৈত লড়াইয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে টেলিম্যাকাস নামে সুদর্শন মহাপ্রাণ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন দু জনের মাঝখানে। তারপর দুই হাত তুলে করযোড়ে আবেদন জানালেন এই মরণ খেলা বন্ধ করতে। তখন রক্ত পাগল দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ধৈর্যচ্যুত হয়ে সেই সন্ন্যাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো। সেই বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটার কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুর মত স্তব্ধ হয়ে রইলো। অনুশোচনায় সবাই পাথরের মত নীরব। পরম বেদনায়, শোকে আপ্লুত হলো সকলের হৃদয় মন, সর্বদেহ। স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো সমবেত দর্শকদের সেদিন কালো

দ্বন্দ্ব বন্ধ করার অনুরোধে। বলা বাহুল্য, বন্ধ হয়েছিল সেই সন্ধ্যার দ্বন্দ্ব। তারপর রোমান সাম্রাজ্য থেকে এই কালোদ্বন্দ্ব দূরীভূত হতে খুব বেশি দেরি হয়নি। আমরা কল্পনা করি, সেদিন কালোদ্বন্দ্বের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সমস্বরে ধ্বনি তুলেছিল—টেলিম্যাকাস্ মৃত, টেলিম্যাকাস্ চিরজীবি হোন্, টেলিম্যাকাস্ জিন্দাবাদ।

ক্যামিলো বেনসো ডি ক্যাভর এবং গ্যারিবাল্ডির নেতৃত্বে আধুনিক রোমের জন্ম হয় ১৮৬১ সালে। রোমকে বর্তমানে ইতালি বলা হয়। ইতালি স্বাধীনতা লাভের পরে শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রথম পদক্ষেপ জিমনাস্টিককে সামরিক কাজে ব্যবহার করার বদলে বিদ্যালয়ের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে ব্যবহার করা। সালটা ছিল ১৮৭৮। পরবর্তীকালে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় এসে অবিলম্বে শারীর শিক্ষার একটি পৃথক বিভাগ খোলে। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রকের একটি শাখা হিসাবেই বিবেচিত হলো শারীর শিক্ষা বিভাগ। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সপ্তাহে চার ঘণ্টার কর্মসূচীতে যুক্ত করা হলো, মার্চিং, খালি হাতে নানা রকম ব্যায়াম, যন্ত্র সহযোগে জিমনাস্টিক, দলগত খেলা ও এ্যাথলেটিকস্। আর শিশুদের জন্য মণ্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে পড়াশুনা। তার সঙ্গে শিশুদের উপযোগী কিছু কিছু ব্যায়াম।

আধুনিক রোমের শারীর শিক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিম্নক্লাশের শিশুদের জন্য ছন্দযুক্ত শরীর চর্চা, কিছু খেলা এবং তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্ট নানা প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন প্রচলিত করা হয়। তবে এখনও সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার চর্চা সুরু হয়নি। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের এ্যাথলেটিকস্, ভলিবল, বাস্কেটবল এবং অন্যান্য কিছু ব্যায়াম শেখানো হয়। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য আছে মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি খেলা, জিমনাস্টিক এবং কয়েকরকম ব্যায়াম যেগুলি ছন্দের সঙ্গে অর্থাৎ তালে তালে করা হয়। যে ছাত্রছাত্রীদের কিছু সামান্য শারীরিক ত্রুটি আছে তাদের জন্য পৃথক কয়েকটি জিমনাস্টিকের ব্যায়াম ধার্য করা আছে সেগুলি সারিয়ে দেবার জন্য। প্রসঙ্গত, যোগাসনের অভ্যাস দ্বারা ভারতে নানারকম রোগ এবং শারীরিক ত্রুটি নিরাময় করা হয় এবং বর্তমানে পৃথিবীর নানাদেশে এইজন্য যোগাসন খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

ইতালিতে বর্তমানে বিদ্যালয় পর্যায়ে খেলাধূলার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই সর্বরকম

ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ সুরু করা বাঞ্ছনীয়। শরীর গঠন এবং ক্রীড়াপ্রতিভা বিকাশের জন্য এই সময় থেকেই নিয়মিত চর্চা এবং প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্তঃ বিদ্যালয়, আন্তঃ রাজ্য, আন্তঃ অঞ্চল, এমন কি জাতীয় পর্যায়েও এ্যাথলেটিকস্, জিমনাস্টিক, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, সাঁতার, অসিচালনা, স্কিইং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষকরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের খেলাধুলা পরিচালনা করেন। লক্ষ্যণীয়, বিদ্যালয় পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। ইতালিতে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্যত্র ফুটবল খেলে।

শারীর শিক্ষাদান পদ্ধতি সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ১৯২৮ সালে সরকার কর্তৃক ইতালিতে এ্যাকাডেমি অফ ফিজিকাল এডুকেশন স্থাপিত হয়। অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখানে ছাত্ররা ভর্তি হতো। দুই বছরের ডিগ্রী পাঠক্রম এবং ছয় বছর গবেষণার ডক্টরেট পাঠক্রম এখানে প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শারীর শিক্ষায় ডিপ্লোমা দেবার জন্য স্থাপিত হয় শারীর শিক্ষার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলি ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত। শারীর শিক্ষা তো শুধু মাঠে বা জিমনাসিয়ামের শরীর চর্চা নয়, এর তাত্ত্বিক অংশও কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। এই জন্য তাত্ত্বিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর ব্যবহারিক অংশগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাইরে দক্ষ ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সনে ইতালিতে শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

একথা অনেকেরই অজানা যে, ইতালিতে ক্রিকেট খেলার জন্য ক্লাব হয়েছিল। ১৮৯৩ সনে জেনোয়াতে একই সঙ্গে ফুটবল এবং ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত, অল্প দিনের মধ্যেই ক্রিকেট ক্লাব উঠে গেল। ফুটবলের অগ্রগতি অব্যাহত রইলো। তার উন্মাদনা আর গতিবেগ আন্দোলিত করলো ইতালির সহস্র সহস্র মানুষকে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া সংস্থা ইতালির জাতীয় অলিম্পিক গঠিত হয় ১৯৪২ সালে। ফুটবল খেলার লটারি টিকিটের থেকে সংগৃহীত অর্থের সিংহ ভাগ জমা পড়ে এই অলিম্পিক কমিটির তহবিলে এবং এই অর্থ ব্যয় হয় দেশের নানা ক্রীড়াচর্চার উন্নতি কল্পে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৪ সনে পেশাদার অ্যাথলীট তৈরী

করার মানসে ৬০টি যুবকেন্দ্র স্থাপিত হয়। তৈরি হয় একলক্ষ আসন যুক্ত বিশাল স্টেডিয়াম যেখানে বসেছিল ১৯৬০ সালের বিশ্ব অলিম্পিক আসর। এই স্টেডিয়ামে জিমনাস্টিক, অসিচালনা, সাঁতার, টেনিস ও বাস্কেটবল খেলার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। ফুটবল ও অ্যাথলেটিকস্ তো আছেই।

ইতালীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলার মধ্যে প্রথমেই ফুটবল। তারপর স্কিইং, অসিচালনা এবং নৌকা, সাইকেল ও মোটর রেস। শুধু খেলার খবর প্রচারের জন্য এখানে চারটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

শারীর শিক্ষার ইতিহাসে ইতালীর সবচেয়ে প্রধান দান হলো মেরিয়া মণ্টেসরির প্রাথমিক শিশু শিক্ষার্থীদের খেলার মাধ্যমে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি। সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা পদ্ধতিতে এক বিপ্লব আনয়ন করেছে মন্টেসরি পদ্ধতি যার ফলে বলা যায় সব মহাদেশেই নার্শারী স্কুলের মহা মেলা বসেছে বিংশ শতাব্দীতে।

ভারতবর্ষ

ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনতায় সন্দেহের অবকাশ নেই এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, আর্যদের আগমনের পূর্বেও এখানে সভ্যতার ঘাটতি ছিল না। মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার আবিষ্কার এই সত্যকে উজ্জ্বলতর করেছে। এরই নাম সিন্ধু সভ্যতা যার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সুবন্দোবস্তযুক্ত নগর নির্মাণ। ঐ সব নগরবাসীদের খেলাধূলা ও শরীর চর্চার বিষয় প্রায় সবটাই কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মধ্যেও কিছু স্পষ্ট ছবি পরিলক্ষিত হয়। মহেঞ্জোদরোর মৃত্তিকার গর্ভে যে বিশাল স্নানাগারটি আবিষ্কৃত হয়েছে তার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। এর মধ্যে স্নানার্থীদের সুবিধার্থে পরিচ্ছদ পরিবর্তনের জন্য পৃথক কক্ষ ছিল এবং তলা পর্যন্ত সিঁড়ি ছিল একেবারে আধুনিক সুইমিংপুলের মত। আর ছিল চতুর্দিকে বসার জন্য গ্যালারির মতন স্থায়ী আসন। মনে হয়, দর্শকদের জন্য এই আসন তৈরি হয়েছিল সাঁতার কিংবা কোনও রকম জলক্রীড়া দেখার জন্য, স্নানার্থীদের স্নান দেখার জন্য নিশ্চয়ই নয়। এই বিশাল স্নানাগারের জলপূর্ণ অংশের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ৩৯ ও ২৩ ফুট এবং ৮ ফুট গভীর।

সিন্ধু-সভ্যতায় শরীর চর্চা ও ক্রীড়া

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় শিশুদের খেলার জন্য মাটির তৈরি নানা আকৃতির পাখি ও বাঁশি পাওয়া গেছে। এগুলির গঠন-সৌন্দর্য খুবই আকর্ষণীয়। চক্রের উপর পাখির মাথা বসানো খেলনা আর ঘাড়-দোলানো মনুষ্য-মূর্তিগুলি অপূর্ব কৌশলে নির্মিত। এই খেলনাগুলি হাতে পেলে আজকের দিনের শিশুরাও আনন্দ উপভোগ করবে। প্রাপ্তবয়স্করা শিকার ব্যতীত অন্য কোনও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতো কিনা তা জানা যায় না তবে যুদ্ধ বিদ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট দেহ চর্চা সম্ভবত তাদের অবশ্য কর্তব্য বিষয় ছিল।

আর্যরা কোনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রহস্যাবৃত জাতি ছিল না। প্রাণশক্তি ও সাহসিকতায় পূর্ণ এই জাতির পরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে জওহরলাল নেহেরু বলেছেন—"ঐ দেখ গিরিপথ ধরে অনিশ্চয়তা ভরা এক অজানা দেশের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেশে তারা সারিবদ্ধভাবে নেমে আসছে। মৃত্যুভয়কে

প্রাচীন আর্যদের শারীর শিক্ষা

উপেক্ষা ক'রে তারা এগিয়ে চলেছে, কারণ তারা জীবনকে ভালবাসে। তারা জানে ও মানে যে, জীবনকে উপভোগ করতে হলে চাই নির্ভীক হৃদয় আর সর্বরকম পরাজয় ও সর্বনাশের চিন্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"

দীর্ঘকায়, বলশালী আর্যদের শরীর চর্চায় অবশ্যই বিশেষ দৃষ্টি ছিল কারণ তখন তারা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে শক্তি ও ক্ষিপ্রতা ছিল সাফল্য লাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য দেবতাদের কাছে তাদের প্রার্থনার বিষয় ছিল এই রকম :—

"আমার কন্ঠে দাও স্বর, নাসিকায় নিঃশ্বাস,
চক্ষুতে দৃষ্টি, কর্ণে শ্রবণ, মাথায় কৃষ্ণকেশ,
হরিদ্রাবর্ণ দন্তরাজি আর বাহুতে দাও প্রবল বল।
উরুর পেশীতে দাও শক্তি, পদযুগলে দাও গতির দ্রুততা,
শরীরে দাও সিংহ ও ব্যাঘ্রের শক্তি,
এবং অন্তরে অগ্নি, সূর্য ও ব্রাহ্মণের তেজ।"

অথর্ব বেদে এই প্রার্থনা লিপিবদ্ধ আছে।

আর্যদের শিকার-প্রীতি তাদের অবসর যাপন ও দুঃসাহসী ক্রীড়ার অন্তর্গত। সিংহ, হরিণ ও পক্ষী শিকার ছিল তাদের অধিক প্রিয়। সিংহ শিকারে প্রয়োজন ছিল সাহস ও শক্তির, পক্ষীশিকারে মনঃসংযোগ ও লক্ষ্যের অব্যর্থতা আর হরিণ শিকারে তীব্রগতির দৌড়।

প্রত্যেক দেশেই তার নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মবোধ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তার শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "দেশ শুধু ভূগোলের অংশ নয়, তার একটি মনোমণ্ডল রয়েছে। এই মনোমণ্ডল ভূ-ভাগকে এক অদৃষ্ট আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে। সমস্ত দেশকে সে-ই দেয় অন্তরের ঐক্য।" ভারতবর্ষ ছিল তখন এক ধর্মনির্ভর ও ধর্মদ্বারা বেষ্টিত দেশ। অতএব, তার শিক্ষাদর্শও ছিল ধর্ম-সম্বলিত। শারীর শিক্ষাতেও তার ছায়া পড়েছিল। সূর্য নমস্কার ও প্রাণায়াম এই দুই শরীর চর্চার নামকরণেই রয়েছে ধর্মের সুবাস।

সূর্য নমস্কার

সূর্য নমস্কার হলো কয়েকটি ব্যায়াম সমষ্টির নাম। সূর্যোদয়ের কালে সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে সূর্যস্তব উচ্চারণ করে এই ব্যায়ামগুলি করার প্রথা ছিল। সূর্যই সর্বশক্তির আধার, তাই তাকে প্রণাম নিবেদিত হতো মন্ত্রোচ্চারণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে। উষাকালই ব্যায়ামের

প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় বায়ু ও মন উভয়ই পবিত্র থাকে। এই জন্য আর্য ঋষিরা সূর্যোদয় কালকে ব্যায়ামের উপযুক্ততম কাল স্থির করে-ছিলেন। এই ব্যায়ামে অতি অল্প সময়েই শরীরের জড়তা দূর হয় এবং রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হয়। এর ফলে, দেহ যন্ত্র যে কোনো কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই ব্যায়ামে শ্বাসযন্ত্র সবল ও স্নায়ুমণ্ডল সতেজ হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গের পেশী মজবুত ও সুগঠিত হয়।

প্রাণায়াম

প্রাণায়ামও অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। হিন্দুশাস্ত্রে প্রাণায়ামের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে—

প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিত ঃ
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচপূরককুম্ভকৈ ঃ।
-যোগী যাজ্ঞবল্কম্।

অর্থাৎ, প্রাণ ও আপন বায়ুর পরস্পর সংযোগের নাম প্রাণায়াম। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম কার্য সম্পন্ন হয়। প্রাণায়াম এক প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। পেটকে বায়ুমুক্ত করার নাম রেচক। বাহিরের বায়ু দেহে প্রবেশ করানোর নাম পূরক এবং দেহের অভ্যন্তরে নিশ্চলভাবে বায়ু ধারণকে বলে কুম্ভক।

প্রাণায়াম চার প্রকার ঃ—(ক) সহজ প্রাণায়াম, (খ) লঘু প্রাণায়াম, (গ) বৈদিক প্রাণায়াম ও (ঘ) রাজযোগ প্রাণায়াম। শেষোক্ত দুইটি অত্যন্ত দুরূহ। সহজ ও লঘু প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া জটিল নয়। এগুলি অভ্যাসে দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি সুস্থ ও সবল হয়। ফলে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রাচীনকালে হিন্দুদের দীর্ঘায়ু লাভের উপায় ছিল প্রাণায়াম অভ্যাস।

প্রাচীন ভারতের শরীর চর্চার আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় ছিল দেহমর্দন। তৎকালীন ভেষজ বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই এর উপকারিতা সম্পর্কে সোচ্চার। আয়ুর্বেদাচার্য চরক দেহ মর্দনকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—মর্দণম, সম্ভাহনম্ এবং উন্তাদনম্।

দেহমর্দন

মর্দণম, প্রক্রিয়ায় বেশ জোরের সঙ্গে মালিশ করার নিয়ম। সম্ভাহনম্ রক্ত চলাচল, ক্লান্তি অপনোদন, পেশীবৃদ্ধি ও দেহের চামড়াকে লাবণ্যময় করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আলগা ভাবে এই মালিশ করা হতো। আর উন্তাদনম ছিল দেহের স্নায়ুগুলিকে সতেজ করার প্রক্রিয়া!

ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক কঠোর শৃংখলা ও সংযমের জীবনের নাম ছিল ব্রহ্মচর্য। শিক্ষক বা গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্য পালনে ছাত্রদের

দৈহিক শুচিতা ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষিত হতো। যার ফলে, তারা উন্নত স্বাস্থ্য ও অসাধারণ মেধার অধিকারী হতো। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর চর্চার সাহায্যেই মেধা বৃদ্ধি হতো এবং ছাত্রদের পক্ষে গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানরাশি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা সম্ভব হতো। অর্থাৎ, মনন শিক্ষারও ভিত্তি ছিল শারীর শিক্ষা। গুরুর জন্য গাছ কেটে আনা, কুয়ো থেকে জল তোলা প্রভৃতি শরীর চর্চা ছিল ছাত্রদের নিত্য কর্ম।

ব্রহ্মচর্য

শারীর শিক্ষা সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য

বেদব্যাস—'সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হবে যার খাদ্য ও কর্ম বা ব্যায়াম সুনির্দিষ্ট, সব কাজে শ্রম ও বিশ্রাম সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং যার দৈহিক কর্ম সময় নিদ্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

আয়ুর্বেদের রচয়িতা চরক ঃ—"ব্যায়াম হলো সেই শারীর ক্রিয়া যা পেশীকে দৃঢ় করে এবং অন্তরে সাহস সঞ্চার করে। সেই ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান আখ্যা দেব যার দৈনন্দিন কার্য, বিশ্রাম ও আহারের সময় এক; যে আনন্দ রস আস্বাদন করতে পারে; যে কার্যের পরে নয়, পূর্বেই চিন্তা করে; যে পাপ কার্যে লিপ্ত হয় না; দানে যে উদার হস্ত, সব প্রাণীর প্রতি যার দৃষ্টি সমান এবং যা পেল তাতেই সন্তুষ্ট।" এখানে শারীর শিক্ষা যে মানব ধর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই সত্যও ঘোষিত হলো।

চরকের আরো কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি ঃ—

(ক) সিংহ সান্নিধানে ক্ষুদ্র জীবের গমন যেমন দুঃসাধ্য তেমনি শারীরবিদের শরীরে রোগের প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ।

(খ) যে ব্যক্তি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করে তাকে আকর্ষণীয় দেখাবেই, যতই সে বার্ধক্যে রূপহীন কিংবা জন্মগত অসুন্দর হোক না কেন।

(গ) নিয়মিত শরীর চর্চাকারী সর্বরকম খাদ্য সহজেই পরিপাক করার ক্ষমতা রাখে তা সে খাদ্য পোড়া বা অল্প সিদ্ধই হোক!

(ঘ) দেহের মেদ হ্রাসের জন্য শরীর চর্চার বিকল্প কিছু নেই।

(ঙ) যে কোনো শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তির পূর্বে ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি শিক্ষা-কেন্দ্রেই স্বাস্থ্যরক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান প্রয়োজন।"

সুশ্রুত ঃ—"তাকেই বলি ব্যায়াম যে ক্রিয়া শরীরকে পরিশ্রান্ত করে তোলে এবং রক্ত প্রবাহে আনে তীব্রগতি আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দ্রুতগতি।'

আয়ুর্বেদের অপর রচয়িতা বাণভট্ট ঃ—"শরীর চর্চার আদর্শ হওয়া উচিত শারীরিক ক্ষিপ্রতা, সর্বকর্মক্ষম দেহ, ক্ষুধার উদ্রেক, মেদ পরিহার এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলী ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের উন্নতি সাধন।

লাঠিখেলা, তরবারি চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, হস্তী ও অশ্বারোহণ পদচারণা প্রভৃতি শারীরক্রিয়া প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। আবার ৫ থেকে ১০ সের ওজনের লোহার বল দোলানো ছিল একটি ব্যায়ামের পদ্ধতি। এই ব্যায়ামের নাম ছিল সন্তলস। আরো ব্যায়াম ছিল, ধনুকের গুণ জোরে টেনে ধরা এবং ধনুক বাঁকানো। এই ব্যায়ামদুটির নাম ছিল যথাক্রমে গুণকর্ষ ও ধনুরকর্ষ।

প্রাচীন ভারতের আরও কয়েকটি শরীর চর্চা

মৃগয়াও ছিল উল্লেখযোগ্য শরীর চর্চা। দেশে শান্তি থাকাকালীন রাজারা সাধারণত বৎসরে ছয় মাস মৃগয়ায় নিযুক্ত থাকতেন। সৈন্য সামন্ত সমেত এই মৃগয়ার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, শিকারের আনন্দ ও লক্ষ্যভেদের তৃপ্তি। দ্বিতীয়ত, সেনাবাহিনীকে ধনুর্বান ও বর্শা নিক্ষেপে অভ্যস্ত রাখা এবং সেই সঙ্গে তাদের শরীরকে সচল রাখা।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পাশাপাশি ঋষিরা যোগাসন অভ্যাস প্রণালী রচনা করে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাবলীর ক্রিয়া অটুট রাখা ও তদ্বারা নানা রোগ নিরাময়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

যোগাসনের ন্যায় মুদ্রাও একরকম শারীর ব্যায়াম। মুদ্রা অভ্যাসে দেহের অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি কর্মক্ষম ও সুস্থ থাকে। মুদ্রা শব্দের এক অর্থ আনন্দ। মুদ্রা অনুশীলনে দেহ ও মনের অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ হয় এবং বিশেষ কল্যাণ সাধন হয়। পঁচিশটি মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় ঘেরন্ড সংহিতায়।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় শারীর শিক্ষার আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেবলমাত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী শক্তি ও ক্ষীপ্রকারিতাই তৎকালীন যুগে শরীর চর্চার চরম উদ্দেশ্য ছিল না। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাবলীকে অটুট রাখা ও শক্তিদান করাকেও সমগুরুত্ব দান করা হতো। স্বাস্থ্যচর্চা সম্পর্কে এরূপ অখণ্ড, সামগ্রিক চিন্তাধারা পৃথিবীর অপর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। এমন কি, প্রাচীন শারীর শিক্ষা জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গ্রীসেও নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতাগণ চিরকালই দক্ষিণ ভারতের চেয়ে আর্যাবর্তকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যার ফলে, সেখানকার শারীর শিক্ষা সম্পর্কেও আমাদের ধারণার গণ্ডী বৃহৎ নয়। অথচ, ভারতের

প্রাচীনতম বাসিন্দাদের বাস এখানেই ছিল। বৈদিক আর্য সভ্যতার পূর্বেও এখানে তাদের জীবন যাপনের নজির পাওয়া গেছে। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকার দরুণ এখানকার অনেক খবর ওখানে পৌঁছায়নি। যেমন পৌঁছায়নি ইহজগতের অসারতা সম্পর্কে আর্যদের ঘোষণা। এই ভুবনেই যে আনন্দধারা বয়ে চলেছে তার অমৃতসুধা পান করে দক্ষিণীরা তৃপ্তি পেত। তাই, তাদের অনেক ধর্মানুষ্ঠানেই সঙ্গীত, নৃত্য, মূকাভিনয় ও নানারকম খেলায় মুখর ছিল।

দক্ষিণ ভারত

সমাজে অনেকগুলি শারীর চর্চাযুক্ত খেলা প্রচলিত ছিল। লাঠি ও অসি খেলা, মল্লক্রীড়া, রথ চালানো প্রতিযোগিতা, খেলার সঙ্গীকে বেগে ধাওয়া করা প্রভৃতি খেলা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আবার, দু'টি অভিনব প্রতিযোগিতা ছিল হাতি ও ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়ে দৌড়। আর একটি অতি প্রাচীন খেলায় ছোট ও বড় দুই রকম লাঠি ও বল দিয়ে বালকরা খেলতো। এই খেলার নাম ছিল "কিট্টিপুল।" তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম ছিল "জাল্লিকাটু।" একটি ঘেরা স্থানে এক যুবক ও এক ষাঁড়ের খেলা। গোলাকার গ্যালারির মত আসনে ব'সে দর্শকরা রুদ্ধ শ্বাসে সেই খেলা উপভোগ করতো। খেলাটি ছিল এইরকমঃ— যুবকটি ষাঁড়টিকে অনবরত তাড়া করতে করতে সময় বুঝে তার পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাগে আনতে বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতো। এই লোমহর্ষক খেলায় মাঝে মাঝে সাফল্যবানদের পুরস্কার ছিল সুন্দরী যুবতীর বিবাহ-মাল্য। সমাজে এই খেলোয়াড়রা সকলের প্রশংসাধন্য হয়ে বিচরণ করতো।

ছোট বালকদের প্রিয় খেলা ছিল চাকাওয়ালা কাঠের গাড়ী দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া ইত্যাদি। ছোট ছোট মেয়েরাও খুব দোলনায় দুলতো আর জলাশয়ে সাঁতার কেটে কেটে শ্রান্ত হয়ে যখন উঠে আসতো তখন তাদের নীল নীল চোখ লাল হয়ে উঠতো।

রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থই তৎকালীন বীরদের শৌর্য বীর্যের বর্ণনায় উত্তাল। প্রায় সব বীরদের চরিত্রই একাধারে অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য ও অপর দিকে মানবিক গুণাবলী ও উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল। তাঁদের শিক্ষায় শরীরচর্চা ও জ্ঞানচর্চার সমন্বয় ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণের নায়ক রাম ও তাঁর ভ্রাতাদের শিক্ষার ভার ছিল জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপর। ধনুর্বিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁরা

অচিরেই দক্ষ হয়ে উঠলেন। তন্মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁরা তারকা ও অন্যান্য অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে বিস্ময়কর ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়েছিলেন। ধনুর্বিদ্যাই ছিল সেই যুগের শারীর শিক্ষার সর্বপ্রধান বিষয়। কারো কারো ধনুক ছিল ওজনে খুবই ভারি ও শক্ত। এই রকমই একটি ধনুকে ছিলা পরিয়ে তারপর সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে রাম মিথিলার রাজকন্যা সীতাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা জনক সীতার পাত্র নির্বাচনের নিমিত্ত গৃহে রক্ষিত শিবের ধনুকে ছিলা পরাবার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। একে শারীর শিক্ষার এক দুরূহ পরীক্ষা বলা যেতে পারে অনায়াসেই। মহাকাব্যের যুগে দৈহিক বলের বিশেষ গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে এই প্রতিযোগিতা। ভারতের বহু নৃপতি ও বীরেরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই শক্তি পরীক্ষায়। মনে রাখতে হবে, এটি স্বয়ংবর সভা নয়, শক্তিমানদের শক্তি পরীক্ষার সভা। সেখানে বিজয়ীর পুরস্কার রাজকন্যার বিবাহ-মাল্য।

জীবনের মধুরতম সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাত্রের ধন নয়, মান নয়, প্রবল শক্তির অধিকারী হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি, এটাই এখানে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আবার, রামের রূপ বর্ণনায় মহাকবি উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রশস্ত বক্ষের, আয়ত নেত্রের, সুন্দর মুখমণ্ডলের, পরিমিত সবল সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের সঙ্গে সবলতার সহাবস্থানেই রূপের জন্ম। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল অনুরূপ। মহৎদের চিন্তাধারায় মিল থাকতেই পারে। রামচন্দ্র শুধু শক্তিমান নন, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। শারীর শিক্ষায় শিক্ষিত রামচন্দ্র মহত্ত্বে, শক্তিতে ও বীরত্বে—দেবত্বে উন্নীত।

শরীর চর্চা সে যুগে শুধু আর্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আর্যদের দ্বারা যারা অসুর, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত হতো ভারতের সেই মূল অধিবাসীরাও শরীর চর্চায় অনগ্রসর ছিল না। তাদের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত ছিল মল্ল ক্রীড়া। এই ব্যায়াম দেহে প্রবল বলের সঞ্চার করে। তাদের বাহুবলেরও অজস্র নজির আছে রামায়ণের লংকাকাণ্ডের পাতায় পাতায়। রাবণের সব মারাত্মক অস্ত্রধারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামের সৈন্যদের দ্রুত পাথর নিক্ষেপ তাদের বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা ও বাহুশক্তির সাক্ষী বহন করে। অনার্যরাজ রাবণ ও তাঁর দেশের লোকেরা অবশ্য ধনুর্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিল। এই বিদ্যা তখন

যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হওয়ায় বিভিন্ন সেনাবাহিনী ও রাজপরিবারের মধ্যে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ধনুর্বিদ্যা দীর্ঘ অনুশীলন সাপেক্ষ এক কঠিন বিদ্যা। দুই মহাকাব্যে নানারকম আশ্চর্য ধনুর্বিদ্যার উদাহরণ পাওয়া যায়। শুধু শব্দশ্রবণে লক্ষ্য ভেদ, তীরের পিছনে তীর নিক্ষেপ দ্বারা কূপ থেকে কাঠের বল তুলে আনা, অনার্য বীর গুহকের পায়ের দ্বারা ধনুক ধারণ করে তীর নিক্ষেপ, একলব্যের তীরদ্বারা এক কুকুরের মুখ বন্ধ করা—এমনি আরও কত দুরূহ ধনুর্বিদ্যার কৌশলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মল্লবিদ্যায় পারদর্শিতার নিদর্শন মেলে বালী সুগ্রীবের দ্বৈতদ্বন্দ্বে ও ভীম বনাম কীচক ও জরাসন্ধের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মনে হয়, বর্তমান যুগের "মুক্ত-কায়দা"র কুস্তির পূর্ব রূপ। মহাভারতের যুগে মল্লক্রীড়ায় অপারদর্শী বীর বিরল ছিল। সেই যুগের শারীর শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উজ্জ্বল সাক্ষী বহন করে মল্লবিদ্যা।

গদা সঞ্চালন বিদ্যাও রামায়ণ মহাভারতের যুগের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য শারীরবিদ্যা। অবশ্য, রামায়ণের চেয়ে মহাভারতেই এই বিদ্যার প্রচলন বেশি উল্লিখিত। গদা সঞ্চালন রীতিমত অনুশীলন সাপেক্ষ বিদ্যা হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এর শিক্ষাদান পরিচালিত হতো। যেমন খুসি গদাঘাত ছিল একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ। মহাভারতে শল্যপর্বের শেষাংশে ভীম-দুর্যোধনের শেষ গদাযুদ্ধের বর্ণনায় তার প্রমাণ মেলে। শক্তির চেয়ে কৌশলের মূল্য গদা যুদ্ধে অধিক ছিল। যে যুগের গদাযুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের নামও উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। মন্ডলগতি, প্রত্যাগতি, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, রঞ্জন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, অপেক্ষ, বিগ্রহ, পরিবর্তন, সাবর্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত উপন্যত ইত্যাদি ছিল বিভিন্ন কৌশলের নাম।

মহাভারতের যুগে ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই বিভিন্ন প্রকার শারীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তবে, রাজবংশীয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বীরদের মধ্যে সম্ভবত সীমাবদ্ধ ছিল ধনুর্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, গদা সঞ্চালন, তরবারি শিক্ষা, শূল ও বর্শা নিক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে হাতীচড়া ও রথচালনা শিক্ষা, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায় এই বিদ্যাগুলির প্রয়োগ সাধারণ সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তাদের হাতে যে অস্ত্রগুলি ছিল সেগুলির নাম হলো—তোমর (লোহার কাঁটা পরানো ডাণ্ডা), দড়ির ফাঁস, কচগ্রহ বিক্ষেপ (লম্বালাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠাযুক্ত—দূর

থেকে শত্রুর কেশ আকর্ষণের জন্য), কোদাল, দা, কুঠার, লাঙ্গল ইত্যাদি। এই অস্ত্রগুলির প্রয়োগে কোনো রকম শারীর শিক্ষার সাহায্যে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। অতএব, অনুমেয়, শারীর শিক্ষার ব্যাপক চর্চা নিম্নবর্ণের চেয়ে উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে ছিল।

খুব স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য প্রাচীন দেশের মত ভারতেও শারীর শিক্ষাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালে তার সার্থক ব্যবহার। তখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতো মাঝে মাঝেই। সুতরাং, শারীর শিক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই তখন এক মহান বস্তু হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। বীর যোদ্ধাদের জয়গান ছিল সর্বত্র এবং অতীতের বীর কীর্তির গাথা শুনিয়ে বালক ও যুবকদের মনে যুদ্ধের বাসনা জাগ্রত করা হতো। সেখানেই শেষ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মরণ বরণ ছিল পরম সৌভাগ্যের ঘটনা। তাদের জানানো হতো যে, মৃত্যুর পরে তারা স্বর্গের দরজা খোলা পাবেই।

মহাভারত যুগের শারীর শিক্ষা প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্বে একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করি। যে ব্যক্তিরা তৎকালে শারীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বীর আখ্যা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই জ্ঞান ও মানবিকতায়ও সমৃদ্ধ ছিলেন। জ্ঞান চর্চা ও শারীর চর্চার সমন্বয় সাধন করে সেই যুগকে তাঁরা মহিমান্বিত করেছিলেন। তখন গাণ্ডীবের টংকার আর শুদ্ধ শাস্ত্রোচ্চারণ সমস্বরে ধ্বনিত হতো ভারতবর্ষের হাওয়ায় হাওয়ায়।

বৌদ্ধযুগে শারীর শিক্ষা

প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত ভ্রমণ বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছেন শাক্যবংশের অন্যান্যদের সঙ্গে সিদ্ধার্থের নানা খেলাধূলায় অংশগ্রহণের কথা, ব্যায়াম চর্চায় তাঁর সকলকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা এবং ধনুর্বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ কুশলতার খবর। বুদ্ধদেবের পরবর্তী জীবনের সাধনা ও তপোবল যে দুর্জয় শক্তি অর্জন করেছিল তার পিছনে এই শারীর শিক্ষার অবদান উপেক্ষণীয় নয় কখনোই। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, শরীর পাতনে মুক্তি নেই।

অহিংসার প্রবক্তা বুদ্ধদেবের নিজের জীবনও ছিল এক সংগ্রামের কাহিনী। অন্তরের সংগ্রাম ছিল দ্বন্দ্বের আর বাহিরের সংগ্রাম ছিল ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, তাদের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, বেদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে। তবে তাঁর সংগ্রামে অবশ্যই প্রয়োগ ছিল

না ধনুর্বান কিংবা বর্শার। তার বদলে ছিল অসম সাহস, চরম সামর্থ্য এবং মাত্রাতীত মানস শক্তি। আমরা জেনেছি, শারীর শিক্ষায় পেশীবলের সঙ্গে আপনা হতেই যুক্ত হয় দুর্জয় সাহস ও সামর্থ্য আর সঙ্গে কেউ না থাকলেও একলা চলার মনোবল।

একথা অনস্বীকার্য যে, বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতির প্রভাবে ও প্রচারে জনসাধারণের যুদ্ধের প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে সম্রাট অশোকের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যুদ্ধ এক জঘন্য হত্যা লীলা ছাড়া আর কিছু নয় এবং কোনও যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ নয়। তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয় যে, এই যুগে শারীর শিক্ষার পতাকা অবনমিত ছিল, কারণ আমরা জানি এই যুগেই পাতঞ্জলি আসন সমেত যোগকে প্রণালীবদ্ধ করেছিলেন এবং দেশবাসীর মধ্যে সূর্য নমস্কার ও যোগাসনের অভ্যাস পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। নালন্দায় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ জ্ঞান অনুশীলনের পাশাপাশি বিরাজ করতো শারীর শিক্ষার কত উপকরণ—সন্তরণ, মল্লক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ, অসিচালনা, ধনুর্বিদ্যা, রথ চালনা, হাতীচালনা এবং বলের নানারকম খেলা। চিকিৎসাবিদ্যাও সেখানে শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও কয়েকটি শরীর চর্চা বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল।

অপর বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল তক্ষশিলায়। অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্যার সঙ্গে এখানে নৃত্য, ধনুর্বিদ্যা এবং কয়েকটি সামরিক বিদ্যাও ছিল শিক্ষার বিষয়। ঐ যুগে ভারতে তক্ষশিলা ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। এখানে বিভিন্ন রাজ্যের ১৬৩ জন রাজপুত্র ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। প্রতি ২০ জন ছাত্রকে একজন নিপুণ ধনুর্ধরের অধীনে রেখে সকলের উপরে একজন পরিদর্শক থাকতেন। শিক্ষার্থীরা বছরের যে কোনো সময় এখানে ভর্তি হতে পারতো কিন্তু শিক্ষা পর্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার সমাপ্তি ছিল না।

বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারেও অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে শারীর শিক্ষা প্রদত্ত হতো আবশ্যিক ভাবে।

সঠিক কথা হলো এই যে, বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসাবাদ দেশবাসীর যুদ্ধ প্রবৃত্তিকে হ্রাস করলেও শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব অটুট ছিল। প্রসঙ্গত, বৌদ্ধ ধম্মপদের একটি উক্তি স্মরণীয়—চরম শান্তি নির্বাণ, পরম মিত্র বিশ্বাস, অমূল্য ঋদ্ধি সন্তোষ আর শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি সুস্বাস্থ্য।

বৌদ্ধধর্মের চেয়ে জৈনধর্মে অহিংসার কঠোরতা আরও বেশি ছিল এবং স্বভাবতই সমাজে তার প্রতিফলনও ছিল, কিন্তু তা সর্বত্রগামী ছিল না। সেই কারণেই জৈন সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যুদ্ধবিদ্যায় সাফল্যের উদ্দেশ্যে রাজা অঙ্গবহির প্রত্যুষকালে ব্যায়ামাগারে পদার্পণ ও অঙ্গ প্রতঙ্গের নানারকম ব্যায়াম সম্পাদন, লাফানো, মল্লক্রীড়া প্রভৃতির দ্বারা ঘর্মাক্ত হওয়া ও তারপর মর্দন বিদ্যায় কুশলী কোনো ব্যক্তির দ্বারা তৈল সহকারে দেহমর্দন এবং অতঃপর অবগাহন স্নান ও সন্তরণ। অন্যত্র দেখা যায়, কোনো ব্যক্তির বিনা লাগামে বন্য অশ্বারোহণে বনপথে যাত্রার কাহিনী—কেবল শব্দ শ্রবণে অদৃশ্য কোনো বস্তুতে লক্ষ্য ভেদ—বিদ্যুৎ গতিতে শূন্যে তরবারি ও গদা সঞ্চালন ইত্যাদি শারীর শিক্ষার উদাহরণ।

প্রায় ৩৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় হিন্দু রাজা পুরুর বীরত্ব কাহিনী সর্বজনবিদিত, ছয়-ফুটের উপরে সেই দীর্ঘদেহী প্রচণ্ড বলশালী পুরুর বর্শা নিক্ষেপের প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন গ্রীক ইতিহাসবিদেরা এবং সেই দৃষ্টিনন্দন নিক্ষেপভঙ্গীকে মানসপটে ধরে রাখার বাসনায় স্বয়ং আলেকজাণ্ডার বর্শা-নিক্ষেপরত পুরুর ছবি সহ একটি মুদ্রা প্রচলিত করেন। শুধু তাই নয়, গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে ভারতীয়দের রণকৌশল ছিল এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শারীর শিক্ষায় বিশেষ দক্ষতা না থাকলে রণক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা তখন সম্ভব ছিল না। সুতরাং দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, হস্তীচালনা, ব্যায়াম, তরবারি চালনা, এইসব শারীর শিক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা নিঃসন্দেহে সুশিক্ষিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে গ্রীক ইতিহাসবিদ অ্যারিয়ানের ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ পদ্ধতির বর্ণনার বেশ প্রাসঙ্গিক হবে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন ও মৌর্য যুগে শারীর শিক্ষা

পদাতিক সৈন্যের ধনুক ছিল উচ্চতায় তার নিজের মাথা সমান। ধনুকটিকে খাড়া অবস্থায় ভূমিতে রেখে এবং বাঁ পা দিয়ে সেটাকে চেপে রেখে তারপর ধনুকের ছিলাটি অনেকখানি পিছন দিকে টেনে নিয়ে প্রায় নয় ফুট লম্বা এক একটি তীর নিক্ষেপ করা হতো। সেই বিশাল ধনুক থেকে তীরগুলি এত তীব্র বেগে বেরিয়ে যেত যে প্রায়ই শত্রুর বুকের কঠিন আবরণে বিদ্ধ হয়ে যেত আর তার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। তাদের ঢাল ছিল ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে খুব শক্তভাবে তৈরী এবং সেগুলি তার বহনকারীর মতন চওড়া না হলেও প্রায় তার উচ্চতার সমান

ছিল। যাদের হাতে ধনুর্বানের বদলে ধরা থাকতো বর্শা বা বল্লম তাদের কোমরে ঝুলতো তরবারি। তরবারির আকৃতি ছিল অনেকটা চেপ্টা এবং লম্বায় তিন হাতের মত। মুখোমুখি যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা দুই হাত দিয়ে ধরে তরবারি চালাতো।

অশ্বারোহী সৈন্যরা দুটি বর্শা এবং একটি ঢাল দিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো অথবা কিছু ব্যবধান থেকে শত্রুর বক্ষ ভেদ করার জন্য বর্শা নিক্ষেপ করতো।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিস তৎকালীন ভারতের ছবি তুলে ধরে ছিলেন তাঁর বিস্তারিত বিবরণীতে। তার থেকেই সেই যুগের শারীর শিক্ষার প্রসারতার খবর পাওয়া যায়। শারীর শিক্ষায় শিক্ষিত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নিজেই ছিলেন এক নিপুণ যোদ্ধা ও বলশালী পুরুষ। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীর চর্চা বাদেও প্রতিদিন তাঁর দেহ মালিশ করাতেন।

চন্দ্রগুপ্তের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে অন্যান্য নানা বিষয়ের সংগে শারীর শিক্ষার উন্নতি লক্ষ্যণীয়। এই যুগেও আগেরই মতন শারীর চর্চার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে সাফল্যলাভ। অতএব, ধনুর্বিদ্যা, শিকার, বর্শা নিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদির অভ্যাস অব্যাহত ছিল। নৌকো চালনা ও সন্তরণ শারীর শিক্ষার এই দুই জনপ্রিয় বিষয়তেও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম ছিল না। এছাড়া, ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধবিদ্যার প্রদর্শনী, শিকার, ঘোড়া ও ষাঁড় দ্বারা চালিত রথচালনা প্রভৃতি ছিল প্রমোদানুষ্ঠানের অন্তর্গত বিষয়। এ যুগের শারীর শিক্ষার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নারীদের নানা শারীর চর্চায় যোগদান। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন কয়েকজন নারী তীরন্দাজ। নিঃসন্দেহে এটা নারী প্রগতির একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, শারীর শিক্ষাই এই প্রগতির বাহন রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

চাণক্য তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছেন যে, দেশের রাজাকে হতেই হবে দারুণ কর্মক্ষম ও বলিষ্ঠ দেহধারী। রাজার সারাদিনের কর্মসূচীও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যান্য কাজের সঙ্গে ছিল ব্যায়াম ও বিভিন্ন শারীর চর্চা, অবগাহন স্নান ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ।

ঋষি শুক্রাচার্যও রাজার কয়েকটি অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন

প্রতিদিন তিনি যেন প্রাতে ও অপরাহ্নে হস্তী ও অশ্বারোহণ এবং রথচালনা অনুশীলন করেন। সমরবিদ্যা নিজে তো শিখবেনই ও সেই সঙ্গে সৈনিকদেরও শিক্ষাদান করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, রাজাকে বাঘ শিকারের ক্ষমতা রাখতে হবে কারণ, তাঁকে শক্তিমান ও সাহসী হওয়া চাই-ই।

ব্যাৎসায়নের বর্ণনায় জলক্রীড়ার এক মোহময় ছবি ফুটে উঠেছে। ধনীদের প্রাসাদের চতুর্দিকে নানা সুগন্ধী ফুলের সুরম্য উদ্যানের মাঝখানে টলটলে জলের এক মনোরম জলাধার আর তার পাশে সবুজ ঘাসের উপর স্থাপিত কারুকার্যময় সুসজ্জিত সারিবদ্ধ আসন ও ছোট ছোট গাছের ঝোপ। সেই জলে যুবকদের জলক্রীড়া ও সন্তরণ উপভোগ করতেন আসনে উপবিষ্ট দর্শকেরা।

মৌর্যযুগে কন্দুক ক্রীড়া বা বল খেলারও প্রচলন ছিল। সাধারণত, স্ত্রীলোকেরাই এই খেলায় মেতে উঠতো তাদের জন্য নির্দিষ্ট ক্রীড়া-উদ্যানে। প্রসঙ্গত, শারীর শিক্ষায় প্রোজ্জ্বল প্রাচীন গ্রীসেও কিন্তু ঐ যুগে স্ত্রীলোকেরা কোনও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করতো না।

তৎকালীন অন্যান্য দেশের মত ভারতেও তখন রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করতো সামরিক শক্তির উপর। দেশের সৈন্য বিভাগকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট ছিল নানারকম কঠোর শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা যথা, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ, লাফানো, বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ ও ক্রোশের পর ক্রোশ দৌড়।

বাৎসায়ন আমাদের জানিয়েছেন যে, মৌর্য রাজত্বে লোকেদের মাংস আহার ছিল বেশি প্রিয় এবং এবং ভাত, গমজাত খাদ্য, দুগ্ধ, মধু ইত্যাদি নিত্য ভোজ্য দ্রব্য ছিল।

মৌর্যযুগে আর এক উল্লেখযোগ্য শারীর ক্রিয়া ছিল শিকার। রাজপুত্রদের মধ্যে কেউ শিকারে দক্ষ না হতে পারলে সেটা নিতান্ত লজ্জার ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হতো।

সম্রাটগণ নিজেরাই শিকারে যেতেন এবং শিকারের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহাকবি কালিদাসের রচনাতে উল্লেখ পাওয়া যায়—প্রশংসাপূর্ণ ভাষায় মৃগয়ার সেই আড়ম্বরবহুল অনুষ্ঠানের বর্ণনা। মৃগয়ার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে তৎকালীন পহলব দেশীয় লেখক দন্তিন লিখেছিলেন—শরীর চর্চায় মৃগয়ার উপকারিতা অনেক। শিকারীর পদযুগলে যোগায় গতিবেগের চাঞ্চল্য ও শক্তি, বুকে অফুরন্ত দম। আর প্রবল ক্ষমতা সঞ্চার

করে পরিপাক যন্ত্রে যার উপর নির্মিত স্বাস্থ্য রক্ষার ভিত্তি। এছাড়া, দেহকে মেদশূন্য করে চাবুকের মত চট্‌পটে করে তোলে।

এইযুগে সন্তরণ প্রিয় ছিল স্ত্রীলোক ও শিশুদের মধ্যেও। জলাশয়ে তারা অবাধে সাঁতার কাটতো নিশ্চিন্ত আরামে প্রহরের পর প্রহর।

গুপ্তযুগের প্রিয়তম দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে সেকালে রাজ্যে রাজ্যে উৎসব পালিত হতো। বালকেরা কৃষ্ণ ও রাখাল সেজে নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে উঠতো। অপর উল্লেখযোগ্য উৎসব ছিল রামচন্দ্রের জন্মদিন এবং তাঁর লঙ্কা বিজয়ের দিন। এইদিন দুটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। নানা রকম অস্ত্রবিদ্যার প্রদর্শনী, শারীর ক্রিয়া ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পালিত হতো ব্যাপক আকারে দেশের বিভিন্ন স্থানে। আর্য সভ্যতার পতাকাবাহী গুপ্ত যুগ শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল। সাধারণ লোকেদের মধ্যে অস্বাস্থ্যের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল এবং এরকম নজীরও দুষ্প্রাপ্য নয় যখন স্বাস্থ্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছিল।

সমসাময়িক ভ্রমণকারীদের বিবরণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, একালে জনগণের বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা ও শারীর শিক্ষায় সমান উৎসাহ বিদ্যমান ছিল। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার সুস্থতা ও সজীবতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। আমরা জানি, শারীর শিক্ষা মানুষকে নির্বিবাদে সহাবস্থান করতেও শেখায়। সংকটে সাহস, পরাজয়ে স্মিত মুখ, বিজয়ে বিনয়, এগুলিও শারীর শিক্ষার পরোক্ষ দান।

গুপ্তযুগে রাজপুত্রেরা ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে ও উৎসাহী ব্যক্তিরা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ভূমিতে উপস্থিত হয়ে শরীর চর্চা করতেন। কবি-জীবনীকার বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে ব্যায়ামভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবোধ

সমসাময়িক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ভারতীয়রা যথেষ্ট সচেতন ছিল।

আইসিঙ্ নামে এক চৈনিক পরিব্রাজক এ সম্পর্কে বলেছেন যে, ভারতীয়দের বাসগৃহের মেঝে প্রায়ই দেখা গোবর লেপে মসৃণ করে রাখা এবং গৃহ প্রাঙ্গণে নানা রঙিন ফুলের সমারোহ। প্রসঙ্গত, এই গোবরের ব্যবহার গৃহের বায়ুকে বিশুদ্ধ বা রোগমুক্ত করতে সহায়তা করে এবং অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

খাদ্যাভ্যাস

গুপ্ত যুগের জনসাধারণের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ফা-হিয়েন আমাদের জানিয়েছেন যে, একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত কেউ ভোজনার্থে প্রাণী বধ করতো না।

বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই একথা বলায় যে, বুদ্ধের অহিংসার বাণীর প্রভাবই ছিল এর অন্যতম মুখ্য কারণ। মনুও তাঁর সংহিতায় বলেছেন, অপর প্রাণীর মাংসের দ্বারা নিজের দেহের মাংস বৃদ্ধি করার চেয়ে মানুষের বড় পাপ আর নেই, যদি না সে মাংস দেবতা বা পূর্ব পুরুষের উদ্দেশে কোনও যজ্ঞে প্রদত্ত হয়। মনুর এই নির্দেশ ব্রাহ্মণেরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজ্যশাসনের ভার পান। তাঁর নিজের ও তাঁর রাজত্বকালের বৃত্তান্ত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ এর বিবরণ থেকে জানা যায়। ঐ বিবরণ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ ও সুদক্ষ যোদ্ধা। লেখনী ও ধনুর্বাণ তাঁর হাতে সমানভাবে চলতো।

হর্ষবর্ধনের কালে শারীর শিক্ষা

এই সময় ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাধারার সমান্তরাল ভাবে আরও নানা কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। একমাত্র কনৌজ শহরেই কয়েক শত মঠে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে নানা বিষয়ের জ্ঞান ও শারীর শিক্ষা লাভ করতো। নালন্দায় বেদ, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, গণিত, ওষধিবিদ্যা, যোগ শাস্ত্র, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এই সময় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য কোনও শিক্ষা পদ্ধতিতেই শিক্ষার্থীদের জন্য কখনই আরামের জীবন যাপন নির্দিষ্ট ছিল না। ব্যায়াম ও শরীরচর্চা দ্বারা শরীরকে বলবান ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা হতো কঠোর পরিশ্রম করার জন্য এবং বিদ্যাচর্চাকালে ও পরবর্তী কর্মময় জীবনে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে।

হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন দক্ষিণ ভারতে চালুক্য বংশের নৃপতি। তিনি নিজে ছিলেন মহাযোদ্ধা এবং চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনানুযায়ী নানারকম শারীর চর্চার তিনি ছিলেন বৃহৎ পৃষ্ঠপোষক।

ঐ সময়কার আর এক বীর নৃপতি ছিলেন পল্লব বংশীয় রাজা নরসিংহ বর্মা। মল্লক্রীড়ায় অসামান্য দক্ষতার জন্য তাঁর উপাধি ছিল মহামল্ল। ভারতের অনেক মল্লবীরকে পরাস্ত করে তিনি এই সম্মানিত

উপাধি লাভ করেন। এই মল্লবীরের নামানুসারেই দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মন্দিরটির নামকরণ হয় মহাবল্লীপুরম।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁর নির্মিত বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং সুরু হয় বিদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। এই সময় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে নিশ্চিন্ত আরামে শারীর শিক্ষার সব ক্রিয়াকে বিসর্জন দিয়ে অলস জীবনে গা ঢেলে বাস করছিলেন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দিশাহারা জনগণ। এদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা যায় না। সব সেনাবাহিনীতেই শারীর শিক্ষায় অশিক্ষিতরা একেবারেই অচল। সুতরাং সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তৎকালীন ভারতের মহাবিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল শারীর শিক্ষা বিমুখীনতা।

একতাবিহীন, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও দুর্বল সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল। ফল যা হবার তাই হলো। বারবার বর্বর বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো ভারতবর্ষ, অপরিসীম ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়ে গেল। নির্বিচারে নিহত হলো নিরীহ মানুষের দল। আক্ষেপের কথা, চরম দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, ইতিহাসের সেই সংকট মুহূর্তে যখন শারীর শিক্ষায় শিক্ষিত এক দুর্বার সেনাবাহিনী এবং কর্মচঞ্চল, স্বাস্থ্যদীপ্ত উজ্জ্বল এক ঝাঁক যুবকের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, তখনই দেখা গেল তাদের অশুভ অনুপস্থিতি।

রাজপুত ও শারীর শিক্ষা

দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকতে থাকতে এবং মাঝে মাঝেই তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিল দেশপ্রেমের চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা, রাজপুতানা ছিল এমনি এক রাজ্য। তবে তাদের মধ্যেও ঐক্যের অভাব ছিল প্রকট। তা সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসে রাজপুতেরা দেশপ্রেমিক, বীর ও রণনিপুণ হিসাবে চিহ্নিত। সুলতানী আমল ও মোগল যুগে তারা বারংবার স্বাক্ষর রেখেছে অসামান্য সাহস ও শক্তির।

রাজপুতেরা শরীর চর্চা ও সামরিক বিদ্যার অনুশীলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করা ও বিভিন্ন রণকৌশল আয়ত্ত করার জন্য তারা নিয়মিতভাবে নানারকম ব্যায়াম ও শারীর ক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকতো।

সেই সঙ্গে মানবিকতা ও চরিত্র গঠনের জন্য হিন্দুযুগের মহৎ পুরুষদের উপাখ্যান শোনাবার ব্যবস্থা ছিল।

রাজপুত বালকদের অলপবয়স থেকেই রক্তপাতের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্য ছোট মাপের বাঁকা তরবারির সাহায্যে তাদের দ্বারা মেষ শাবকদের মুণ্ডচ্ছেদ করানোর প্রথা ছিল। প্রথম বারের চেষ্টাতেই যে বালক সফল হতো তার সমগ্র পরিবার তার জন্য গর্ব বোধ করতো। তারপর এই বালকদের শেখানো হতো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে আক্রমণকারীর ভঙ্গী অবলম্বনে নৃত্য এবং প্রাচীনকালের ভারতীয় বীরদের কাহিনী অবলম্বনে সংগীত।

তারপর ছিল তাদের অশ্বারোহণ শিক্ষা। যুবকেরা নানারকম শারীর ক্রিয়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো। তারমধ্যে একটি ছিল অস্ত্র-সমেত নকল যুদ্ধের প্রতিযোগিতা। একদল ভোঁতা বর্শা দিয়ে আক্রমণ করতো অপর পক্ষকে এবং তারা ধারবিহীন তরবারি দিয়ে আত্ম-রক্ষা করার চেষ্টা করতো।

অশ্বপৃষ্ঠে থেকে বর্শা নিক্ষেপে নিখুঁত লক্ষ্যভেদের অভ্যাসের জন্য ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন কোন থেকে লক্ষ্যস্থলে চলন্ত অশ্বারোহীর বারংবার বর্শা নিক্ষেপ। এর জন্য প্রয়োজন হতো অশ্বের রাশ টেনে দ্রুত গতি পরিবর্তন করা এবং সেই সঙ্গে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখা।

তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হতো। শুধুমাত্র লক্ষ্যভেদেই সীমাবদ্ধ ছিল না এই প্রতিযোগিতা, নিক্ষেপের প্রবলতায় পালক পর্যন্ত তীর বিদ্ধ করাও ছিল কর্তব্য।

সম্ভবত, জনপ্রিয়তায় মল্লক্রীড়া ছিল শীর্ষে। তাই, মল্লবীররা রাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন।

সে যুগের প্রত্যেক রাজপুত নৃপতি একাধিক মল্লবীরের সর্বরকম ভার গ্রহণ করতেন এবং তাঁরা "জৈতি" নামে পরিচিত ছিলেন। মাঝে মাঝে দুই রাজদরবারের মল্লবীরদের মধ্যে মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হতো এবং প্রচুর জনসমাগম ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এই জাতীয় অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

নির্দিষ্ট দিনের কিছু পূর্বে রাণা প্রেরণ করতেন কয়েকজন অনুচরকে শিকার-স্থল পরিদর্শন করে বুনো বরাহের আস্তানা দেখে আসার জন্য। আর, শিকার-যাত্রার একদিন পূর্বে রাণা নিজে, যারা সঙ্গে যাবার, তাদের সকলকে সবুজ পোষাক বিতরণ করতেন। বনের গাছপালার সঙ্গে প্রায় মিশে থাকার জন্যে পোষাকের রঙ্ ছিল সবুজ। রাণা নিজের পুত্র এবং

অন্যান্য সকলকে নিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করতেন শিকারের উদ্দেশ্যে। সেই অনুচরেরা পথ প্রদর্শকের কাজ ক'রে সকলকে নিয়ে যেত বুনো বরাহের আস্তানার কাছে। তারপর প্রথমেই সেই এলাকাটিকে দ্রুত ঘিরে ফেলে সুরু হতো প্রচণ্ড চিৎকার ও বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ। সেই সঙ্গে ভীত বরাহের দল বেরিয়ে আসা মাত্র শিকারীরা তাদের ধাওয়া করতেন এবং অবশেষে বর্শায় গিঁথে ফেলতেন।

তারপরের কাজ ছিল কিছু হরিণ ও অন্য প্রাণী শিকার করা। প্রতি বসন্ত ঋতুতেই এই শিকার ছিল এক আবশ্যিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পরে থাকত হোলি উৎসব। এই উৎসবে রঙের খেলা বাদে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিল রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একত্রে অনেক অশ্বারোহীর হোলি খেলা। হোলি খেলতে খেলতে অশ্বকে নানাভাবে ঘুরিয়ে. কখনো সম্মুখে, কখনো পিছনে চালনা করে, কখনো ধাওয়া করে বা ঘূর্ণির মত ঘুরে অশ্বারোহীরা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতেন। আধুনিক যুগের পোলো খেলার চেয়েও অনেক বেশি বাহাদুরী ছিল এই খেলায়।

দক্ষিণ ভারত

বারবার বিদেশী মুসলমানদের আক্রমণে উত্তর ভারত ক্ষত বিক্ষত হলেও দক্ষিণ ভারত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত হয়নি।

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি প্রথম ভাগে যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান করেন তখন সমবেত ভাবে দক্ষিণবাসীরা দৃঢ় ভাবে প্রতিরোধ করেন এবং এর পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্য। বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তারের পথে প্রধানতম বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিজয়নগর আর্য সভ্যতা সংরক্ষণের সঙ্গে শারীর শিক্ষার বিভিন্ন শাখার প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দান করে। বিজয়নগরের সংস্কৃতিবান নৃপতিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের মানুষকে শারীর শিক্ষায় ও সামরিক বিদ্যায় পটু না ক'রে রাখলে আর্যাবর্তের মত অবস্থায় পড়তে হবে। বিদেশী মুসলমানদের শাসনে পরাধীনতার জীবন যাপন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আর্য-সভ্যতার আরও অনেকগুলি প্রদীপ নিভে যাবে। গভীর রাজনীতিক দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দান করে বিজয়নগরের নৃপতিরা নানা রকম খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যের পাতায় নানারকম খেলাধূলায় দেশের

মানুষের অংশ গ্রহণের উল্লেখ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যে তো চিরকালই সমাজের চিত্রই অঙ্কিত হয়।

বিজয়নগর যখন সমৃদ্ধির তুঙ্গে তখন মহানবমী, রথ সপ্তমী, দীপাবলী, নবরাত্রি প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবে জনজীবন মুখরিত হতো—কলরবে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে। অপরূপ আলোর মালায় শহরাঞ্চল সাজানো হতো শিল্পীদের পছন্দ অনুযায়ী।

এই সবকটি উৎসবেই মল্লক্রীড়া ছিল এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং মল্লবীররা রাজসিক সম্মানে ভূষিত হতেন। মল্লবীরদের সম্মান লাভের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সময়কার পর্তুগিজ পর্যটক পেজের বর্ণনায়।

মল্লক্রীড়ার সমাপনে রাজা ধীরে ধীরে মঞ্চে আরোহণ করে নিজের আসন অর্থাৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরা সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে অভিবাদন জানালেন। তারপর মল্লবীররা উপবেশন করলেন সম্মানিত আসনে। সেখানে রাজার অনুমতি ব্যতীত অপর কারো বসার অধিকার ছিল না, এমন কি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নয়। সেই আসনে বসার পর মল্লবীররা পান চিবিয়ে খেতেন। একমাত্র মল্লবীররা ও নৃত্যবিদ রমণীদের রাজার সম্মুখে পান খাবার অনুমতি ছিল। মল্লক্রীড়া ও নৃত্য শারীর শিক্ষার এই দুই শাখার কৃতবিদ্‌দের এই রাজসম্মান বিজয়নগরের সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। বিজয়নগরে শারীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি পৃথক বস্তু ছিল না। বস্তুত, সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসাবেই গণ্য ছিল শারীর শিক্ষা। এই কারণেই সবগুলি উৎসবেই সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গেই শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত কয়েকটি বিষয়ের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতো। সেখানে জনসাধারণের অবাধ অংশ গ্রহণ ছিল।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগরের রাজাদের শাসনকালের নৃত্যের প্রসার ও উন্নতি তুলনারহিত। তামিল রাজাদের অনুপ্রেরণাতেই সম্ভবত বিজয়নগরের রাজাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল। তামিল সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বিশিষ্ট নৃত্যবিদেরা বিশেষ রাজ সম্মানে ভূষিত হতেন, কেননা নৃত্য মানুষের দেহ ও মন উভয়কেই সুন্দর করে। একটি আড়ম্বরবহুল অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদদের "তালাইকলি" নামে এক সম্মানিত উপাধি এবং তৎসহ নয় রকম রত্নখচিত সুবর্ণমণ্ডিত একটি দণ্ড প্রদান করা হতো।

বিজয়নগর :—শারীর শিক্ষার উৎকর্ষ

নৃত্যের এই সম্মান শারীর শিক্ষারই গৌরব কারণ সভ্যতার স্পর্শে উজ্জীবিত সব দেশই নৃত্যকে শারীর শিক্ষার এক মনোহর শাখা মনে করেন।

বিজয়নগরের প্রাচীরগাত্রে "কোলট্টম্" নামে এক রকম লাঠিখেলার অনেকগুলো চিত্র খচিত আছে। এই খেলা বর্তমান শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতের পল্লী অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়নি। ছোট আকৃতির রঙিন লাঠি দিয়ে "কোলট্টম্" খেলা আজও সেখানকার রমণীদের অবসর বিনোদনের এক মনোরম মাধ্যম।

বিজয়নগরে শিকার এবং তরবারি চালনা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। শারীর শিক্ষায় সামরিক বিদ্যার স্পর্শের উদাহরণ হিসাবে এগুলিকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত, এই রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত শারীর চর্চার দৃষ্টান্তের বর্ণনায় পর্তুগিজ পর্যটক পেজ জানিয়েছেন যে, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই কৃষ্ণদেব শয্যাত্যাগ করে প্রথমে ফলের রস পান করে তারপর সর্বশরীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দন করে নিতেন। তারপর মৃত্তিকা নির্মিত অতিশয় ভারী ওজনের কয়েকটি বস্তু তুলে নিয়ে ব্যায়াম করতেন। তারপর সুরু অসি সঞ্চালন এবং প্রচুর ঘাম নির্গত না হওয়া পর্যন্ত তার বিরাম ছিল না। এরপরে রাজকোষের অর্থে প্রতিপালিত মল্লবীরের সঙ্গে চলতো মল্লক্রীড়া। এই কঠোর শারীর চর্চার পরে তিনি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ময়দান প্রান্তরের সবুজ ঘাসের উপরে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ক্ষণ ও সূর্যোদয়ের ক্ষণ ছিল একই। তারপর প্রথমে দিনের আলোয়, পরে নির্মল জলে স্নান সমাপন করে পরিশুদ্ধ হতেন।

বিজয়নগরের সমাজজীবনে মাঝে মাঝে এক রমণীর দুই প্রেমিক মল্ল কিংবা তরবারির দ্বৈতযুদ্ধে স্থির করে নিতেন কে করবেন তাঁর পাণিগ্রহণ। রাজার তো প্রসন্ন সম্মতি ছিলই এই প্রথায়, উপরন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা যদি হতেন কোনও উচ্চ বংশীয় অথবা পদমর্যাদায় উচ্চ, তবে রাজা স্বয়ং হতেন সেই দ্বৈতযুদ্ধের মাননীয় দর্শক।

বিজয়নগরের শারীর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মল্লক্রীড়া জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ছিল সবার উপরে। দেশের রাজা থেকে কৃষক সকলেই মল্ল প্রাঙ্গণের ধূলি মাখতেন। পেজের বর্ণনানুযায়ী তৎকালীন মল্লযুদ্ধে মুষ্টাঘাত করার নিয়মও ছিল এবং তার ফলে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাঁত ভাঙতো, চোখ বেরিয়ে আসতো কোটর থেকে, মুখের আদল

বদলাতো। এই বর্ণনায় মনে হয় যে ঐ মল্লযুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর ফ্রি-স্টাইল মল্লের সমগোত্রীয় ছিল। সারাদেশ জুড়ে মল্লক্রীড়া শিক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার নির্মিত হয়েছিল। এগুলির নাম ছিল গারিদি।

রাজা এবং রাজপুত্রেরা মৃগয়ায় বেরিয়ে হস্তী ও শূকর শিকারের জন্য মাঝে মাঝে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। এটা ছিল তাঁদের খেলা আর অবসর যাপনের অন্যতম বিষয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় অনেক হস্তী শিকার করে উপাধি পেয়েছিলেন মহাগজ শিকারী।

জলে স্থলে দ্রুত বেগে চলার জন্য বিজয়নগরের জনগণ সন্তরণ আর অশ্বারোহণে পটুতা অর্জন করেছিলেন। দেশের রাজারা শত শত মুদ্রা ব্যয় করে আরব দেশ থেকে মূল্যবান তেজীয়ান অশ্ব ক্রয় করে অশ্বশালা পূর্ণ করতেন। সেই যুগে দ্রুত গমনে অবশ্যই অশ্ব ছিল শ্রেষ্ঠ বাহন আর মেঁদের হ্রাস ও শরীরকে সামর্থ্যে ভরে তুলতেও অশ্বারোহণ।

বিজয়নগরবাসীদের সন্তরণপ্রিয়তা, জলক্রীড়া ও নৌকো চালনার উৎকর্ষ সম্পর্কে লিন শোটেন নামে এক বিদেশী পর্যটক লিখেছেন যে, সন্তরণ ও উঁচু থেকে তারা জলে ঝাঁপ দিতে ওস্তাদ ছিল আর নৌকো চালিয়ে নদীর এপার ওপার করায় অপার আনন্দ পেত। কোনও কোনও নৌকা এমনি সরু ছিল যে তাতে একজন মানুষ কোনও রকম বসার জায়গা করে নিতে পারতো এবং প্রায়ই ঢেউয়ের ধাক্কায় কয়েকবার উল্টে গিয়েও চালকের বাহাদুরীতে পৌছাতো ওপারে গিয়ে। উল্টে যাওয়া মাত্র চালক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে নৌকোটি ধরে আবার সোজা করে ভাসিয়ে দিত আর নিজেও তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসতো স্বস্থানে। এই-ভাবে জলের ফেনায় মাখামাখি হয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও শক্তির ব্যবহারে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কাহিনী বিজয়নগরবাসীর দীপ্ত মানসিকতা ও শারীর পটুতার নিদর্শন।

বিজয়নগরের রমণীরাও শরীর চর্চা করতেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল রমণীদের মল্লক্রীড়ায় অংশগ্রহণ। সম্ভবত, সমগ্র ভারতে আর কোথাও ঐ যুগে রমণী মল্লক্রীড়াবিদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

মার্কোপোলোর বর্ণনায় দক্ষিণ ভারতের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা বোধ সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যহ দুবার স্নানে পরিষ্কৃত হওয়া, আহারে শুধুমাত্র দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার, একমাত্র আবৃত জলাধার থেকে জল পান, জল পান কালে অধর ও জলপাত্রে ব্যবধান রাখা—স্বাস্থ্য সম্মত এই অভ্যাসগুলি দক্ষিণীদের মজ্জাগত ছিল।

ভাত, রুটি, তরকারি, দুগ্ধ, প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যেই অধিক তৃপ্তি ছিল অধিকাংশ মানুষের। খাদ্য বিষয়ে মনুর নির্দেশাবলীই শিরোধার্য ছিল দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র।

মোগলদের শারীর শিক্ষা

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর নিজে ছিলেন এক অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ। দুই বগলে দুই সৈন্যকে চেপে ধরে তিনি অনায়াসে দৌড়াতে পারতেন বেগে। অসাধারণ দৌড়বীর এই মোগল সম্রাট শারীর শিক্ষার নানা ব্যায়াম ও বিদ্যা দ্বারা নিজের শরীরকে শক্তি ও ক্ষিপ্রতার সমন্বয়ে প্রস্তুত করেছিলেন সর্বরকম শ্রমসাধ্য ও কঠিনতম কার্যের উপযোগী করে। জহিরুদ্দিন নাম বর্জন করে বাবর অর্থাৎ ব্যাঘ্র এই নামকেই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক আবর্তে একদা সমরখন্দ হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে বনে জঙ্গলে মেষপালকদের সঙ্গেও কঠোর জীবন যাপন ক'রে অর্জন করেছিলেন অপরিসীম কষ্ট সহিষ্ণুতা। তিনি তুর্কীদের কাছে শিখেছিলেন পদাতিক সৈন্য পরিচালনা পদ্ধতি, পারশিকদের কাছে বন্দুক চালনা পদ্ধতি এবং সুসংবদ্ধ শত্রু সৈন্যবাহিনীকে মুখোমুখি আক্রমণের কৌশল শিখে ছিলেন উজবেগীদের কাজ থেকে। পর্বতময় পরিবেশের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা মানুষ বাবর ভারতে শারীর শিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতায় ছিলেন ঈষৎ অসন্তুষ্ট—একথা তিনি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে। পথ চলায় ওঠা নামার পরিশ্রমে যিনি ছিলেন নিত্য অভ্যস্ত, সমতল ভূমির সমতায় চলা সম্ভবত তাঁর কাছে মনে হয়েছিল নিতান্তই সহজ গমন, কেননা পথ তো আর তখন থাকে না প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রায় সব মোগল সম্রাটই সন্তরণ পটু ছিলেন। বাবর, হুমায়ন, আকবর সকলেই ছিলেন সুচারু সাঁতারু। পূর্ণ জোয়ারে গঙ্গা পারাপার তাঁদের কাছে কোন কঠিন কাজ বলে প্রতিভাত হয়নি। হুমায়ুনকে তো একবার শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে সাঁতারে গঙ্গাপার হয়ে পালাতেও হয়েছিল, অর্থাৎ শারীর শিক্ষার এই বিদ্যা একদা মোগল সম্রাটেরা প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছিল। আত্মচরিতে বাবর লিখেছেন, তিনি একবারও বিশ্রাম না নিয়ে গঙ্গার এপার থেকে ওপার গিয়ে আবার ফিরে আসতেন। গঙ্গা ব্যতীত অন্যান্য নদীতেও তিনি প্রায় সাঁতার কেটে বেড়াতেন।

সম্রাট আকবর যখন তিরিশ বছরের যুবক তখন একবার তিনি ফতেপুর সিক্রি থেকে গুজরাটের পত্তন শহর অর্থাৎ ৮০০ মাইল দূরত্ব একাদিক্রমে

নয়দিন ঘোড়া চালিয়ে অতিক্রম করে সকলকে নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। যাত্রাশেষে তিনি মূর্ছিত কিংবা অবসন্নতায় ঢলে পড়েন নি। এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে প্রিঙ্গল কেনেডি সাহেব লিখেছেন যে, আকবর শুধু অশ্বচালনায় নয়, তিনি চৌঘান নামে পোলো জাতীয় এক খেলায় ও সর্বোত্তম ছিলেন। এই খেলায় খেলোয়াড়রা সকলেই ঘোড়ায় চড়ে। তাদের এক হাতে থাকে লম্বা এক লাঠি, অপর হাতে লাগাম। এই ভাবে মাঠের মধ্যে ছোটাছুটি করে ঐ লাঠির সাহায্যে একটি কাঠের বলকে আঘাত ক'রে, অনেকটা হকি খেলার মত, সেটাকে গোলে ঢোকাতে চেষ্টা করে। এই খেলার সফলতার জন্য অশ্বচালনা ষোল আনা জানা দরকার। আর শারীর পটুতায় অসামান্য সক্ষমতা প্রয়োজন, চৌঘান খেলা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল ফতেপুর সিক্রিতে। এই খেলায় অংশগ্রহণকারীরা সমাজের দৃষ্টিতে অভিজাত হিসাবে গণ্য হতেন। উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-কৌশল প্রায়ই প্রজাসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

এই চৌঘান খেলা সম্পর্কে আবুল ফজলের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মন্তব্যের ভাষান্তর করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ—যারা এই খেলা দেখার সময় শুধুই দেখে, তাদের দৃষ্টিতে এটা নিছক একটা আমোদের খেলা মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত দর্শকরা খুঁজে পান এই খেলার মধ্যে খেলোয়াড়ের দ্রুততম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, যা তাদের জীবন পথে চলাকালেও অহরহ উপকৃত করবেই। অশ্বচালনার সূক্ষ্ম কলা কৌশল আয়ত্ত করাও শিখবে খেলোয়াড়রা। সম্রাট আকবর এই খেলায় রীতিমত দক্ষ ছিলেন। তাঁর রাজসভায় যাঁরা চৌঘান খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সভার অলংকার হিসাবে চিহ্নিত।

আকবরের বিশিষ্ট বন্ধু আবুল ফজল তাঁর রচিত আইন-ই-আকবরীতে রাজকর্মচারীগণের কার্যলিপির তালিকা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে যাঁদের কাজ ছিল সাংবাদিকতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করতেন সম্রাটের দৈনন্দিন সমস্ত কাজ। স্বভাবতই, এই বিবরণের অংশীভূত হয়েছিল তাস, দাবা, চৌপর, নারদ, পঁচিশ প্রভৃতি খেলায় সম্রাটের অবসর বিনোদনের কথা। প্রসঙ্গত, চৌপর এক প্রাচীন হিন্দুস্থানী খেলা। আধুনিক লুডো খেলার সঙ্গে এর মিল আছে। চৌপর খেলাকে আরও আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য আকবর প্রায়ই ১৬টি গুটির পরিবর্তে রং-বেরং-এর পোষাকধারী ১৬ জন ক্রীতদাসীকে দাঁড় করাতেন। ক্রীতদাসীদের নিয়ে

খেলার জন্য খেলার ছকটি তৈরি করা হতো ঘরের মেঝেতে। রাজ-পরিবারের রমণীরাও প্রভূত আনন্দ পেতেন এই খেলা দেখে।

এই জাতীয় অপর একটি খেলার নাম ছিল চন্দেল। এই খেলায় এক সঙ্গে অনেক খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। স্বয়ং আকবর ছিলেন এই খেলার স্রষ্টা। চৌপর এবং চন্দেলের মত পঁচিশিও খুবই চিত্তাকর্ষক খেলা। এই খেলাটি প্রাচীন হিন্দুযুগে প্রচলিত ছিল। অজন্তা গুহার দেওয়ালে এই খেলার জন্য যে ছক ব্যবহার করা হতো তার অঙ্কিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশীয় ভ্রমণকারী এডওয়ার্ড টেরি মোগল যুগে ১৬১৬ থেকে ১৬১৯ সাল এই তিন বছর ভারতে কাটিয়ে গেছেন। তাঁর ভ্রমণ-লিপিতে তৎকালীন খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, অবসর বিনোদনের জন্য ভারতীয়রা খরগোশ, হরিণ ও কিছু বন্য জন্তু শিকার করতো। জল প্রাণী শিকারে তারা এক দারুণ চালাকী প্রয়োগ করতো। যে প্রাণী শিকারের বাসনা, অবিকল তার চামড়ার রঙের এক নকল আবরণে আবৃত হয়ে জলের মধ্যে নেমে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে ভেসে বেড়াত।

সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে শুধু নিজের মাথাটি উপরে রেখে সুযোগ মতো এক সময়ে জন্তুটিকে পা দিয়ে টেনে পাড়ে তুলে নিত। সন্তরণ পটুতা, পায়ের শক্তি ও কৌশলের এক অপূর্ব সমন্বয়ে এই শিকার খুবই চিত্তা-কর্ষক ছিল। শিকারের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তীরে অপেক্ষারত দর্শক-বৃন্দ শিকারীকে অভিনন্দিত করতো তুমুল করতালি ধ্বনিতে।

এছাড়া, বনে বাদাড়ে উড়ন্ত পাখি শিকার কালে ব্যবহৃত হতো মহিষের শিং দিয়ে তৈরী একরকম ধনুক আর বেত নির্মিত তীর যার অগ্রভাগ ছিল সরু ও পশ্চাৎভাগ পালকযুক্ত।

মোগল যুগে তাদেরই পালোয়ান বলা হোত যারা মল্লক্রীড়া ও মুষ্টি-যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। ইরান ও তুরান থেকে আগত পালোয়ানদেরই খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। সম্রাটের বেতনভোগীও ছিল একদল পালোয়ান। প্রায় প্রত্যহ তারা সম্রাটের শাসনে নিজেদের মধ্যে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতো। মাঝে মাঝে সম্রাট তাদের উৎসাহ দানের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতেন।

আবুল ফজল বিভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনীর উল্লেখ করেছেন যারা বিশেষ বিশেষ শারীর ক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ ছিল।

শার্মাশির বলা হতো তাদের যারা ছিল রণকুশলতা ও লাফানোয় সত্যিকারের বাহাদুর এবং নানারকম শারীরক্রিয়া কৌশলে অতিশয় রপ্ত। গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞরা লড়াইৎ নামে পরিচিত ছিলেন।

হিন্দুযুগের শারীর শিক্ষায় সর্বদাই মানসিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মুসলমানদের স্পষ্টতই অভাব ছিল এই সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির। প্রসঙ্গত, র‍্যালফ্ ফিচ তাঁর রচিত আর্লি ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে মোগল যুগের হিন্দুদের শারীর শিক্ষার উল্লেখকালে সূর্যনমস্কার ব্যায়ামের প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা জানি, এই ব্যায়াম সমষ্টির মধ্যে আছে, ডন বৈঠকের সাহায্যে পেশী গঠন, নমস্কারের মাধ্যমে দেবতার চরণে নিবেদন অর্থাৎ সততায়, পবিত্রতায় অবগাহন।

শারীর শিক্ষায় মারাঠা জাতি

মারাঠা জাতি যে অত্যন্ত কর্মঠ ও মজবুত দেহধারী ছিল একথা সপ্তম শতাব্দীতে লিখে গেছেন হিউয়েনসাঙ, তবে মোগল যুগের শেষার্ধেই মারাঠা জাতি ছিল শৌর্যের শীর্ষে। ঐতিহাসিক সরদেশাই মারাঠা জাতির ইতিহাস রচনায় শিবাজীর এ্যাথলেটিকস্ পটুতা ও শারীর ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো এই যে, পার্বত্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই মারাঠা বীর বৃষ্টিতে ভিজে, রোদ্দুরে তপ্ত হয়ে আর হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে শরীরকে সর্বংসহা করে নিয়েছিলেন এবং জলস্রোতে সাঁতার কেটে, পাহাড়ের গা বেয়ে আরোহণ অবরোহণ করে আর মাওলি সম্প্রদায়কে যোদ্ধা বানানোর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় তাদের আপন করে নিয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে এক অক্ষয় বন্ধুতার বন্ধন তৈরি করেন।

শিবাজী ছিলেন বিপুল মানসিক ও দৈহিক শক্তির প্রতীক। অশ্বচালনায় ও দৌড়ে সমান বেগবান। অদ্বিতীয় তরবারিচালক ও সৈন্য সংগঠক। ক্রোশের পর ক্রোশ গ্রাম, ময়দান, জনপদ, বনপথ ভ্রমণে অক্লান্ত। বিদ্যুৎ চমকের তৎপরতায় লাফিয়ে খাল কিংবা বেড়া অতিক্রমে সুদক্ষ আর মল্লক্রীড়ায় প্রতিপক্ষকে অক্লেশে দ্রুত চিৎপাতে পটু শিবাজী ছিলেন সকলের দুচক্ষের বিস্ময়।

ভারতবর্ষের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে মারাঠাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস স্বামী দেশের মানুষকে শারীর শিক্ষার দীক্ষা দেবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দেশকে উন্নত করতে সর্বাগ্রে দরকার শারীর শিক্ষার ব্যাপক

প্রসার। যুবক সম্প্রদায়কে শুধু স্বাস্থ্য চর্চায় উপদেশ বর্ষণ না করে তাদের স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন। মহারাষ্ট্রে রামদাস স্বামী অনেকগুলি জিমনাসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সবগুলিতেই একটু ক'রে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শারীর শিক্ষাবিদ বীর হনুমানের মূর্তি স্থাপন করেন।

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে এবং তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য ও বীরত্ব কাহিনী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে মারাঠা জাতি আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল।

মারাঠা জাতি মনে করেছিল যে, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে, মুসলমানদের হাতে হিন্দু মন্দিরের নির্বিচার ধ্বংস বাঁচাতে, রাশি রাশি গো-হত্যা রোধ করতে সর্ব প্রথম প্রয়োজন হিন্দু জাতিকে সংগঠিত করা এবং এর জন্যে শারীর শিক্ষার চর্চাই হবে সবচেয়ে জরুরী, কেননা রণক্ষেত্রের প্রতি পদক্ষেপে সৈনিকের শারীর পটুতা ছাড়া চলবে না। সাধু তুকারাম ও রামদাস স্বামী শিবাজীকে এ বিষয়ে অহরহ নানা মূল্যবান উপদেশ দান করে অশেষ উপকৃত করেছেন। শিবাজী মারাঠাদের একতাবদ্ধ ক'রে শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় ক'রে গড়ে তুললেন এক নিপুণ সেনাবাহিনী। উদ্দেশ্য, হিন্দুর পুনর্জাগরণ। এখানে বলার কথা, লেখাপড়ার সঙ্গে যদিও শিবাজীর পরিচয় তেমন ঘটেনি, তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যবহার ও চরিত্র ছিল রীতিমত পরিশিলীত। মনে হয়, শারীর শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকেই তিনি অর্জন করেছিলেন উন্নত মানসিক গঠন ও উদার হৃদয়।

শিবাজী মারাঠা সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে নিপুণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিঃশব্দ পদক্ষেপে জঙ্গলপথে আর পাহাড়ের ঢালুতে অস্ত্র-শস্ত্রসহ যাতায়াতে তাদের জুড়ি কেউ ছিল না। মহারাষ্ট্রের পর্বতময় পরিবেশে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর ছিল। ধীর গতিসম্পন্ন মোগল বাহিনীকে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে ঘন ঘন অতর্কিত আক্রমণে মারাঠা সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মোগল বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তারা ছিল অনেক কম কিন্তু অস্ত্র চালনার ক্ষিপ্রতায় ও তৎপরতায় অনেক বেশি দক্ষ। যেমনি দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া তেমনি দ্রুত বেগে কার্যশেষে প্রস্থান। গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির এটাই রীতি। এর জন্য চাই নিদারুণ শারীর পটুতা ও সাহস। দ্রুত পর্বতারোহণ, অবরোহণ, দৌড়, লাফ, অশ্বচালনায় অশ্বকে ষোলো আনা নিয়ন্ত্রণে রাখা, দ্রুত লয়ে অসি চালনার জন্য কব্জির পেলবতা ইত্যাদি

অবশ্যপ্রয়োজন গেরিলা যুদ্ধের আয়োজনে।

মোগল সম্রাটের বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য কী প্রস্তুতি প্রয়োজন সেটা অজানা ছিল না শিবাজীর। সমগ্র মারাঠা জাতিকে পরিণত করতে হবে শারীর শিক্ষায় দক্ষ ও রণবিদ্যায় নিপুণ। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে যুদ্ধের দুইটি প্রধান বিষয় আত্মরক্ষা ও আক্রমণের পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্থাপন করলেন শত শত শিক্ষাকেন্দ্র। সেই সঙ্গে সকলকেই শারীর পটু করে তোলার অভিপ্রায়ে যথাযথ ব্যবস্থা করা হলো। এই কাজে শিবাজীকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলেন তাঁর অনুগত সহকর্মীর দল। তানোজী, বাজী ফসলকার, দেশ-পাণ্ডে, কেউই বাদ গেলেন না। তাঁরা শেখাতে সুরু করলেন সূর্যনমস্কার, ডন-বৈঠক, মালখাম, মল্লক্রীড়া, লেজিম, গদা ঘোরানো, অসিচালনা, ভারোত্তলন, লাঠিখেলা প্রভৃতি। লেজিম ব্যায়াম সম্ভবতঃ মারাঠারাই প্রথম প্রচলন করে। হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে, মারাঠা যুবক খোলা মাঠের হাওয়ায় নানা শারীর ক্রিয়ায় শরীরকে হাওয়ার মত গতিশীল করা আর কোমরকে সামনে পিছনে ডাইনে বামে কাৎ করে দেহকে সর্বরকম ব্যবহারের যোগ্য করার সাধনায় ব্রতী হল। এক কথায়, সমগ্র মারাঠা জাতি তখন শক্তির আরাধনায় এক প্রাণ, এক মন। পণ ছিল একটাই হিন্দুর স্বার্থে লড়াই। দেশপ্রেমিক ধর্মগুরু রামদাস স্বামী উদাত্ত আহ্বানে দেশবাসীকে জানালেন—শক্তিই মানুষকে হাত ধরে সুখের দরজায় পেঁছে দেয়। শক্তিহীন ব্যক্তি সমাজের বিদ্রূপের পাত্র। পৃথিবীর আনন্দধারা অঞ্জলিভরে পান করতে পারে একমাত্র শক্তিধর। শক্তিই মানুষকে রূপবান করে, আর শক্তির সঙ্গে যে মানুষ নৈপুণ্য সংযুক্ত করতে পারে, সে সকলের চোখে সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়। বীরত্বের কাজ, সাহসের কাজ তারই দ্বারা সম্ভব যার দেহ পেশীতে পূর্ণ আর অন্তর পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে।

শিবাজী সমেত সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে কবর দেবার জন্য আওরঙ্গজেব জীবনের শেষ ছাব্বিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন ঐ দক্ষিণ ভারতেই। তাঁর অবস্থান মানেই সঙ্গে দিল্লীর বৃহত্তম সেনাবাহিনী। দাক্ষিণাত্যে এই সুদীর্ঘ অবস্থান সৈন্যদের দিল্লীর নিজ নিজ বাসগৃহে এক করুণ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সৈন্যদের সহধর্মিণীরা সমবেত ভাবে আওরঙ্গ-জেবকে পত্র লিখে মনের আক্ষেপ জানিয়েছিলেন এইভাবে ঃ—

"সোনা লাবন পিউ গন। সুনা করি গএ দেশ,
সোনা মিলা ন পিউ মিলে রূপা হো গন কেশ।"

অর্থাৎ, আমাদের স্বামীরা তাঁদের দেশ শূন্য করে চলে গেছেন সোনা উপার্জন করে আনতে। কিন্তু আমরা না পেলাম সোনা, না পেলাম স্বামী। মাঝখান থেকে আমাদের চুল হয়ে গেল রূপোর মত সাদা।

শিবাজীর জীবনই ছিল প্রধানত শারীর শিক্ষার এক উৎকৃষ্ট ফসল। তাঁর পরবর্তী মারাঠা নৃপতিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা সফল না হলেও শারীর শিক্ষার প্রতি তাঁদের সজাগ দৃষ্টির তেমন অভাব ঘটেনি। দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ছিলেন এমনি এক মারাঠা শাসক যিনি মল্ল ক্রীড়া বা কুস্তির এক বড় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শারীর শিক্ষার ইতিহাসে চিহ্নিত। তিনি খ্যাতিমান কুস্তিগীরদের তাঁর বেতনভোগী রাজ কর্মচারী করে নিয়েছিলেন। তাদের অনুশীলন ও আহারের প্রতি প্রখর নজর ছিল সিন্ধিয়ার। প্রত্যেক কুস্তিগীরের দৈনিক খাদ্য বরাদ্দ ছিল একটি আস্ত ভেড়া ও দশ সের দুধ ও তৎসহ অন্যান্য পুষ্টিকর আহার্য। শুধু পুরুষদের মধ্যে নয় মারাঠা রমণীদের মধ্যেও কুস্তির প্রসার ছিল। কোনও কোনও রমণী কুস্তিতে এতদূর দক্ষ ছিলেন যে তাঁরা প্রায়ই পুরুষদের কুস্তিতে আহ্বান জানিয়ে বসতেন। অবশ্য, পুরুষেরা পরাজয়ের আশংকায় কখনও সে আহ্বানে সাড়া দিতেন না।

নানা সাহেব এবং অন্যান্য মারাঠা পেশোয়ারা সকলেই শারীর শিক্ষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। নানা সাহেবের একটি নিজস্ব জিমন্যাসিয়াম ছিল। সেখানে ব্যায়ামের জন্য ২৪ রকমের বিভিন্ন সরঞ্জাম ছিল। মহারাষ্ট্রে এই সময় প্রায়ই কুস্তি ও জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রতিযোগীদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট বেশী। তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লবীর বলম্‌ভটদাদা দেওধর ছিলেন দ্বিতীয় বাজিরাও এর নিজস্ব শারীর শিক্ষক।

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মারাঠা ব্যতীত অপর যে সম্প্রদায় শারীর শিক্ষায় উন্নতি লাভ করেছিল তার নাম শিখ। পঞ্জাবের এই জাতি প্রথমে তার প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের ধর্মীয় আদর্শেরই অনুসারী ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে রাজনৈতিক কারণে এক অসম-সাহসিক যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয়। শিখ নেতা গুরু গোবিন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন খালসা, যার দ্বারা সমগ্র শিখ জাতি পরিণত হলো এক সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, আদর্শের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ জাতিতে। যারা শপথ গ্রহণ করেছিল যে, ধর্ম রক্ষার জন্য

শারীর শিক্ষায় শিখ জাতি

সর্বপ্রকার আক্রমণের মোকাবিলা করতে তারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবে। অতএব, স্বভাবতই শিখরা শারীর শিক্ষার সাহায্যে শরীরকে পটু, শক্তিশালী ও ক্ষীপ্র করতে আগ্রহান্বিত হলো।

ইংরেজ যুগে শারীর শিক্ষা

১৮৮৫ সালে স্থাপিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উৎপাদন এবং বিদেশী শাসকের উৎপাটন, এই ছিল কংগ্রেসের উৎপত্তির উদ্দেশ্য। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর একেবারে আদি পর্বে বাঙ্গালীর অন্তরকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। দেশ প্রেমের আবেগ থেকে, এই সময় নূতন করে জন্ম নিল শরীর চর্চার নানা বিষয়—লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তরবারি চালনা এবং সেই সঙ্গে নিয়মিত কুস্তি ও ডন বৈঠকের অভ্যাস। অবিভক্ত বঙ্গদেশেই রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেমের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এখানেই যুব সমাজে শারীর চর্চার অধিক প্রবণতা দেখা গেল। গঠিত হলো আখড়া, কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে। এই আখড়াগুলিই ছিল শারীর শিক্ষার কেন্দ্র। সেখানে গীতা পাঠও ছিল অবশ্য কর্তব্য। যার ফলে, শরীর চর্চার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় সাহসিকতা ও ধর্মবোধে স্নাত হলো দেশের যুবশক্তি।

ইংরেজ জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, যেখানেই তারা সাম্রাজ্য-বাদের দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করেছে সেখানেই তারা প্রচলিত করেছে খেলাধূলা ও শারীর ক্রিয়া। এইভাবেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে প্রচলিত সুইডিশ জিমন্যাস্টিক ইংরেজরা ভারতে বহন করে আনলো। অবশ্য, প্রথমে এখানকার ইংরেজ-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে এবং কিছু দেশীয় বিদ্যালয়ে যেখানে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পড়াশুনা করতো শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল এই জিমনাস্টিকের শারীর ক্রিয়া।

যে সমস্ত মিশনারীরা ভারতে এসেছিলেন তাঁদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে দেশীয় ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য তাঁরা কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। দক্ষিণ ভারতের বেলারি নামে এক জায়গায় এমনি একটি বিদ্যালয়ের নাম ছিল সেণ্টজোসেফ হাইস্কুল। সেখানে ১৯০৩ সালে আনা হলো প্যারালাল বার, ভল্টিংহর্স, রোমান রিং ডাম্বেল, বেয়ে ওঠার

জন্য দাঁড়, ভারতীয় গদা এবং আরও কত কী। বিকেল বেলায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ছাত্ররা জিমনাস্টিক এবং শরীর গঠনের এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার শিখতো এবং সেই সঙ্গে নানারকম শারীর ক্রিয়া ও ব্যায়ামও অভ্যাস করানো হতো। দলগত খেলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রচলিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন মিশনারি বিদ্যালয়গুলিতে মোটামুটি এই ধরণেরই শারীর শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই শারীর শিক্ষার সুযোগ কেবলমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের ছাত্ররাই পেতো কারণ অন্যান্যদের পক্ষে এই ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না।

পরাধীন ভারত সরকারও অবশ্য দায়িত্ব পালনে অনীহার পরিচয় দেননি। ১৯১২ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ সমস্ত রাজ্যের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা ও খেলার মাঠ কেনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। শারীর শিক্ষা প্রসারে এই ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

আর্থিক অনুদানে মাদ্রাজের ওয়াই, এম, সি, এ কেও পুষ্ট করা হলো, সেখানকার শারীর শিক্ষার অধিকর্তার মাসিক বেতনের কিয়দংশ এই অনুদান থেকে বরাদ্দ করা সম্ভব হলো। এই অধিকর্তা প্রয়োজন হলেই সর্বভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। মাদ্রাজের সবগুলি ইউরোপীয় বিদ্যালয়েই একজন করে শারীর শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ করাও সম্ভব হলো কেন না তাঁর বেতন ঐ অনুদান আংশিক বহন করতো। এই সব বিদ্যালয়ে খেলাধূলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হতো। তার মধ্যে আবার দলবদ্ধ খেলায় অধিকতর উৎসাহ দানের ব্যবস্থা ছিল। দলগত খেলার প্রতিযোগিতার আকর্ষণে ধীরে ধীরে এদেশে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠলো ফুটবল, ক্রিকেট এবং টেনিস ক্লাব। এই সময়েই পুণাতে শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের কিছু সাধারণ শারীর ক্রিয়ার ব্যায়াম ও খেলাধূলা শেখানো হলো যাতে এঁরা নিজেদের বিদ্যালয়ে গিয়ে সেগুলি ছাত্রদের শিখিয়ে তাদের দেহগঠন ও আনন্দদান করতে পারেন। শিক্ষকরা তাঁদের এই শারীর ক্রিয়াগুলি ট্রেনিং সমাপনের পরেও যাতে চিরকাল স্মরণ রাখতে পারেন তার জন্য পুস্তকাকারে সেই ক্রিয়াগুলি মুদ্রিত করে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এর পরিকল্পনাকারীরা এ ব্যাপারে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিলেন।

১৯২০ সালের শেষের দিকে দেশের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার কর্মসূচী তৈরী হলো। কিন্তু অভাব দেখা গেল শিক্ষকের, অতএব সৈনিক বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী এবং ভাল জিমনাস্টদের নিয়োগ করা হলো শিক্ষকের পদে। এদের বলা হলো ড্রিল মাষ্টার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, যেহেতু পুঁথিগত বিদ্যায় এঁরা বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় কিছুটা অনগ্রসর ছিলেন সেইজন্য নিজেদের কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিদ্যালয়ে অনেকের অবহেলার পাত্র হয়ে রইলেন।

এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি জাগ্রত হলো যে, শারীর শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবেনা, কারণ শরীর ও মনের সমবেত গঠনেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা। এছাড়া শারীর শিক্ষা তো কখনই মনের শিক্ষা বর্জন করে নয়। মনকে উন্নত করা এবং সভ্যতার পথে প্রদীপ জ্বালানো, এও তো শারীর শিক্ষার কাজ। শারীর শিক্ষার সঠিক কর্মসূচী এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত শারীর শিক্ষকের। মাদ্রাজের ওয়াই, এম, সি, এ, এগিয়ে এলো সকলের আগে এই শিক্ষক তৈরীর কাজে। ভারতবর্ষের শারীর শিক্ষার প্রথম মহাবিদ্যালয় এখানেই স্থাপিত হলো ১৯২০ সালে।

ভারতে প্রথম শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয় মাদ্রাজ ওয়াই, এম, সি, এ,

ভারত, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের ওয়াই, এম, সি, এ গুলির জাতীয় পরিষদ ছিলেন এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গত, এই সময়, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভারতেরই অংশ ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন এইচ, সি, বাক্।

আধুনিক যুগের ভারতীয় শারীর শিক্ষার ইতিহাসে বাক্ সাহেবের নাম চির ভাস্কর হয়ে থাকবে। ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যক্ষের পদ থেকে অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর কাছে শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে যাঁরা অদ্যাবধি জীবিত আছেন তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর অপূর্ব শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করেন।

১৯৪০ সাল থেকে এই মহাবিদ্যালয়ে স্ত্রী শিক্ষার্থীদের জন্যেও দরজা খুলে দেওয়া হলো। এই বছর থেকেই তিনরকম পাঠক্রম চালু হয়—ডিপ্লোমা, উচ্চ ও নিম্ন সার্টিফিকেট।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই মহাবিদ্যালয়ে অনেকগুলি খেলার

মাঠ ও একটি উন্নতমানের সুইমিং পুল আছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ ও রমণী নিজ নিজ কর্মস্থলে শারীর শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন। এ সবেরই মূলে ছিল বাক্ সাহেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান।

বাক্ সাহেব ওয়াই, এম, সি, এ শারীর শিক্ষা কলেজে যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেন তার মধ্যে তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় প্রকার শারীর ক্রিয়াগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য ক্রীড়াগুলি যতই প্রতিযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় হোক না কেন প্রাচ্য ক্রীড়া ও শারীর ক্রিয়াগুলিও শারীর শিক্ষার সূচীতে রাখা অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষত, খালি হাতে বা বিনাযন্ত্রের ব্যায়াম ও খেলাধূলাগুলি অত্যন্ত উপযোগী। এইজন্য তাঁর রচিত সূচীতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, সফটবল এবং বিভিন্ন যন্ত্র সহ ব্যায়ামের পাশাপাশি ছিল ডন, বৈঠক, যোগাসন এবং কবাডি ও খো-খো-খেলা। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন যে কবাডি ও খো-খো খেলার মধ্যে ভারতীয়রা দেশের মাটির গন্ধ পায়।

ভারতে শারীর শিক্ষায় বাক্ সাহেবের দান

মাদ্রাজ সরকার বাক্ সাহেবকেই তাদের শারীর শিক্ষার উপদেষ্টা হিসেবে রেখেছিল। কেন না এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে ভাল উপদেশ এদেশে আর কে দেবে? তাঁরই উপদেশানুসারে ১৯২৮ সালে মাদ্রাজের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষা অবশ্য কর্তব্যের স্বীকৃতি লাভ করে। মাদ্রাজ সরকারের অনুসরণে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বাক্ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন তার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষা কিরকম ভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব সে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতের জন্য। বলা বাহুল্য হৃষ্ট মনেই এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বাক্ সাহেব এবং বিশদভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন তারই ভিত্তিতে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের প্রথম দুই বছরের পাঠক্রম কালে অর্থাৎ তৎকালীন ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে শারীর শিক্ষা সব ছাত্রের জন্যে আবশ্যিক করে দিলেন ১৯৩০ সাল থেকে।

ভারতীয় শারীর শিক্ষার ইতিহাসে বাক্ সাহেবের অপর উল্লেখযোগ্য দান হলো ডঃ এ, জি নোরেনের সহযোগিতায় ১৯২৩ সালে সর্ব ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি গঠন, তাঁদেরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে ভারতীয় অলিম্পক এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বাক্ সাহেব বিভিন্ন খেলার নিয়মাবলী সংকলন করে

ওয়াই, এম, সি, এর মাধ্যমে ১৯২৮ সালে প্রকাশ করলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই গ্রন্থ ভারতীয় খেলাধূলার জগৎকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুললো। এর অনতিকাল পরেই তিনি শারীর শিক্ষকদের সুবিধার্থে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শারীর শিক্ষায় একটা সিলেবাস তৈরী করে ছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম হলো "বুক অব রুলস অব গেমস এন্ড স্পোর্টস।" এর পূর্বে এই জাতীয় কোনও গ্রন্থ না থাকায় শারীর শিক্ষকেরা প্রায়ই নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে খেলাধূলার নিয়মের ব্যাখ্যা করতেন, যার ফলে দেখা যেত একজন শিক্ষকের সঙ্গে অপর শিক্ষকের মতের অমিল।

১৯১৯ সালে বাক্ সাহেব ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ শারীর শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিকীকরণে তার ক্লান্তিহীন প্রয়াস বাস্তবিকই ভারতে আধুনিক 'শারীর শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ।

১৯৩১ সালে হায়দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত হলো শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয়. অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ফ্রেড ওয়েবার। এই পূর্বে বোম্বাই এবং বিহারে শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের ফলেই তাঁকে এখানে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়। ওয়েবারও তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও বাস্তব বোধের পরিচয় দিয়ে চৌদ্দ বছর এখানে কাজ করেন। তারই অক্লান্ত উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের সবগুলি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে। অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য তিনি বয়ঃক্রম অনুযায়ী পৃথক কর্মসূচী প্রণয়ন করে দেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হলেন সুপরিচিত টেনিস ও ক্রিকেট খেলোয়াড় এস. এম. হাদি। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে অবশ্য তিনি এই মহাবিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগে শারীর শিক্ষার উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। হাদির স্থানে এই মহাবিদ্যালয়ে এলেন মীর আশাদ আলি। এই সময় এর নামকরণ হলো 'আকাদেমি অব ফিজিকাল এডুকেশন'। পরবর্তীকালে সরকারই এর নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন। এক বছরের শিক্ষান্তে স্নাতকদের ডিগ্রী এবং অস্নাতকদের জন্য সার্টিফিকেট দেবার প্রথা ছিল।

হায়দ্রাবাদে সরকারী শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়

বঙ্গদেশের শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয়:—বাণীপুর।

কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দূরে ১৯৫৭ সালে বাণীপুরে স্থানান্তরিত হয় বঙ্গদেশের শারীর শিক্ষার প্রথম মহাবিদ্যালয়। সেখানে এক শত বিঘা জমির উপর এই কলেজ স্থান পায় এবং নতুন কলেজ বাড়ী, জিমনাসিয়াম ও ছাত্রাবাস নির্মিত হয়।

প্রথমে এই মহাবিদ্যালয় কলকাতা শহরের বুকে ২৬এ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সেখান থেকে যায় কাঁকুরগাছিতে। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জেমস বুকানন। অসাধারণ তৎপর এই শারীরবিদ্ অল্প দিনের মধ্যেই শারীর শিক্ষাকে বাঙ্গালীর কাছে এক প্রিয় বস্তুতে পরিণত করেন। দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ তিনি এখানে অধ্যক্ষের কাজ করেছেন। তাঁর কাজের সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এই যে, অনেক বছর যাবৎ এই মহাবিদ্যালয় থেকে যাঁরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে বেরুতেন তাঁদের বলা হতো বুকানন ট্রেনড্ শিক্ষক, অর্থাৎ শারীর শিক্ষা আর বুকানন একই অর্থবোধক ছিল। এমন কি, সংবাদপত্রে ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষরা শারীর শিক্ষার শিক্ষকের নিয়োগের নিমিত্ত "বুকানন ট্রেনড্ শিক্ষক প্রয়োজন," এই ভাবে উল্লেখ করে দিতেন। পশ্চিমবঙ্গে শারীর শিক্ষায় যাঁরা পাইওনিয়র এবং নিবেদিত জীবন তাঁদের নাম শ্রদ্ধাসহকারে নীচে দেওয়া হলো :—কে, এন, রায়, ফণী গুপ্ত, অমল বোস, বিজয় দত্তগুপ্ত, সত্যেন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ রায়, শিশির রঞ্জন বোস, ধনপতি চন্দ্র, শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বর্তমানে বাণীপুরে অবস্থিত মহাবিদ্যালয়টি প্রতি বছর পুরুষ ও স্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা দিয়ে থাকেন। কলকাতার কোলাহল যাতে ছাত্রছাত্রীদের মনস্কতায় বাধা দান না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই নির্জন পরিবেশে এই মহাবিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের থাকার সু-ব্যবস্থা আছে এবং এখানকার প্রশস্ত প্রান্তর সব রকম শারীর ক্রিয়া শিক্ষাদানের বিশেষ উপযোগী। একটি সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরীও আছে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের জন্য। আর প্রশস্ত জিমনাসিয়ামে প্রায় সব রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ। পূর্বে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

বঙ্গবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে বাণীপুরের মত আরও কয়েকটি শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় কল্যাণী, বহরমপুর ও বাঁকুড়া জেলায়

বিষ্ণুপুরে। এছাড়া কলকাতা শহরে দুটী আছে, একটি আলিপুরে, শুধু মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি সম্পূর্ণ ভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত। অপরটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন্। এই মহাবিদ্যালয়টি দুটী শাখায় বিভক্ত—বি-এড্ ও এম, এড্ এবং শারীর শিক্ষা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রান্তরে এই শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন শারীর শিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্তরণ শিক্ষাদান চলে রবীন্দ্র সরোবরের ঘেরা সুইমিং পুলে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয় :—

পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি মহাবিদ্যালয়েই শিক্ষাকালের সময় এক বছর। যারা খেলাধুলায় অন্তত কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরই এখানে প্রবেশাধিকার সর্বাগ্রে। তবে স্নাতক হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং বয়স সীমা সাধারণত ৩৫ এর অনুর্ধ্বে হওয়া চাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের এই শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয়গুলিতে মোটামুটি একই সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। সিলেবাস ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যবহারিক সূচীতে আছে জিমনাস্টিক, এ্যাথলেটিকস, সন্তরণ, ক্যালিস্থেনিকস্ অর্থাৎ খালি হাতে নানা রকম ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, হিন্দুস্থান বল, কবাডি, খো-খো, লাঠি খেলা, লেজিম, ডাম্বেল-ড্রিল, কুস্তি, জুডো, বক্সিং, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং, ব্রতচারি, মার্চিং, স্কোয়াড ড্রিল ইত্যাদি। আর তাত্ত্বিক সূচীতে আছে শারীর শিক্ষার ইতিহাস, শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, মনোবিদ্যা, এ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, কোচিং ও শারীর শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়ার পরিচালনা, বিভিন্ন খেলার নিয়মাবলী, বিভিন্ন ব্যবহারিক শারীর ক্রিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ইত্যাদি।

১৯৩২ সালে লক্ষ্ণৌতে খৃীষ্টান মিশনারীরা একটি শারীর শিক্ষার মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌ খৃীষ্টান মহাবিদ্যালয় সংগঠনেরই এটি একটি শাখা। এখন থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকেরা সকলেই সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন এবং নানা বিদ্যালয়ে তাঁরা শারীর শিক্ষাদানের ভার পান। এই মহাবিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো নৈনিতালের কাছে সাততালে দু'মাসের

লক্ষ্ণৌর খ্রীষ্টান শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়—

ক্যাম্প, এই সময়টিতে শারীর শিক্ষার নানান্ ট্রেনিং স্বাবলম্বীতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

বোম্বাই সরকার ও পিছিয়ে রইলেন না। ১৯২৭ সালে শারীর শিক্ষার উন্নতির ও প্রসারের অভিপ্রায়ে একটি কমিটি গঠন করে তার সুপারিশ গৃহীত হলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সুপারিশ বাক্সবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেলো না। তারপর ১৯৩৭ সালে পুনরায় একই উদ্দেশ্যে আর একটি কমিটি গঠিত হলো। তিন মাসের মধ্যে প্রদত্ত এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাজের ওয়াই-এম-সি-এ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অনুসরণে বোম্বাই এর কাণ্ডিভালিতে একটি শারীর শিক্ষার ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো ১৯৩৮ সালে। বিখ্যাত শারীর শিক্ষাবিদ্ পি, এম, জোসেফকে এখানকার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করা হলো।

বোম্বের কাণ্ডিভালিতে শারীর শিক্ষার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

স্নাতকদের এক বছরের ডিপ্লোমা কার্যক্রম এখানে প্রচলিত আছে এবং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের জন্যেই এই প্রতিষ্ঠান। মাঝে মাঝে রিফ্রেসার কোর্সও এখানে পরিচালনা করা হয়।

প্রায় কুড়ি বৎসর জোসেফ এখানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কর্মকুশলতা ও তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে গোয়ালিয়রে লক্ষ্মীবাঈ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর স্থান পূরণ করেন অধ্যাপক ডি, বি, কোঠিওয়ালা।

পণ্ডিত অম্বদাস পন্থ বৈদ্য এবং অনন্ত কৃষ্ণ বাবুরাও বৈদ্য নামে দুই ভাই ১৯১৪ সালে অমরাবতীতে শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের দেশীয় ব্যায়ামগুলিকে জনসমাজে পুনরায় জনপ্রিয় করার মানসে এঁরা বিশেষ তৎপর এবং উৎসাহী হয়ে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এঁদের কর্মতৎপরতায় সুফল ফলতে বিলম্ব হয়নি। মহারাষ্ট্রের নিজস্ব শারীর শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তরবারি, বর্শা ও লাঠি চালনা, বেনেটি এবং লেজিমও ছিল শিক্ষার বিষয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকগুলি দেশীয় শারীর ক্রিয়া, ড্রিল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে অম্বদাস পন্থের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিছুটা আধুনিক। ইউরোপীয় ক্রীড়ায় দ্রুত ধাবিত যুবক ও কিশোরদের

অমরাবতীর শ্রী হনুমান ব্যায়াম :—প্রসারক মণ্ডল

আকর্ষিত করার বাসনায় তিনি কিছু দেশীয় ক্রীড়াধারাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত করলেন, এবং শারীর ক্রিয়াগুলি তার সঙ্গে সম্পাদন করায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হলো একটা প্রেরণাবোধ এবং আকর্ষণ। দৃষ্টিনন্দনও হলো ক্রিয়াগুলি। এছাড়া প্রায় সব রকম দেশীয় ব্যায়াম ও ছিল শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্য শারীর শিক্ষাধারার পাশাপাশি দেশীয় ধারা বজায় রাখা রীতিমত কঠিন ব্যাপার ছিল, কারণ পাশ্চাত্যধারায় অংশগ্রহণকারীরা অনেক বেশী আমোদ পেত। সেখানে অধিকাংশই দলগত খেলা অথচ এগুলিতে অধিকাংশই ব্যক্তিগত সাধনা আবশ্যক। আবার বিদ্যালয়ে দেশীয় ক্রীড়া প্রচলিত ছিল না। সুতরাং শিক্ষার্থীদের তাতে বিমুখতা স্বাভাবিক।

এতগুলি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল যে দেশীয় ক্রীড়াগুলিকে জনসমাজে প্রচলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার দ্বারা উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয়ের অগাধ আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিকতা প্রমাণ করে।

১৯২৬ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালের লম্বা ছুটিতে একটি দেশীয় শারীর শিক্ষার কোর্স প্রবর্তন করেছেন। তিনটি পৃথক কোর্স এই সময় চালু করা হয়, ব্যায়াম প্রবেশ, ব্যায়ামপটু এবং ব্যায়াম বিশারদ। প্রথম দুটি সার্টিফিকেট কোর্স এবং তৃতীয়টি ডিপ্লোমা কোর্স। প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়। ব্যায়াম বিশারদ উপাধিধারীরা বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।

শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল আপনাতেই আপনারা সীমাবদ্ধ নন। এই মণ্ডলের সফলতা দর্শন করে ভারতের আরও কিছু স্থানে উৎসাহী ব্যক্তিরা এই জাতীয় মন্ডল প্রতিষ্ঠা করে এমনি ভাবে গ্রীষ্মকালীন শারীর শিক্ষার কোর্সের প্রচলন করেছেন। অবশ্য সেগুলিতে ঐ একই সিলেবাস অনুসৃত হয়। তার মধ্যে আবার কয়েকটি মণ্ডল বা ব্যায়ামশালা শ্রী হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডলের অনুমোদিত। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হয়েছে সেগুলির নাম হলো আমেদাবাদের গুজরাত ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল, ভাবনগরের কাথিওয়ার ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল, পুণার মহারাষ্ট্রীয় মণ্ডল, নাসিকের অহল্যারাম ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল। এ জাতীয় আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল ১৯৪৭

সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে এক বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করেছেন এবং সরকারী স্বীকৃতিও লাভ করেছেন, এই মণ্ডলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো দেশীয় ক্রীড়া ধারার প্রদর্শন। ১৯২৭ সালে পুণাতে সর্বপ্রথম এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। অবশ্যই দেশীয় ক্রীড়াসমূহের প্রচারই ছিল এর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। প্রায় ২৫০ জন সদস্য সম্বলিত এই দল প্রায় প্রতি বছরই কোনও এক স্থানে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিবারই এই প্রদর্শনীতে বহুজন সমাগম হয়। দেশজ শারীর শিক্ষার এই প্রচারের প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই মন্ডলের শৃঙ্খলাবোধ ও ব্যবস্থাপনার কৃতিত্ব সর্বত্র জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বহিঃভারতেও এই মণ্ডল ভারতীয় শারীর শিক্ষা প্রচার করেছেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক উপলক্ষে সেখানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া শিক্ষা কংগ্রেসে শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল ভারতীয় শারীর শিক্ষা প্রদর্শন করেন। ১৯৪৯ সালে সুইডেনের লিংগাদ ক্রীড়া উৎসবে এবং ১৯৫৩ তে তুরস্কের ইস্তানবুলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসেও এই মণ্ডল অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। ভারতের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বিদেশে ভারতীয় শারীর শিক্ষার প্রচার এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, সিরিয়া এবং ইরাকেও যাত্রা করেছিল এই মন্ডল এবং সেখানে কাবাডি, খো-খো-সমেত বিভিন্ন ভারতীয় শারীর শিক্ষার কর্মসূচী বিদেশের অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করে। নানা সংবাদপত্রে প্রশংসা মুখরিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সফলতার শুরু পর্ব কিন্তু বহু-পূর্বে। ১৯২৫ সালে একদা ইওটমল শহরে মধ্য প্রদেশ ও বেরার অলিম্পিক নামে এক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল ১২৫ জন সদস্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে দলগত বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে এই মন্ডল। সফলতাই প্রেরণার প্রধানতম উৎস, মণ্ডলের পরিচালকরা এর পরেই ধাপ থেকে ধাপে তুলতে শুরু করলেন এই মন্ডলের কার্যকলাপ ও কর্মসূচী।

ভারতে বর্তমানে শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি।

অন্যান্য ভারতীয় শারীর শিক্ষার মত যোগাসনের শিক্ষা ও প্রসারে

এগিয়ে এলেন বোম্বাইয়ের লোনাভালাতে অবস্থিত কৈবল্যধামের প্রতিষ্ঠাতা কুবলয়ানন্দ, বোম্বাইর যোগ ইন্সটিটিউটের স্থাপয়িতা শ্রীযোগেন্দ্র, বাঙ্গালোরের শ্রীসুন্দরম, মাদ্রাজের কুমার স্বামী, কলকাতার আয়রন ম্যান নীলমণি দাশ প্রভৃতি গুণীজন। নীলমণি দাশ পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য যোগাসনের দুটি পৃথক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। যোগাসন প্রসারের কাজে আরও কয়েকজন যাদের অবদান অসামান্য তাঁরা হলেন স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, স্বামী স্বরূপানন্দ, বিষ্ণুচরণ ঘোষ প্রভৃতি।

যোগাসনের প্রসার

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল গোয়ালিয়রের লক্ষীবাঈ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ঝান্সির রাণী লক্ষীবাঈ, যিনি ১৮৫৭ সালে গোয়ালিয়রে ইংরেজ শাসনকালে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের সময় একদা উচ্চারণ করেছিলেন, "মেরি ঝান্সি নেহি দুঙ্গী"—তাঁরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নামানুসারে এই মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। লক্ষ্যণীয়, ১৮৫৭ সালের সেই মহাবিদ্রোহের ঠিক একশত বৎসর পরে ১৯৫৭ সালে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোয়ালিয়রের লক্ষীবাঈ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয় :—

উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ও স্বীকৃতিতে এই মহাবিদ্যালয় পরিচালিত হয়। বিশিষ্ট শারীর শিক্ষাবিদ পি, এম, জোসেফ ছিলেন এখানকার প্রথম অধ্যক্ষ।

দেড়শো একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয় বর্তমানে নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়। সঠিকভাবে শারীর শিক্ষা প্রদানের জন্য এখানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শারীর শিক্ষার নানা জিনিসের সমাবেশ করা হয়েছে। সর্বরকম ক্রীড়া ও এ্যাথলেটিকস শিক্ষার জন্য মাঠের অভাব নেই, ৪০০ মিটার ট্রাক, দুটি করে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ, চারটি টেনিস কোর্ট, একটি স্কোয়াশ কোর্ট, পাঁচটি বাস্কেটবল কোর্ট, পাঁচটি ভলিবল কোর্ট, তিনটি হকি খেলার মাঠ আছে। এছাড়া, কবাডি, খো-খো, ব্যাডমিন্টন, টেনিকয়েট, নেটবল, থ্রো বল প্রভৃতি খেলার কোর্ট আছে। আরও আছে একটি আবৃত ক্রিকেট উইকেট—সারা বছর অনুশীলনের জন্য এবং একটি আধুনিক ইনডোর সুইমিং পুল ও জিমনাসিয়াম।

লক্ষীবাঈ শারীরশিক্ষা কলেজে তিন বছরের ডিগ্রী পাঠক্রম প্রচলিত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই পাঠক্রমে ভর্তি হওয়া

যায় এবং এই ডিগ্রীধারীদের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকের স্বীকৃতি দান করেন। শারীর শিক্ষার প্রতি এই মর্যাদা ভারতে একমাত্র এখানেই দেওয়া হয়। শারীর শিক্ষা আন্দোলনের পথে এই স্বীকৃতিকে ভারতের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলতে কোনও বাধা নেই। এছাড়া, দু-বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাঠক্রমও চালু আছে যেটি পরপর তিনটি গ্রীষ্মাবকাশে দু'মাস করে ছাত্ররা পড়তে পারে।

আরও আছে—দু-বছরের এম, এ / এম, এস, সি [শারীর শিক্ষা] পাঠক্রম যাতে ভর্তি হতে পারে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের স্নাতকরা। সম্প্রতি, শারীর শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের জন্য এক বছরের শারীর শিক্ষার এম-ফিল পাঠক্রম প্রচলিত হয়েছে।

ভারত সরকারের এই মহাবিদ্যালয় নানাভাবে শারীর শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট।

এরাজ আমেদ খানের শারীর শিক্ষার গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম ভারতের বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদান সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। দারাবজী জামশেদজী টাটাই এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে এসে তাঁর সহযোগিতার হাতটি প্রসারিত করেন। ভারতে খেলাধুলার উন্নতিকল্পে তাঁর আর্থিক দান অকল্পনীয়। ১৯১৯ সালে পুণার দাক্ষিণাত্য জিমখানা তদানীন্তন গভর্নর জর্জ লয়েড-কে তাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। সেখানে উদ্বোধন বক্তৃতায় দারাবজী টাটা পরবর্তী বৎসরের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক আসরের কথা উল্লেখ ক'রে গভর্নরকে অনুরোধ করেন যাতে ব্রিটিশ অলিম্পিক কমিটির মাধ্যমে ভারতের জন্য পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণ করা যায়। তদানুসারে, গভর্নর লয়েডের চেষ্টায় তখন পর্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ভারতকে সরাসরি অনুমোদন দান করলো। সুতরাং, অবিলম্বে এক কমিটি তৈরি হলো এবং দারাবজী টাটাকেই সর্বসম্মতিক্রমে তার সভাপতিরূপে বরণ করা হলো। এই কমিটি ১৯২০ সালে এ্যান্টওয়ার্পের আন্তর্জাতিক অলিম্পিকে একটি ভারতীয় দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি ও এ্যাসোসিয়শন

নিম্নলিখিত প্রতিযোগীরা নির্বাচিত হয়েছিলেন ঃ—

১। পি, এফ, চগুলে—ম্যারাথন এবং 10,000 মিটার দৌড়।

২। এ, দাত্তার — ঐ

৩। কে, কাইকাড়ি — ক্রস কাণ্ট্রি রেস।
৪। পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় — 400 মিটার দৌড়।
৫। জি, নাভালে — কুস্তি (লাইট ওয়েট)।
৬। এন, সিন্ধে — কুস্তি (ব্যাণ্টাম্ ওয়েট)।

দলের ম্যানেজার ছিলেন সোরাব ভুট।

বাংলার পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় 400 মিটার দৌড়ে হিটে ৪র্থ স্থান দখল করেছিলেন। পি, এফ, চগ্‌লে 10,000 মিটার দৌড়ে দশম এবং ম্যারাথনে ঊনবিংশ স্থান পেয়েছিলেন এবং কুস্তিতে এন, সিন্ধে সেমি ফাইনালে উঠেছিলেন। তারপর অক্টোবর মাসে ঐ দল দেশে ফিরে এলো। দারাবজী টাটা এদেশে খেলাধূলার মানের উন্নয়নের জন্য এবং সেই সঙ্গে খেলাধূলার ব্যবস্থাপনা ও প্রসারের জন্যও ওয়াই, এম, সি, এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওয়াই, এম, সি, এ-র শারীর শিক্ষার অধিকর্তা ডঃ এ, জি, নোরেন টাটার ডাকে সাড়া দিয়ে একটা কমিটি গঠন করে ১৯২৩ সালে সর্বভারতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থায় অগ্রসর হলেন। এই প্রতিযোগিতার নামকরণ হবে ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। অবশেষে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ এবং ৯ তারিখে দিল্লীর রোশেনারা মাঠে অনুষ্ঠিত হলো সেই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা। নিম্নলিখিত স্থান থেকে প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন ঃ—

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, সিন্ধু, সিংহল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাংকুর, পাঞ্জাব, কোলাপুর, গোয়ালিয়র, বরোদা এবং পাতিয়ালা। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ঃ—১০০, ২০০, ৪৪০ গজ, এক মাইল, তিন মাইল দৌড়, ১২০ গজ হার্ডল্ রেস, দীর্ঘ এবং উচ্চ লাফ আর সটপাট। তারপর ১৯২৪ সালেই প্যারিস অষ্টম অলিম্পিক আসরে একটি ভারতীয় দল প্রেরিত হলো। সাতজনের এই দলের ম্যানেজার ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি—ওয়াই, এম, সি, এ শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাক্ সাহেব। দলে প্রতিযোগী ছিলেন পলা সিং, পীট, হিলডেথ, হল, দলিপ সিং, লক্ষণ এবং হিঞ্জ।

দিল্লীর রোশেনারা মাঠে প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৬ সালের লাহোর অলিম্পিকে উৎসাহের ঘাটতি প্রকট হয়ে দেখা দিল। যথেষ্ট সংখ্যক রাজ্য থেকে প্রতিযোগী না উপস্থিত হওয়ায় এই অলিম্পিককে সরকারী মর্যাদা দেওয়া হলোনা। সুতরাং কলকাতায় আয়োজিত ১৯২৭ সালের

অলিম্পিককেই দ্বিতীয় ভারতীয় অলিম্পিক বলা হলো।

১৯২৭ সালে জন্ম হলো ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শনের। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শনের অনুমোদন লাভেও কোনও অসুবিধা দেখা দিল না কারণ ১৯২০ সাল থেকেই বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতীয় দলে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে দারাবজী টাটা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে স্থির হলো, যে সমস্ত ক্রীড়ার জন্য জাতীয় ফেডারেশন গঠিত হবে .সেগুলি স্বাধীনভাবেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এই প্রতিযোগিতা গুলিকেই বলা হয় জাতীয় ক্রীড়া বা ন্যাশনাল গেমস্।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শন ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় হকি দলকে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে পাঠায় এবং এই দল বিশ্বজয়ী আখ্যা পায়।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শনের প্রথম সভাপতি দারাবজী টাটা স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৮ সালে পদত্যাগ করেন এবং তার শূণ্য স্থান পূর্ণ করেন পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং মহেন্দ্র বাহাদুর।

ধীরে ধীরে শারীর শিক্ষার উন্নতির জন্য ভারতের সব কয়টি রাজ্যেই রাজ্য অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শন গঠিত হলো। বঙ্গদেশে ১৯২৩ সালেই এই সংস্থা গঠন হয়।

ভারতীয় এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন

১৯৪৪ সালে ভারতীয় এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন গঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় এ্যাথলিটদের মানের উন্নতি দেখা যায়। ১৯৪৯ সাল থেকে সুরু হয় বার্ষিক জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা।

স্বাধীনোত্তর যুগে যাঁরা ভারতীয় এ্যাথলিটদের মান বৃদ্ধির কথা চিন্তা করলেন তাঁদের মধ্যে এই ফেডারেশনের সম্পাদক এম, সি, ধাওয়ান একজন। মানবৃদ্ধির প্রাথমিক প্রয়োজন কোচিং এর জন্য কোচ তৈরী করা। এই ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম কোচিং এর ব্যবস্থা হয় ১৯৫০ সালে সিমলা পাহাড় অঞ্চলে কোচ তৈরির উদ্দেশ্যে। সুখের কথা, তারপর এক বছরের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইভাবে কোচ তৈরী করার জন্য আরও দশটি কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

অনেক বছর পূর্বেই সুরু হয়েছে আন্তঃরাজ্য এবং রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আসর। নানাভাবে ভারতীয় এ্যাথলিটদের মান উন্নয়নের

প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত।

অমরাবতী শহরে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় শারীর শিক্ষার একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে শ্রীহনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল এবং অখিল মহারাষ্ট্র শারীরিক শিক্ষণ মন্ডল। জাতীয় নেতা শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। এই কনফারেন্সের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল শারীর শিক্ষা ও প্রমোদের সর্বভারতীয় এ্যাসোসিয়শন গঠন। শ্রী শরৎ চন্দ্র বসুই সেই বছরের জন্য এই এ্যাসোসিয়শনের সভাপতি পদ অলংকৃত করলেন, যার ফলে এর মর্যাদা ও সম্মান সহজেই স্বীকৃত হলো। এই সর্বভারতীয় শারীর শিক্ষা ও প্রমোদ এ্যাসোসিয়শনের অধীনে থাকলো (ক) জাতীয় পরিষদ, (খ) কার্যকরী কমিটি ও (গ) অনুমোদিত রাজ্য এ্যাসোসিয়শনগুলি। আর, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী লিপিবদ্ধ হলো এইভাবে ঃ—

অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষণ মণ্ডল

(ক) দেশবাসীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার উন্নতি বিধান করা।

(খ) শারীর শিক্ষা ও প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীর শরীর ও মনের উন্নতি করা এবং এই জাতীয় শারীর ক্রিয়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সর্বদাই রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক প্রভাব মুক্ত থাকবে।

(গ) শারীর শিক্ষা ও প্রমোদমূলক ঘরে বসে খেলা ও মাঠের খেলাধূলার প্রসার ও উন্নয়ন।

(ঘ) বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও পুস্তক প্রকাশনার দ্বারা শারীর পটুতা ও সচলতা সর্বত্র প্রচার কার্য চালানো।

(ঙ) ভারতের জাতীয় ক্রীড়া পরিচালনা ও উন্নত করা।

(চ) শারীর শিক্ষা ও প্রমোদানুষ্ঠানের সবগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা।

(ছ) দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সামরিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা।

(জ) শারীর শিক্ষার সর্বাধুনিক উন্নতির সংবাদ সংগ্রহ করা এবং শারীর শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(ঝ) ভারতের নিজস্ব বা দেশজ শারীর ক্রিয়ার প্রচার ও প্রসার।

(ঞ) নেতৃত্ব সম্পর্কে পাঠক্রম ও কার্যক্রম তৈরি করা।

শারীর শিক্ষায় জাতীয় এ্যাসোসিয়শনের অধীনে রাষ্ট্রীয় এ্যাসোসিয়শনগুলি নিজ নিজ রাজ্যের শারীর শিক্ষা প্রসারে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পেলো এবং রাজ্য মধ্যে নূতন ক্লাব, ব্যায়ামাগার, আখড়া তৈরী করা এবং সেগুলির প্রতি নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ানোও হলো সেগুলির অন্যতম অবশ্য কর্তব্য। এই ধরণের সংস্থাগুলিকে আর্থিক অনুদানও মঞ্জুর করে এই রাজ্য এ্যাসোসিয়শনগুলি।

শারীর শিক্ষার রাষ্ট্রীয় এ্যাসোসিয়শন

১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শারীর শিক্ষা ও প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানকে সঠিক পথে চালনা করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করলেন। সরকারকে তা শারীর শিক্ষা বিষয়ে কর্মসূচী তৈরী করার সাহায্য করাই হলো এই বোর্ডের কাজ। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ আশফাক্ হোসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট শারীর শিক্ষাবিদদের নিয়ে বোর্ড গঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রী কে, এন, রায় এবং শ্রীমতী লীলা রায় সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। ভারতের পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনও ছিলেন এই বোর্ডের সদস্য।

শারীর শিক্ষা ও প্রমোদ মূলক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড

শারীর শিক্ষা ও প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী করার বিভিন্ন বিষয়ে এক মত হয়ে এই বোর্ড সেই পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করেন।

এই উপ-কমিটিকে দেশের শারীর শিক্ষা ও প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের বিশেষত, বালক বালিকাদের তৎকালীন ব্যবস্থাপনার অবস্থার বিবেচনা এবং তাঁর তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী উন্নতির পরিকল্পনার জন্য উপায় নির্ধারণের পরামর্শ বিষয়ে একটি রিপোর্ট দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। আরো নির্দেশ দেওয়া হলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে রিপোর্টে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করার জন্য ঃ—

(ক) শারীর শিক্ষাকে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয় করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভবপর মনে করলে কীভাবে করা যেতে পারে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে শারীর শিক্ষার কোন বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

(গ) শারীর শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক কীভাবে পাওয়া যাবে।

(ঘ) বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের জন্য শারীর শিক্ষার কার্যক্রম বা সিলেবাস তৈরি করা।

১৯৫৪ সালে ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা মন্ত্রক থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল। এই কাউন্সিল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ফেডারেশন ও জাতীয় এ্যাসোসিয়শনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সেতু রচনা করা। এই সময়েই প্রত্যেক রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো নিজ নিজ রাজ্য ক্রীড়া কাউন্সিল গঠন করে সর্বভারতীয় ক্রীড়া কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে নেবার জন্য।

ভারতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল

সর্বভারতীয় ক্রীড়া কাউন্সিলের প্রতি যে কার্যগুলির দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো সেগুলি নিচে দেওয়া হলো ঃ—

(ক) খেলাধূলার যাবতীয় বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করা।

(খ) দেশের খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ব্রীড়া সংস্থাগুলিকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করা।

(গ) যোগ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করা।

(ঘ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা।

(ঙ) বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করা, স্টেডিয়াম নির্মাণ করা ও ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করার প্রস্তাবগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

(চ) বিভিন্ন খেলার জাতীয় দলগুলির বিদেশ যাত্রার অর্থব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

(ছ) বিদেশাগত বিভিন্ন দলগুলির জন্য অর্থব্যয়ের সুপারিশ করা।

(জ) ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্জুন, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ প্রভৃতি খেতাবের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের নাম সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

ভারতের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো জাতীয় শারীর পটুতার পরীক্ষা। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উদ্যোগে ১৯৫৯-৬০ সালে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়।

জাতীয় শারীর পটুতার পরীক্ষা

শারীর পটুতার এই পরীক্ষায় কোনও প্রতিযোগিতার স্থান নেই। এই পরীক্ষায় প্রত্যেকেই নিজের শারীর ক্ষমতার পরিমাপ করে নিতে পারে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় সব বয়সের নারী পুরুষেরাই এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত, প্রতি বছরই হাজার হাজার নরনারী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তিনভাগে বিভক্ত এই পরীক্ষায় মান নির্ধারণের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে। মোটামুটি সহজ, কঠিন ও কঠিনতর—এই তিন রকম ভাগ আছে এবং প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক মানের শারীর ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। পুরুষ ও নারীর জন্য অবশ্যই পৃথকমান নির্দিষ্ট করা আছে। বয়সের বিভাগও আছে চাররকম ও তিন রকম। (পুরুষদের জন্য) (ক) ১৮ বছরের নীচে, (খ) ১৮ থেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত, (গ) ৩৫ থেকে ৪৪ বছর পর্যন্ত। (ঘ) ৪৫ বছর এবং তদূর্ধ্বে। (নারীদের জন্য) (ক) ১৬ বছরের নীচে (খ) ১৬ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত, এবং (গ) ৩১ বছর ও তদূর্ধ্বে।

পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগেই পরীক্ষা আছে তিন রকম। এগুলিকে বলা হয় এক তারা, দুই তারা ও তিন তারা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেটসহ এই তিন শ্রেণীর ধাতু নির্মিত ব্যাজ দেওয়া হয়। সবচেয়ে কঠিন হলো তিন তারার ব্যাজ অর্জন করা।

জাতীয় শারীর পটুতার এ পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য আছে—বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, রেল ক্রীড়া পর্ষদ, ডাক ও তার বিভাগের ক্রীড়া পর্ষদ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, জাতীয় সেবা পরিকল্পনা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি। অবশ্যই অভিজ্ঞ ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ কিংবা শারীর শিক্ষার শিক্ষকরাই ভারপ্রাপ্ত হন এই পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করার জন্য। বলাই বাহুল্য, অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোন প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হয় না এবং বয়সের ভাগ থেকেই বোঝা যায় যে সমাজের সব শ্রেণীর নরনারীই এতে অংশগ্রহণ ক'রে নিজেদের শারীর পটুতার পরিমাপ ও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেই এই পরীক্ষায় প্রতি বছরই অংশ গ্রহণ করতে পারে।

জাতীয় শারীর পটুতার এই পরীক্ষায় ক্রীড়াক্ষেত্রের নানারকম বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর দৌড়ের গতি, শক্তি সামর্থ্য, পেশীর শক্তি, শারীরিক সচলতা প্রভৃতি বিষয়গুলি নানা রকম শারীর ক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা বা পরিমাপ করা হয় এবং এর জন্য দৌড়, লাফ, নিক্ষেপ, ডন বৈঠক ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শারীর ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত এই ব্যবস্থা দ্বারা যারা সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের কর্মজীবনেও স্বভাবতই নানা ভাবে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এমন কি চাকরি লাভের ক্ষেত্রেও তিন তারার সার্টিফিকেট সাহায্য করে।

১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত-কাউরের নামে বৃহদাকারের একটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রচলিত হয়। হকির যাদুকর ধ্যান চাঁদ এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রাম সিং এখানে প্রশিক্ষণ কার্যে যোগদান করেন। কয়েকজন বিদেশী প্রশিক্ষকও এখানে নিযুক্ত হন।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পাতিয়ালা

এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষকেরা প্রায় সমগ্র দেশে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খেলার স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই সাধারণত এই প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।

ভারতে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সূত্রে এই জাতীয় আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের অবদান আছে। সর্বভারতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল প্রধানত, শারীর শিক্ষার শিক্ষক এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত উৎসাহী ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষক তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া, জাতীয় ফেডারেশন ও কয়েকটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন করে।

কিছুকাল এইভাবে নানা খেলার প্রশিক্ষণ কার্য চলার পরে বিশিষ্ট শারীর শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করলেন যে, খেলাধূলার মান উন্নয়নে এটা সঠিক পথ নয়। সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হলো দলে দলে ক্রীড়া প্রশিক্ষক তৈরী করা, যাতে এঁরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ে বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, নচেৎ ক্রীড়ার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই রকম চিন্তাধারারই ফসল হলো পাতিয়ালার জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে এর নাম হয় নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এর জন্যে সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়া-কাউন্সিলে সুপারিশ ও পরামর্শই ভারত সরকারের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬১ সালের ৭ই মে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে, এল, শ্রী মালি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যের প্রায় সর্বরকম প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সমৃদ্ধ ৩০০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত পাতিয়ালার এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভারতীয় শারীর শিক্ষার প্রগতির এক উজ্জ্বল স্তম্ভ। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি,

বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, এ্যাথলেটিকস জিমনাস্টিক, সাঁতার, কুস্তি প্রভৃতি ক্রীড়ার শিক্ষক তৈরীর বৃহত্তম কেন্দ্র এই নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান। অবশ্য প্রয়োজন মতো জাতীয় স্বার্থে খেলোয়াড়দেরও মাঝে মাঝে এখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কালক্রমে, এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র আর পাতিয়ালাতেই সীমাবদ্ধ রইলো না। দিল্লী ও বাঙ্গালোরেও দুটি পৃথক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো। কলকাতায় লবণ হ্রদেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন ক্রীড়ার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী প্রশিক্ষকেরাও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত আছেন। প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় প্রকার পন্থাই এখানে অবলম্বন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্রয়োজন অন্তত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া ইনসটিটিউটে ১৯৭২ সালে একটি সুন্দর স্পোর্টস মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। মোতি প্যালেসের আড়ম্বরপূর্ণ বিশাল কক্ষে এই সংগ্রহশালা অবস্থিত। এই সংগ্রহ-

পাতিয়ালার স্পোর্টস সংগ্রহশালা

শালার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হলো ভারতীর হকি দলের ১৯২৮ সালে অলিম্পিক বিজয় থেকে ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপ জয় পর্যন্ত ইতিহাস। ১৯২৮ সালে আর্মস্টারডাম অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদের প্রাপ্ত সার্টিফিকেটটিও এখানে রক্ষিত আছে। ক্রিকেট জগতের কিংবদন্তীর অন্যতম নায়ক রণজিৎ সিং এর ব্যবহৃত ক্রিকেট ব্যাটগুলি, সি, কে, নাইডুর বৃহৎ আকারের ক্রিকেট বুট, মিলখা সিং এর সেই রানিং শু যা পরে তিনি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন, ভারতের প্রথম প্রাপ্ত হকি স্বর্ণপদক, ভারতীয় টেনিসের গৌরব ঘাউস মহম্মদের টেনিস র‍্যাকেট ইত্যাদি ভারতীয় খেলাধূলা জগতের অবিস্মরণীয় কিছু সামগ্রী। ১৯৫১ সালে দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসে দলীপ সিং যে মশালটি বহন করেছিলেন সেটিও এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। ১৯৩২ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যে মূল্যবান স্মারকগুলি ভারতীয় ক্রীড়া জগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ পঙ্কজ গুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসনা গুপ্তা এই সংগ্রহশালায় দান করেন। এখানে ১৯০৮ সালে অলিম্পিক প্যারেডের এক সুন্দর ছবি আছে। ১৯২৭ সালে আর্থার গিলিগানের অধিনায়কত্বে এম, সি, সি যে ক্রিকেট দল

ভারতে এসেছিল সেই দলের ছবিও আছে। বর্তমানে এখানে সংগ্রহের সংখ্যা ১২০০-র কিছু বেশী।

এখানে সংগৃহীত ক্রীড়া জগতের নানা স্মৃতি চিহ্ন, ট্রফি, খেলোয়াড়দের প্রাপ্ত মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেট, ব্যাজ, তাঁদের ব্যবহৃত ক্রীড়াসামগ্রী এমন কি পুরাতন সাজ পোষাক, বিভিন্ন খেলা ও খেলোয়াড়দের ছবিগুলি বলাই বাহুল্য, ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী। দিনে দিনে বাড়বে এই সংগ্রহের পরিমাণ। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে যেমন এর মূল্য অপরিসীম, তেমনি উদীয়মান খেলোয়াড়দেরও প্রেরণা জোগাতে সাহায্য করবে এগুলি। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণের মধ্যে খেলাধূলার গুরুত্ব সম্পর্কেও চেতনা বৃদ্ধি পাবে ও খেলোয়াড়দের প্রতি সম্ভ্রম বোধ জাগ্রত হবে।

ইংরেজ শাসনের অবসানে ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে হিন্দু শরণার্থীরা দলে দলে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বভাবতই, প্রবল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে এই দেশত্যাগীদের মানসিকতায় এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল। অনিশ্চয়তা আর হতাশায় আক্রান্ত এই হতভাগ্যের দল বিশৃঙ্খলার শিকার ও বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত হলো। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল ভোঁসলে এই সময় ভারত সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভোঁসলে এই উদ্বাস্তুদের কথা চিন্তা করে একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরী করলেন। এই পরিকল্পনা অবলম্বনে তিনি ১৩ বছর বয়সের নীচে উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করলেন দিল্লীর এক ময়দানে। প্রধান মন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু সহ এক বিশাল জনতা এই অনুষ্ঠান দেখেন। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশপ্রেম, সুনাগরিক হবার প্রেরণা, সামাজিক একতা বোধ ও সহনশীলতা বোধের উন্মেষ করা এবং তার সঙ্গে অবশ্যই শরীর গঠন। যথেষ্ট কঠোর বিভিন্ন প্রকার শারীর ক্রিয়ার সাহায্যে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ ভাবে খুশি করে। তিনি এই কর্মসূচীকে কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র ভারতের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রসারিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং তিনি মেজর জেনারেল ভোঁসলেকে এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবিলম্বে ভারত

জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প

সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা হলো এই জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প এবং ১৯৫৭ সালে দেশের বিদ্যালয়গুলিতে এই প্রকল্প প্রচলিত করার মানসে এটিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করা হয় :—

(ক) শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতি করা।

(খ) ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করা।

(গ) দলবদ্ধ কার্যদ্বারা আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধের উদ্বোধন।

(ঘ) ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা ও দেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত করা।

(ঙ) আত্মনির্ভরতা, আত্মত্যাগ ও সহনশীলতা শিক্ষা দেওয়া।

রাজস্থানের আলোয়ার নামে স্থানের কাছে শরিস্কায় ১৯৬০ সালে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া পঞ্জাব, দিল্লী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ২৫ বছরের যুবক যুবতীরা এই ট্রেনিং গ্রহণ করতে পারেন। ৬ মাস ব্যাপি এই ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হয়। যাঁরা কোনও শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয় থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত তাঁদের জন্য এই ট্রেনিং এর কার্যকাল তিনমাস। জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের ট্রেনিং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো স্কোয়াড ড্রিল, প্যারেড, শরীর চর্চার নানারকম ব্যায়াম, খেলাধুলা, জিমনাস্টিক, এ্যাথলেটিকস্ দেশীয় শারীর ক্রিয়া ও খেলা। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায় সঙ্গীত, লোকনৃত্য, জাতীয় সংহতিমূলক সঙ্গীত, ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার বক্তৃতার সাহায্যে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অতীত গৌরবের কাহিনী জানানো হয়। জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প নিঃসন্দেহে ভারতে বিদ্যালয়স্তরের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সামরিক শিক্ষার নামান্তর জাতীয় ক্যাডেট কোর। ইংরেজ যুগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উন্নতি সাধনার্থেই এই ট্রেনিং দেওয়া সুরু হয়।

ভারতের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষার প্রচলন সুরু হয়। তখন এর নাম ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোর। ইংরেজ সেনা অফিসারদের মধ্যে যাঁরা সার্জেণ্ট এবং তার ঊর্ধ্বতন, সাধারণত তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই কঠোর ট্রেনিং দিতেন। এই ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্ররা স্বভাবতই শারীর পটুতায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল।

জাতীয় ক্যাডেট কোর

ভারতের স্বাধীনতার পরে এর নামকরণ হয় জাতীয় ক্যাডেট কোর। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও স্ত্রীদের এই প্রাথমিক সামরিক শিক্ষার ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তাদের যোগ্যতা অনুসারে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের খেতাবগুলিই দেওয়া হয়। সার্জেণ্ট, লেফটেনাণ্ট, মেজর কর্ণেল প্রভৃতি সামরিক খেতাবগুলি ব্যাজসহ তাঁরা অবলীলাক্রমে ধারণ করেন।

এই ট্রেনিং যুব সমাজে সহজেই শৃঙ্খলা পরায়ণতা, সাহস ও শারীর পটুতা আনয়ন করে। ১৯৬০ সাল থেকে রাইফেল চালনাও এই ট্রেনিং এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বস্তুত, জাতীয় ক্যাডেট কোর ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি পৃথক বিভাগ। এই বিভাগের সর্বোচ্চ অফিসারের খেতাব ডিরেক্টর জেনারেল। তিনি আসলে একজন উচ্চ সামরিক অফিসার।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন ও ভারতীয় হকি

ভারতীয় হকি ফেডারেশন ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে গোয়ালিয়রে গঠিত হয় এবং তার তিন বছর পরেই ভারতীয় হকিদলের অলিম্পিকে বিশ্বজয়ী হওয়ায় এই ফেডারেশন সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করলো। তারপর থেকে অলিম্পিক সমেত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হকি প্রতিযোগিতাতেও ভারতীয় হকি ফেডারেশনের মাধ্যমেই অংশ গ্রহণ করা সুরু হলো। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠিত হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৯০৮ সালে বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়শন স্থাপিত হয়েছিল।

ভারতে হকি খেলার জনপ্রিয়তার প্রসারে কলকাতার অবদান অসামান্য। ১৮৮৫ সালে কলকাতাতেই প্রথম কয়েকটি হকি ক্লাব গঠিত হয়। শুধু তাই নয়, ১৮৯৫ সালে কলকাতায় বিখ্যাত বেটন প্রতিযোগিতা সুরু হয়। তার পরের বছর বোম্বাইতে সুরু হয় আগা খাঁ প্রতিযোগিতা।

বর্তমানে নিম্নলিখিত হকি প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় ঃ—

(ক) বেটন কাপ।

(খ) আগা খাঁ কাপ।

(গ) ধ্যানচাঁদ ট্রফি।

(ঘ) সিন্ধিয়া গোল্ড কাপ ইত্যাদি।

এছাড়া জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা সুরু হয় ১৯২৮ সালে। বিজয়ীদের রঙ্গস্বামী কাপ দেওয়া হয়।

ভারতীয় হকির প্রথম প্রচলন করেন এখানকার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ও ভারতীয় ফৌজেরা।

বাংলা, বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও সিন্ধুতে হকি খেলার প্রথম প্রসার দেখা যায়।

অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই খেলায় বিশেষ দক্ষতা দেখাতে সুরু করে যদিও ইংরেজরা আধুনিক হকির জন্মদাতা কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের স্টিক, চাতুর্য কব্জির পেলবতা ও তীব্র গতির সাহায্য সহজেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলো।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ অলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলকে পাঠাবার জন্য ভারত সরকারের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেখান থেকেই বাস্তবিক পক্ষে সুরু হয় ভারতীয় হকির জয়যাত্রা। দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল অক্ষুন্ন ছিল সেই জয়যাত্রা। অলিম্পিকের স্বর্ণপদক প্রতিবারই ভারতীয় দলের গলায় ঝোলানো হয়। প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক দলে ছিলেন—আর, এ্যালেন, এম রক্, এল হ্যামন্ড, আর নরিশ, বি, পিনিজার, এস ইউসুক, এম, ক্যালেন, এম, গ্যাটলে, জি, মার্থিনস, ধ্যানচাঁদ, অফ, সিম্যান, কেহার সিং, সৌকত আলি, ফিরোজ খাঁ, পতৌদির নবাব ইকতিয়ার আলি ও জয়পাল সিং (অধিনায়ক) এ, বি, রসার (ম্যানেজার)। ফাইনাল খেলায় হল্যাণ্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে। ভারতীয় দলের হকির জয়যাত্রার প্রথম তিনটি অলিম্পিকে অর্থাৎ ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ধ্যানচাঁদই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। বার্লিনের অলিম্পিক খেলার পরেই তাঁকে "হকির যাদুকর" আখ্যা দেওয়া হয়। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের তীব্রগতি, অসাধারণ স্টিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিখুঁত পাস ও গোল দেবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সকলের বিস্ময় উদ্রেক করতো।

ইংরেজ যেখানে যায় তার সঙ্গে ছায়ার মতন চলে ক্রিকেট। ভারতেও ক্রিকেটের আমদানি ইংরেজদেরই। বিজ্ঞজনেরা বলেন, ভারতে ইংরেজের সবচেয়ে বড়ো দান ইংরেজি ভাষা আর ক্রিকেট। উইসডেনের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, ১৭২১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জাহাজ বোম্বাইয়ের নিকটে ক্যাম্বেতে পেঁছলে নাবিকেরা সেখানে প্রথম ক্রিকেট খেলে এবং ভারতের মাটিতে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল পার্শিদের সঙ্গে ওল্ড ইটোনিয়নদের মধ্যে। সালটা ছিল ১৭৮৪। ১৭৯২ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিকারিকরা এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গত, এটি ভারতের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব তো বটেই এমনকি ইংলণ্ডের বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব। ইডেন গার্ডেনই ছিল এদের খেলার মাঠ। ১৭৯২ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব দুটি ম্যাচ খেলে। একটি ব্যারাকপুরের বিরুদ্ধে অপরটি দমদমের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও ভারতের-ক্রিকেট

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পার্শিরা গঠন করলো জোরাষ্ট্রিয়ান ক্লাব। পার্শিরা ক্রিকেট খেলায় বেশ মেতে উঠেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকাই এর অন্যতম কারণ। পার্শিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন এম, ই, পাভরি। ব্যাটে বলে সমান দক্ষতা ছিল তার। ১৮৬৬ সালে গঠিত হলো বোম্বাই ইউনিয়ন হিন্দু ক্লাব। আবার ১৮৮৩-তে মহমেডান ক্রিকেট ক্লাবের আবির্ভাব হলো। কলকাতা শহরে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্রিকেট ক্লাব। ১৮৭৮ সালে একজন ভারতীয় অধ্যাপক ছিলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৬ সালে পার্শিদের একটি ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে গিয়েছিল ম্যাচ খেলতে সাহেবদের সঙ্গে। দলের অধিনায়ক ছিলেন ডি, এইচ, প্যাটেল। বিভিন্ন ক্লাব ও ছোট কাউণ্টির সঙ্গে ২৮ টি ম্যাচ খেলে এরা। আবাব ১৮৮৯-৯০ সালে ইংলণ্ড থেকে একটি দল এসেছিল ভারতে। ইংরেজরা অনেকেই ভারতে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু ইংলন্ডের কোনও একটি দলের সম্ভবত এটাই প্রথম ভারত ভ্রমণ।

ধীরে ধীরে ভারতে ক্রিকেট বেশ জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হলো। তৎকালীন দেশীয় রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ক্রিকেট খেলার বড়ো পৃষ্ঠপোষক হলেন। পাতিয়ালার মহারাজা ছিলেন এমনি এক ব্যক্তি। তাঁরই অক্লান্ত প্রয়াসে ১৯১১ সালে একটি ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলতে

গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এগুলি টেস্ট খেলা নয়, কেননা এর কোনটাই সর্বভারতীয় দল ছিল না। দেশীয় রাজা মহারাজাদের মধ্যে আরও দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হলো নবনগরের রঞ্জিৎ সিংজী এবং পতৌদির নবাব ইফ্‌তিকার আলি। যদিও রঞ্জিৎ সিং ভারতে বিশেষ ক্রিকেট খেলেননি তথাপি তিনি ভারতীয় এবং পৃথিবীর ইতিহাসে অমর রঞ্জি হিসাবে চিহ্নিত হন। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রায় প্রতি বৎসরেই তিনি ২০০০ থেকে ৩০০০ রান করতেন। এইরকম একটি খেলায় তিনি একবার অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসেছিলেন। তিনি একদিনেই দুটো ডবল সেঞ্চুরি করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমে একটি দলের হয়ে ব্যাট ক'রে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই দুশো রান সমাপ্ত ক'রে কাছাকাছি অপর একটি মাঠের খেলায় ব্যাটিং দলের পক্ষে ব্যাট করতে নামলেন মধ্যাহ্নভোজের পরে এবং সেখানেও গিয়ে হাঁকালেন দুশো রানের এক চমকপ্রদ ইনিংস দিনের খেলা শেষ হবার পূর্বেই। রঞ্জীই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংলন্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সেখানেও দলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ক্রিকেট ব্যাটিং-এর সবগুলি মারেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তবে গ্লাইড্ নামে সূক্ষ্ম মারটিতে তিনি অসাধারণত্বের পর্যায়ে উঠেছিলেন।

ভারতে প্রথম প্রতিনিধিমূলক খেলা সুরু হয় বোম্বাইতে ১৮৮৪-তে। বোম্বাই জিমখানা বনাম পুণা জিমখানা দলের মধ্যে এই খেলা হয়েছিল এবং একাদিক্রমে আট দিন ধরে চলেছিল সেই খেলা। এরপর ১৮৯২ সালে পার্শিরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে খেলা সুরু করলো। এখানে অবশ্য ইউরোপীয় বলতে বুঝতে হবে ইংরেজদের। তিন দিন ব্যাপী এই ম্যাচ-গুলির নাম হলো প্রেসিডেন্সি ম্যাচ। প্রতি বছরই এই ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হতো। তবে এক বছর বোম্বাইতে আর পরের বছর পুণাতে। তারপর ১৯০৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের নিয়ে গঠিত একটি দল যোগদান করলো। তিনটি দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতার নতুন নামকরণ হলো ট্র্যাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা।

এর পাঁচ বছর পরে যখন মুসলমানদের দলও যোগদান করলো তখন এর নাম হয়ে গেল কোয়াড্রাঙ্গুলার বা চতুর্ভুজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা কয়েকবছরের মধ্যেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করলো। সৌভাগ্যক্রমে, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের দেখা গেল। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন দলে

স্থান পেতে হলে তাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতেই হবে। অতএব, তার জন্য দরকার হলো অনুশীলন। আর, অনুশীলনের তো বিকল্প কিছু নেই। ক্রমে ক্রমে কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ভারতের সর্বপ্রধান ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সম্মান পেল। প্রায় কুড়ি বছর ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় ক্রিকেটের বনিয়াদ গড়ে তুললো। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের ফলে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সাময়িকভাবে কয়েক বছরের জন্য বন্ধ থাকে। আবার ১৯৩৭ সালে ভারতের প্রথম সারির ক্রীড়া সংগঠক অ্যান্টনি ডি মেলোর প্রচেষ্টায় যখন এই প্রতিযোগিতা পুনরায় প্রচলিত হল তখন এর নাম হলো পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা, কেন না তখন আর একটি দল যোগদানের ফলে প্রতিযোগী দলের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ। এই পঞ্চম দলের নাম হলো অবশিষ্ট দল।

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতাই ছিল এই সময় ভারতের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীরাই ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের কুলীন সম্প্রদায়। বস্তুত, পেণ্টাঙ্গুলারে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবেই হতো খেলোয়াড়ের কষ্টি পাথরের যাচাই। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বপ্রথম স্বীকৃতির স্বাক্ষর হলো ১৯২৬ সালের এম, সি, সি দলের প্রায় ছয়মাসের ভারত সফর। এর আগের বছরেই যিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন সেই আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে ভারতে পদার্পণ করেছিল এই এম, সি, সি দল। এই দলে ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড়রা ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে শতরান ছিল ওয়াজির আলির দুটি এবং সি, কে, নাইডু ও দেওধরের একটি করে। তবে ব্যাটিং পরাক্রমে নাইডুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। একটি সর্বভারতীয় দলের পক্ষে সি, কে, নাইডু এম, সি, সির বিরুদ্ধে ১০০০ মিনিটে ১৫৩ রান করেন। তার মধ্যে ১১টি ওভার বাউণ্ডারী ও ১৩টি বাউণ্ডারি ছিল। উল্লেখ্য, তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন যুগের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার মরিসটেট ছিলেন।

পোরবন্দরের মহারাজার অধিনায়কত্বে ভারতীয় ক্রিকেটদল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য রওনা হলো ১৯৩২ সালে।

ভারতীয়দের প্রথম টেস্ট খেলা

একটি টেস্ট সমেত ২৬ টি ম্যাচ খেলে ভারতীয় দল। টেস্ট দলে ছিলেন—সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক),ওয়াজির আলী, অমর সিং, মহম্মদ নিশার, জাহাঙ্গীর খাঁ,

নাজির আলী, নাওমল, নাভ্‌লে, কোলা, পালিয়া ও লাল সিং। এই প্রথম টেস্টখেলায় ব্যাটিং এর চেয়ে বোলিংএ অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ভারতীয় দল। প্রথম ইনিংসে মহম্মদ নিসারের ৯৩ রানে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে জাহাঙ্গীর খাঁর ৬০ রানে ৪ উইকেট খুবই উল্লেখযোগ্য। অমর সিং দুই ইনিংসেই দুটি করে উইকেট পান। খেলার সূচনায় ইংলণ্ড দলের তিন উইকেটে রান ছিল মাত্র ১৯। যাঁকে শ্রেষ্ঠতায় ঠিক ডন ব্রাড-ম্যানের পরবর্তী হিসাবে গণ্য করা হতো সেই ওয়ালি হ্যামণ্ডকে প্রথম ইনিংন্সে অমর সিং মাত্র ৩৫ রানে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে জাহাঙ্গীর খাঁ মাত্র ১২ রানে বোল্‌ডে আউট করে দেন। সামগ্রিক ভাবে এই সফর যথেষ্ট সাফল্যের নজির রেখেছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নথি উইসডেন তার ১৯৩৩ সালের প্রকাশনায় কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বিশেষ ক'রে সি, কে, নাইডুকে সম্মানের শিখরে রাখা হলো। সে বছরের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হলো। ভারতীয় ব্যাটধারীরা এই সফরে একুশটি শতরান করেন। তার মধ্যে নাইডু ও ওয়াজির আলি উভয়েই ছয়টি ক'রে। বোলিং-এ অমর সিং ১১১ টি এবং মহম্মদ নিশার ৭১ টি উইকেট লাভ ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত লর্ডসের মাঠে সি, কে, নাইডুই প্রথম ভারতীয় যিনি শতরান করলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় সি, বি ফ্রাই নাইডুকে বিশ্বের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অন্যতম হিসাবে অভিহিত করেন। এই সফরে সি, কে, নাইডু ৩৬ টি ওভার বাউণ্ডারি মেরে সকলকে বিস্মিত করেন এবং গুণীজনদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, এই ইংলণ্ড সফরের সময় সি, কে, নাইডুর বয়স ছিল ৩৭ বৎসর অর্থাৎ যৌবন অতিক্রান্ত।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম যুগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষভাবে ব্যাট-স্‌ম্যানদের মধ্যে আক্রমণাত্মক খেলারই প্রাধান্য দেখা যায়। যার ফলে, যদিও দর্শকদের খুশী করা যতটা সহজ ছিল, খেলায় জয়লাভ করা ততটা সহজ হয়নি। বস্তুত, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তখন ভিন্ন। জয়লাভ করার চেয়ে ব্যাটিং-এর বর্ণচ্ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিজয় মার্চেণ্ট এবং বিজয় হাজারের যুগ থেকেই ভারতীয় ব্যাটিং-এর ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকেই ব্যাটিংএর

ভারতীয় ক্রিকেটের বিবর্তন

রক্ষণাত্মক খেলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে সেটা আক্রমণকে বিসর্জন দিয়ে নয়, কিছুটা সংহত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সুফল দেখা যায় পরবর্তীকালের টেস্ট খেলাগুলির পরিসংখ্যানে। বর্তমানে ভারতীয়দল বিশ্বের ক্রিকেট গগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দলগত খেলাধুলার জগতে হকির পরেই ভারতের ক্রিকেট আন্তর্জাতিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

পেণ্টাঙ্গুলারের সমান্তরাল ভাবেই আর একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা ছিল রঞ্জি ট্রফি। সিমলায় অনুষ্ঠিত ১৯৩৪ সালের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় ডি, মেলো রাজ্য বা প্রদেশগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা প্রচলন করার প্রস্তাব পেশ করেন এবং তিনি ক্রিকেটের রাজপুত্র রঞ্জিৎ সিংজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতার নামকরণের কথাও বলেন। সভায় উপস্থিত পাতিয়ালার মহারাজা তৎক্ষণাৎ রঞ্জির নামে একটি স্বর্ণনির্মিত কাপ দেবার অঙ্গীকার করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে উভয় প্রস্তাবই সাগ্রহে গৃহীত হয়ে গেল।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা

স্বর্ণ নির্মিত এই কাপের এক পিঠে লিখিত আছে—ক্রিকেটের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নবনগরের স্বর্গত হিজ হাইনেস স্যার রঞ্জিত সিংজী বিভাজীর স্মৃতিতে সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজ স্যার ভূপেন্দ্র সিং মহীন্দর বাহাদুর কর্তৃক এই রঞ্জি ট্রফি প্রদত্ত হলো। অপর পীঠে অংকিত ভারতের একটি মানচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত আছে।

রঞ্জি ট্রফির প্রথম খেলা হয় ১৯৩৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর মাদ্রাজের চিপক মাঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মাদ্রাজ এবং মহীশূর রাজ্যদল। রঞ্জি-ট্রফির প্রথম বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন বোম্বাই দল।

বর্তমানে রঞ্জি প্রতিযোগিতাই ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় উন্নত ক্রীড়ামানের স্বাক্ষর রাখলেই সাধারণত ভারতীয় টেস্টদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়।

বাংলাদল ১৯৩৯ সালে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল। ইডেন উদ্যানে ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ তারিখে বাংলার বিরুদ্ধে ছিল শক্তিশালী দক্ষিণ পঞ্জাবদল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন কার্তিক বসু, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল ভট্টাচার্য, তারা ভট্টাচার্য ও জব্বর। বাংলাদলের প্রথম ইনিংসে রান ছিল ২২২, তার মধ্যে কার্তিক বসুর ৪৮ রান ছিল সর্বোচ্চ রান। দক্ষিণ পঞ্জাবের ৩২৮ রানের মধ্যে অধিনায়ক

ওয়াজির আলি একাই ২২২ রান করেন কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে কমল ভট্টাচার্য ও অধিনায়ক টম লংফিল্ডের মারাত্মক বোলিং এ দক্ষিণ পঞ্জাব মাত্র ১৩৪ রানে সকলে আউট হয়ে যায় এবং বাংলা ৪১৮ রান করে জয়-লাভ করে। কোচিং দান করে বাংলার ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেন কার্তিক বসু ও কমল ভট্টাচার্য। এর পূর্বে যাঁরা বাংলার ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয় অধ্যক্ষ সারদা রঞ্জন রায়ের নাম। কেন না তাঁকেই বলা হয় বাংলার ক্রিকেটের জনক। অবিভক্ত বাংলার স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং এরিয়ান ক্লাবই ছিল আদি ক্লাব গুলির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমানের এবং জনপ্রিয়। স্পোর্টিং ইউনিয়নে ছিলেন সারদা রঞ্জন রায় ও তাঁর ভাই শৈলজা রায় ও নীরজা রায়, শৈলেশ বসু ইত্যাদি এবং এরিয়ানের দলে ছিলেন দুখীরাম মজুমদার, বিধু মুখার্জী, কালাধন মুখার্জী। এছাড়া ঢাকা ও ময়মনসিংহের হেমাঙ্গ বোস, ভোলা ঘোষ, ভোলা দত্ত, শৈলেশ বোস, নরেশ বোস প্রভৃতি বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণ তৎকালীন যুগের বাংলার ক্রিকেটকে মর্যাদা সম্পন্ন করে-ছিলেন।

তখন কলকাতায় ইডেন ও বালিগঞ্জের মাঠ ছাড়া মার্কাস স্কোয়ার, টালাপার্ক, নাটোরের রাজার মাঠ, আলিপুরে কুচবিহারের মহারাজার উডল্যাণ্ডের মাঠ ছিল ক্রিকেট খেলার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মাঠ।

ঐ সময় বেঙ্গল স্কুলের পক্ষে হয়ে খেলা আজকের রঞ্জি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে অংশগ্রহণেরই সমান ছিল। উপরোক্ত খেলোয়াড়রা সকলেই বেঙ্গল স্কুলে খেলেছেন। বেঙ্গল স্কুলের সংগে অবশ্য বিদ্যালয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ১৯৬১-৬২ সালে রঞ্জিত সিংজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি প্রতিযোগিতার প্রচলন করে। প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বর্তমানে খুব বেশী। নক-আউট ভিত্তিতে খেলার এই প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে বিজয়ী হয় পশ্চিমাঞ্চল দল। ভারতের চারটি অঞ্চলের দলের মধ্যেই এই দলীপ ট্রফির খেলা সীমাবদ্ধ।

দলীপ ট্রফি

সি, কে, নাইডু ঃ—প্রথমেই বলতে হবে সি, কে, নাইডুর কথা, যদিও তাঁর সম্পর্কে পূর্বে খানিকটা বলা হয়েছে। অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন এই খেলোয়াড় ক্রিকেট ব্যাটিং এর সবরকম মারেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শুধুমাত্র কবজীর মোচড়ে তিনি অনায়াসে বলকে মাঠের বাহিরে পাঠিয়ে

ছক্কা মারতে পারতেন। এমন কি, অত্যন্ত দ্রুত বোলারকেও ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রায়ই ছক্কা মারতেন। এ ছাড়া একটি অত্যন্ত দুরূহ মার তিনি হামেসাই মারতেন। অফ্ স্টাম্পের বাইরে পড়া গুডলেন্থের লেগ স্পিন বলকে চক্ষের নিমেষে মিড উইকেটে বাউণ্ডারী বা ওভার বাউণ্ডারী মারতেন। ৬২ বছর বয়সেও রঞ্জি ট্রফিতে খেলে তিনি সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৮৫ ও ৫২ রান করেছিলেন এবং ভিনু মানকড়কে অবলীলাক্রমে ছক্কাও মেরেছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের কয়েকজন দিকপালের খেলার বৈশিষ্ট্য

বিজয় মার্চেন্ট :— ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে কে ব্যাটিং-এ সম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই একবাক্যে যাঁর নাম করে থাকেন তিনি বিজয় মার্চেণ্ট। ১৯৪৬ সালে ভারতীয়দলের ইংলণ্ড সফরে তাঁর ব্যাটিং দেখে তথাকার বিদগ্ধ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে, যে কোনও দেশে ক্রিকেট ব্যাটিং নিখুঁত ভাবে শেখাবার জন্যে বিজয় মার্চেন্টের ব্যাটিং এর ফিল্ম তুলে সেটা দেখালে শিক্ষার্থীরা খাঁটি ব্যাটিং পদ্ধতি দেখার ও শেখার সুযোগ পাবে। তাঁর সবচেয়ে সুন্দর মার ছিল লেট কাট। দুর্ভাগ্যবশত, দৃষ্টিনন্দন, দুরূহ এই মারটি আজকাল টেস্ট খেলায় অনুপস্থিত বললেই চলে। অথচ, মার্চেন্ট দলের গোড়াপত্তন করতে এসে প্রায়ই অফ্ স্টাম্পের বাইরে চলে যাওয়া বল লেট কাট করে স্লিপে দাঁড়ানো ফিল্ডারদের মাঝখান দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে রান করতেন। ১৯৪৬ সালে ইংলন্ডের সফর শেষে তথাকার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটবিদদের মুখ থেকে নিসৃত হলো এই কথা—বর্তমান ক্রিকেটে বিজয় মার্চেণ্টই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান।

বিজয় মার্চেন্টের অবসর কালে প্রথম শ্রেণী হিসাবে বিবেচিত ক্রিকেট ম্যাচে তাঁর রানের গড় ছিল বিশ্বের দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে ছিল ব্রাডম্যানের গড়। রণ্জি ট্রফিতে তাঁর রানের গড় ৯৮·৩৫ কেউ ভাঙতে পারেনি।

লালা অমর নাথ :— লালা অমরনাথ ভারতীয় ক্রিকেটের এক অবিস্মরণীয় নাম। কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি অধিনায়কত্ব—সর্বত্রই ছিলেন সমান চলমান। ব্যাটিংএ আক্রমণই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য এবং তার জন্যে যদিও সবরকম মারেই ছিলেন তিনি সাবলীল। তবে ব্যাকফুট ড্রাইভে তিনি অন্যান্য সমসাময়িক খেলোয়াড়দের অনায়াসেই ছাপিয়ে যেতেন।

অমরনাথ বোলিংএও অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ইন সুইং ও লেগ কাটার মিশ্রিত বলে ব্যাটসম্যানদের প্রায়ই দিশেহারা করতেন। নিখুঁত

লেন্থে বল ফেলে ব্যাটসম্যানকে শান্ত করে রাখতেও তাঁর জুড়ি ছিল না।

মুস্তাক আলি ঃ—মুস্তাক আলি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। এর জন্য তিনি প্রায়ই কেতাবী মারের বদলে নিজস্ব প্রতিভাজাত অত্যন্ত দুরূহ মার অনায়াস ও সহজ ভঙ্গিতে মারতেন। দর্শককুল তখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতো। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হ্যাসেট তাঁর ব্যাটিং এর ধরন দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, মুস্তাক আলি হলেন একজন অকেতাবী অথচ প্রথম শ্রেণীর জাত ব্যাটস্‌ম্যান। দ্রুতগামী বলে ছক্কা মারা বা অফ্ স্টাম্পের বাইরে গমনোদ্যত বলকে স্কোয়ার লেগ দিয়ে বাউন্ডারীতে পাঠানো তাঁর কাছে মোটেই শক্ত কাজ ছিল না। লেগ গ্লান্সে একমাত্র রঞ্জিই ছিলেন তাঁর চেয়ে পারদর্শী। তাঁর জনপ্রিয়তার মান এমনি উচ্চে উঠেছিল যে, একবার কলকাতায় কোন একটি বিদেশী-দলের বিরুদ্ধে তাঁকে দলভুক্ত না করায় স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা "নো মুস্তাক নো টেস্ট" ব্যানারে এই কথা লিখে শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনার দ্বিতীয় নজীর নেই।

বিজয় হাজারে ঃ—স্বয়ং ডন ব্রাডম্যান বিজয় হাজারেকে বিশ্বের অন্যতম "গ্রেট" ব্যাটসম্যান বলে অভিহিত করেছেন। সম্ভবত, তাঁর নিজস্ব সব রেকর্ডকেই ম্লান করে দিয়েছে ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেড মাঠে বিশ্বের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ওপেনিং বোলার লিন্‌ডওয়াল ও মিলার সমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে দুই ইনিংসের খেলায় তাঁর দুটি শতরান। আর একবার স্থানীয় পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় হিন্দুদলের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট দলের পক্ষে হয়ে খেলে দলের মোট ৩৮৭ রানের মধ্যে তাঁর নিজস্ব রানের সংখ্যা ছিল ৩০৯, অসাধারণ ধৈর্যশীল ও নিখুঁত ব্যাটিং পদ্ধতি সম্পন্ন বিজয় হাজারে সব রকম ড্রাইভের মারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তার মধ্যে অবশ্য অন ড্রাইভে তিনি ছিলেন অনন্য।

আজ পর্যন্ত যে সমস্ত খেলোয়াড় ভারতীয়দলে খেলেছেন তার মধ্যে ভিনু মানকড়কেই শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার হিসাবে গণ্য করা হয়। বাঁ হাতি স্পিন বোলার মানকড় তাঁর স্পিন ও ফ্লাইটের তারতম্য ঘটিয়ে ব্যাটস্-

ভিনু মানকড়

ম্যানদের প্রায়ই বিপর্যস্ত করে তুলতেন। তাঁর আর একটি গুণ ছিল নিজের বোলিং এ অসাধারণ ফিল্ডিং করা। মাঠের অনেকখানি জায়গা জুড়ে তিনি নিজের বোলিং এ বল আটকিয়ে ব্যাটসম্যানের রান বন্ধ করে দিতেন। বিজয় হাজারের যেমন অস্ট্রেলিয়ার

এডিলেড টেস্ট ভিনু মানকড়ের তেমনি ১৯৫২ সালের লর্ডস টেস্ট চির-স্মরণীয়। দুই ইনিংসে তিনি ৭২ ও ১৮৪ রান করে এবং প্রথম ইনিংসে ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন ৭৩ ওভার বোলিং করে। ইংলণ্ডের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় মানকড়কে প্রশংসা করেছিলেন। আর্থার গিলিগান বললেন, "মানকড়ের স্মরণীয় কীর্তিতে ক্রিকেট খেলাটাই সমৃদ্ধ হলো।"

ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সি, বি, ফ্রাই মন্তব্য করেছিলেন যে, মহম্মদ নিসারের প্রথম কয়েক ওভারের বোলিং এর গতি পৃথিবীর যে কোনও দ্রুত বোলারের চেয়ে বেশি। ফ্রাই-এর মন্তব্যেই প্রতিফলিত হয়েছে নিসারের বোলিং এর ভয়ঙ্করতা এবং এর থেকে আরও বোঝা যায় কেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জীবনের সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় তাঁর মারাত্মক বোলিং এর স্বীকার হয়েছিলেন ইংলণ্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান সাটক্লিফ্ ও হোমস্ এবং এমস, রবিন্স ও ব্রাউন এবং কেন মাত্র ১৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। দ্রুতগতিতে ইন্‌সুইং বোলিং ছিল নিসারের বোলিং এর প্রধান অস্ত্র। অবশ্য, ইনসুইং এবং আউট সুইং বোলিং-এর সমন্বয়ই ছিল তাঁর বোলিং এর কাঠামো। অদ্যাবধি নিসারের চেয়ে গতি সম্পন্ন বোলার ভারতে দেখা যায়নি।

মহম্মদ নিসার

অমরসিং ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি অমর নাম। তাঁর চেয়ে নিপুণ সুইং বোলার সম্ভবত আর কোনও ভারতীয় বোলারই নন। তিনি প্রয়োজন মতো অফ ব্রেক বলও করতেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলারের স্বীকৃতি তিনি লাভ করেছেন বিদেশী সমালোচকদের কাছ থেকে।

অমর সিং

সুনীল গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম। টেস্ট খেলায় ৩০টি সেঞ্চুরি করে তিনি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন আবার টেস্ট খেলায় আজও পর্যন্ত সর্বাধিক রানেরও অধিকারী তিনি। তাঁর ব্যাটিং এর সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিবিড় মনঃসংযোগ ও অটুট ধৈর্য। সেখানে উচ্ছলতা নেই, সংযম আর নিজের চওড়া কাঁধে টিমকে একা বহন করে নিয়ে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। সেই সঙ্গে আছে কেতাবী খেলার নিখুঁত প্রদর্শনী। গাভাসকারের ব্যাট থেকে সব রকম স্ট্রোকই ঝলসে ওঠে, তবে সময় মত। স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যান গাভাসকারকে ক্রিকেট খেলার অলঙ্কার আখ্যা দিয়েছেন।

সুনীল গাভাসকার

যে কজন খেলোয়াড়দের খেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো এছাড়াও আরো অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে রচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েক জনের নাম বাদ দিতে পারছি না।

ভারতের সর্বকালের দুইজন শ্রেষ্ঠ ডানহাতি অফস্পিনার ও লেগ স্পিনার হলেন যথাক্রমে প্রসন্ন ও সুভাষ গুপ্ত। প্রসন্নর ফ্লাইট ও টপস্পিন এবং সুভাষের লুকানো গুগলি ব্যাটসম্যানদের বিমূঢ় করতে অদ্বিতীয় ছিল। গুগলি বোলার হিসাবে চন্দ্রশেখরের নামও সমান উল্লেখযোগ্য। আর দ্রুতগতির বোলার কপিলদেব সবচেয়ে বেশি সফল। বর্তমানে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে তিনি চিহ্নিত।

অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত দলটিই ভারতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠদল। অবশ্য এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য অসম্ভব নয়। ব্যাটিং এর ক্রম অনুসারে নামগুলি সাজানো হলো ঃ—

১। বিজয় মার্চেণ্ট ২। সুনীল গাভাসকার ৩। সি, কে, নাইডু (অধিনায়ক) ৪। বিজয় হাজারে ৫। বিশ্বনাথ ৬। ভিনু মানকড় ৭। কপিলদেব ৮। ইঞ্জিনিয়র ৯। অমর সিং ১০। সুভাষ গুপ্ত ১১। মহম্মদ নিসার।

১৯৬১ সালের ২৭ শে আগস্টের রবিবারের স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ভারতে প্রথম সংগঠনমূলক ফুটবল খেলে ইংরেজ সৈন্যদল ১৮৮০ সালে। ভারতে ফুটবলের একেবারে আদি যুগে

ভারতীয় ফুটবলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার পেতেন। ইংরেজ শাসিত ভারতে সেটাই ছিল ইংরেজ কর্তৃক নির্দিষ্ট বিধান। সেই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুরাণ্ড কাপেও ভারতীয় কোনও দলের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৮৮ সালে এশিয়ার প্রাচীনতম ও বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুরাণ্ড কাপের খেলা সুরু হয়। প্রসঙ্গত, বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল প্রতিযোগিতা হলো ইংলণ্ডের এফ, এ কাপ। ভারত সরকারের তদানীন্তন বৈদেশিক সেক্রেটারি স্যার মর্টিমার ডুরাণ্ডের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই ডুরাণ্ড কাপের খেলা সুরু হয়। প্রতিযোগিতাটি প্রথমে সিমলাতেই অনুষ্ঠিত হতো। অবশ্য পরবর্তীকালে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী দলের নাম ছিল রয়্যাল

স্কটস্ ফাসিলিয়র। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে প্রথম বার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়। আরউইন এ্যাম্ফিথিয়েটার মাঠে, এখন যেখানে দিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়াম সেই মাঠে শক্তিশালী ব্রিটিশ ফুটবল দল রয়্যাল ওয়ারউইকশায়ার রেজিমেণ্ট দলকে ৩-১ গোলে ফাইনালে পরাজিত করে মহমেডান স্পোর্টিং।

এরপর বিশ্বযুদ্ধের গোলমালের জন্য ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপের খেলা বন্ধ থাকার পর আবার নিয়মিতভাবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বর্তমানের প্রথানুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইংরেজ সৈন্যদের উৎসাহে এদেশে ফুটবল খেলা প্রচলিত হওয়ার অল্প-কালের মধ্যে ভারতীয়রা ফুটবলের স্বাদ লাভ করে এবং ফুটবল খেলার কয়েকটি দলও গঠিত হলো। সম্ভবত কলকাতার শোভাবাজার ক্লাব, মোহন বাগান, ন্যাশনাল ক্লাব, এরিয়ান, কুমারটুলি, কেনাল ক্লাব, হেয়ার স্পোর্টিং, জোড়াবাগান, হাওড়া স্পোর্টিং, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ইত্যাদি ক্লাবগুলিই প্রথম বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ফুটবল ক্লাব।

কলকাতার কিছু শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় কয়েকটি ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতি-ষ্ঠানের চাঁদা ও দানের সহায়তায় ১৮৮৯ সালে প্রচলিত করলেন ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা। অবশ্য, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এটা তবে বাঙ্গালী ক্লাব শোভাবাজারের দাবীকে তারা অস্বীকার করতে পারেনি কেননা এই ক্লাবটি স্থানীয় কিছু খেলায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, শোভাবাজার ক্লাব ট্রেডস কাপের প্রথম খেলাতেই ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। অবশ্য, এর দুই তিন বছরের মধ্যেই এই ট্রেডস কাপেই এক ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত করে তারা শহরে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সময় ফুটবল খেলায় বাঙ্গালীদের মধ্যে রীতিমত উৎসাহ দেখা যায়। দলে দলে বাঙ্গালী ছেলে ফুটবল নিয়ে মেতে ওঠে।

১৮৯২ সালে ট্রেডস ক্লাবের উদ্যোক্তারাই আরও বৃহৎ প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও সংগঠন কার্য উন্নত করার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার নামকরণ হয় ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়শন বা আই, এফ, এ। ট্রেডস কাপের নাম বদল করে তার নাম রাখা হয় আই, এফ, এ শীল্ড ১৮৯৩ সালে এবং তাতে একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ দল হিসাবে শোভাবাজার ক্লাবকে খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়। বস্তুত এটাই ভারতের প্রথম "ওপেন"

ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রথম বছরের আই, এফ, এ শীল্ডের খেলায় বিজয়ী হয় রয়্যাল আইরিশ দল এবং তারপর ১৯১১ সালে মোহনবাগানই সর্বপ্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ফাইনালে শক্তিশালী ইস্টইয়র্ক দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী হয়। খেলাটির তারিখ ছিল ২৯ শে জুলাই। মোহনবাগান দলে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের নাম হলো—হীরালাল মুখার্জি; ভূতি সুকুল ও সুধীর চ্যাটার্জি; মনমোহন মুখার্জি, রাজেন সেনগুপ্ত ও নীলমাধব ভট্টাচার্য; কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাস ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী।

মোহনবাগানের এই জয়লাভ দেশের জনসাধারণের মধ্যে এমনি আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যে, তারা এই জয়কে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের জয় মনে করেছিল। যুদ্ধজয়ী বীর সেনাদলের সম্মানের আসনে বসানো হয়েছিল মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের। প্রকৃতপক্ষে, এই জয়লাভ ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। প্রবল এক আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে যার ফলে আরও অধিক খেলোয়াড় ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করা সুরু করে এবং আরও নতুন কয়েকটি ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় ভারতীয় ফুটবল বলতে বাঙ্গলার ফুটবলকেই বোঝাতো কারণ এটাই ছিল তখন ভারতে ফুটবলের একমাত্র কেন্দ্র। এটা সম্ভবত কারো অজানা নয় যে, তখন ভারতীয়রা খেলতো খালি পায়ে আর গোরারা বুট পায়ে। বুট পরে ফুটবল খেলা তখনও ভারতীয়রা শেখেনি। সুতরাং খালি পায়ে একটি শক্তিশালী বিদেশীদলকে আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইনালে পরাস্ত করা নিঃসন্দেহে অপরিসীম ক্রীড়ানৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। মোহনবাগান ক্লাব ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৯ সালে প্রথম আই, এফ, এ শীল্ডে যোগদান করার অনুমতি লাভ করে।

১৮৯৮ সালে কলকাতা ফুটবল লীগের প্রবর্তন হয়। প্রথম বছরের লীগ বিজয়ী দলের নাম হল গ্লসেস্টার্স। আই, এফ, এ-র হাতেই প্রতিযোগিতার ভার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কোনও ভারতীয় দলই তখন স্থান পায়নি লীগের খেলায়। সুদূর ইংলণ্ড থেকে আগত সৈন্যদের মনোরঞ্জন, স্বাস্থ্য চর্চা এবং অবসর যাপনের উদ্দেশ্যেই আসলে এই লীগ খেলার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম একটানা ১৬ বছর লীগ খেলায় শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই ছিল অংশগ্রহণকারীর দল!

১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগানকে লীগে

স্থান দেওয়া হলো এবং তার পরের বছর এরিয়ানকে। মোহনবাগান প্রথম বারেই ৪র্থ স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। তখন ডবল লীগ খেলার প্রথা ছিল, অর্থাৎ প্রতিদলের সঙ্গে প্রতিদলের দু'বার করে খেলা হতো।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত প্রথম বিভাগের—মোহনবাগান ও এরিয়ান এই দুটি মাত্র ভারতীয় দলই ছিল। ঈস্টবেঙ্গলের আবির্ভাব হলো ১৯২৫ সালে এবং তারাও মোহনবাগানের মত প্রথম ৪র্থ স্থান দখল করেছিল। সেই বছরই মোহনবাগান প্রথম রানার্স আপ হয়, আর ইস্টবেঙ্গল ১৯৩২ সালে। ভারতীয় পুরানো দলগুলির মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯২৯ সালে প্রথম বিভাগে খেলা সুরু করে।

এরপর ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে এসেই ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এক রেকর্ড স্থাপন করে। শুধু যে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগ বিজয়ী হলো তাই নয়, উপর্যুপরি পাঁচ বছর সেই বিজয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখলো। মোহনবাগানের ১৯১১ সালে শীল্ডজয়ের পরে ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এটাই বৃহত্তম ঘটনা। প্রায় সমগ্র ভারত থেকে সংগৃহীত বাছাই করা মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই অসাধারণ শক্তিশালী দলটি। এর ঠিক দুবছর পরে ১৯৩৬ সালে মহমেডান আর একটি রেকর্ড স্থাপন করে। ঐ বছর একত্রে লীগ ও আই, এফ, এ শীল্ড জয়ী হয়। সুদীর্ঘ ২৫ বছর বাদে আবার একটি ভারতীয়দল শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করলো।

পরবর্তী কালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল প্রথম লীগ জয়ী হয় যথাক্রমে ১৯৩৯ ও ১৯৪২ সালে। আর, এরিয়ান ক্লাব ১৯৪০ সালে ৪-১ গোলে মোহনবাগানকে ফাইনালে হারিয়ে আই, এফ, এ শীল্ড লাভ করে। এই সবক'টি জয়লাভই ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত।

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় খেলা

১৯২০ সালের ৩রা জুলাই। এই তারিখেই ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দলের ফুটবল খেলার সূচনা হয়। প্রাক স্বাধীনতার যুগে এদেশে অনেক ইংরেজের বাস ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ভালো খেলোয়াড়ের সংখ্যাও ছিল অনেক। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলা ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পূর্ণ। শুধু তাই নয়, এটা কোনও প্রতিযোগিতামূলক খেলা না হলেও

উভয় দলের খেলোয়াড়রাই এই খেলায় তাঁদের চরম কৃতিত্ব নৈপুণ্যে দেখাবার চেষ্টা করতেন। এই খেলায় ভারতীয় দলে যাঁরা স্থান পেতেন তাঁরাই দেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হতেন। বস্তুত, এটাই ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ খেলা। প্রায় একটানা চল্লিশ বছরের অধিক এই খেলায় ভারতীয় দলের জয়ের সংখ্যা ১৫ এবং ইউরোপীয়দের ৯। প্রথম বছরের খেলায় ইউরোপীয় দল ৪-১ গোলে জয়লাভ করেছিল। এই প্রথম বছরের খেলায় ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন গোল—টি, গুপ্ত (মোহনবাগান), ব্যাক—গোষ্ঠ পাল (মোহনবাগান) ও বলাই চ্যাটার্জী (এরিয়ান), হাফ ব্যাক—রায় (মোহনবাগান), এ, ঘোষ (মোহনবাগান) ও এম, দাশ (মোহনবাগান), ফরোয়ার্ড—সামাদ (তাজহাট), আর, সেন (মোহনবাগান), রহমান (এরিয়ান), উমাপতি কুমার (মোহনবাগান) ও গুহ (এরিয়ান)।

১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দুটি দল ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর এবং জাভা সফরে গিয়েছিল। এছাড়া, আই, এফ, এ র সম্মিলিত দল ১৯৩৩ সালে শ্রীলংকা এবং ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছিল। তারমধ্যে ১৯২৬ এর অধিনায়ক ছিলেন সামাদ, ১৯৩৩ এ গোষ্ঠ পাল, ১৯৩৪ এ সম্মথ দত্ত এবং ১৯৩৮ এ করুণা ভট্টাচার্য।

ভারতীয় দলের সফর

১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে মোহনবাগানই ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দল এবং তৎকালীন ফুটবল খেলার মান যে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের ছিল কিছু কিছু বিদেশী ফুটবলবিদ্দের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের এসেক্সের একজন ক্রীড়াবিদের মতে এই সময় মোহনবাগানের অসাধারণ তীব্র গতিসম্পন্ন সুবিন্যস্ত আক্রমণধারা অতি উচ্চ মানে উন্নীত ছিল এবং ইংলন্ড এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশে গেলে নিশ্চয়ই তাদের জয়জয়কারে মুখরিত হতো বিদেশী সংবাদপত্রগুলি। শুধু তাই নয়, শিবদাস ভাদুড়ী, উমাপতি কুমার, গোষ্ঠ পাল, সামাদ প্রভৃতি খেলোয়াড়কে এদেশে উপস্থিত বিদেশী ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা পশ্চিম জগতের দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত মনে করতেন। ফুটবল খেলা হলো বুটপায়ে দিয়ে খেলার জন্য অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিনা বুটে খালি পায়ে খেলেও গোরাদের সঙ্গে দাপটের সঙ্গে খেলে গেছেন, এটা নিঃসন্দেহে

ভারতীয় ক্রীড়াধারার বিবর্তন

অসাধারণ দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। তবে বৃষ্টি ভেজা মাঠে যে কোনও বিনা বুটের খেলোয়াড়ের পক্ষে বুটধারীর বিরুদ্ধে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে কেন না, খালি পায়ে পিছল মাঠে নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য সুরু হলো বৃষ্টিভেজা মাঠে বুটের ব্যবহার, তবে শুকনো মাঠে চললো ঐ বিনাবুটের খেলা। এই ব্যবস্থাই চললো অনেক বছর ধরে। এইভাবে ভারতের ফুটবল গড়ে ওঠায় তৈরি হয়েছিল এক নিজস্ব ধারার খেলা যা ছিল একান্তভাবেই ভারতীয়। আরও সঠিক ভাবে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয় যে, ইংলণ্ডের ক্রীড়াধারার ভিত্তিতে প্রস্তুত ভারতীয় কারুকলা।

কলকাতাই ভারতীয় ফুটবলের জন্মভূমি এবং এখানকার খেলাই বহু বৎসর পর্যন্ত ছিল ভারতীয় ফুটবলের দর্পণ। এই দর্পণে প্রথম পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা গেল ১৯৩১-৩২ সালের কালিঘাট ক্লাবের খেলায়। দক্ষিণ কলকাতার এই ক্লাবটি দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু খেলোয়াড় আমদানি করলো। তাদের নাম আপ্পা রাও, বাবু, জোসেফ, রামালু, কাইজার, জন, অখিল আহ্মেদ। দক্ষিণ ভারতের খেলোয়াড়দের খেলায় কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। বলকে অপ্রয়োজনে উঁচুতে না তুলে মাটিতে রেখে খেলার প্রবণতা ছিল এদের। স্কোয়ার ভাবে অল্প দূরত্বের পাসিং; খালি পায়ের চেটোর আশ্চর্য সাবলীল ব্যবহার দ্বারা ড্রিবলিং এর খেলা তারা দেখালো অপূর্ব দক্ষতায়। এই দর্পণে দ্বিতীয়বার নতুন ছায়া ফেললো মহমেডান স্পোর্টিং। সত্যি কথা বলতে গেলে, মহমেডান স্পোর্টিংই সর্বপ্রথম দেশে আধুনিক ফুটবলের বীজ বপন করলো তাদের ক্রীড়াধারার মাধ্যমে। একমাত্র নূর মহম্মদ ছাড়া রক্ষণভাগের বাকি সকলেই ছিলেন বুট পরিহিত। তাঁদের প্রায় সকলেই প্রচণ্ড শারীরিক শক্তিসম্পন্ন বড়ো মাপের দেহের অধিকারী ছিলেন এবং যে কোনও সাহেব খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁরা কঠোর ট্যাক্লিং এ তাদের সমকক্ষ ছিলেন। নিয়মিত অনুশীলন ছিল মহমেডান স্পোর্টিং-এর অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া খেলোয়াড়দের একত্রে রেখে উপযুক্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন তাঁদের ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও ভারতীয় ক্রীড়াধারায় আর এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। দেখা গেল ভেঙ্কটেশ ও সালে যথাক্রমে

রাইট ও লেফট আউটের খেলোয়াড় বল নিয়ে এতদিনকার চিরাচরিত ধারানুযায়ী লাইন ধরে ফ্ল্যাগ পোস্ট পর্যন্ত সোজা ছুটে গিয়ে উঁচু করে সেন্টার করার বদলে, সুযোগ পেলেই বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে নিজেরাই গোল দিচ্ছে।

এমনি ভাবে কালিঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের ক্রীড়াধারা কিছু পরিবর্তিত হলো।

তারপর ১৯৫৮ সালে সরকারিভাবে ভারতের ফুটবল জগৎ থেকে বুটবিহীন খেলা নির্বাসিত হলো। সেই সঙ্গে সুরু হলো ভারতীয় ফুটবলের এক নতুন অধ্যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে খালি পায়ে খেলে আর অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়, এই বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েই বুটপরে খেলাকে আর ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক করা হলো। প্রথম অবস্থায় স্বভাবতই অনভ্যস্ততার দরুণ নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলো। বলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং রাখতে রীতিমতও সুটিং-এ অশেষ বিপাকে পড়তে হলো খেলোয়াড়দের। এছাড়া ডিব্রলিং এর জন্য খালি পায়ের তলার ব্যবহারেও আর সে সফলতা দেখা গেল না। যেহেতু ইউরোপীয়দের মতো ভারতীয়রা দিনের সব সময়েই জুতো মোজা পরে থাকতে অভ্যস্ত নয়, সেই কারণে বুট তাদের কাছে বাস্তবিকই বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলনে সব কিছুই আয়ত্ব করা সম্ভব হয়। বর্তমানে অর্থাৎ ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে বুট বোঝা নয়, সাথী। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেহেরু গোল্ড কাপের খেলাতে ভারতীয় দল বিদেশাগত দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, উরুগয়ে, ইতালি, যুগোশ্লেভিয়া দলের বিরুদ্ধে লীগপ্রথার খেলায় সব কয়টি খেলাতে যথেষ্ট উন্নত মানের ক্রীড়া প্রদর্শন করেছে। অবশ্য শারীর সক্ষমতায় ও শক্তিতে ঘাটতি ছিল ওদের তুলনায়।

এখানে প্রসঙ্গত বলা দরকার ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘকাল কোনও সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না তবে একেবারে প্রথম যুগে দুখীরাম মজুমদার এরিয়ান ক্লাবে খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলা শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা ছিল অসামান্য। ময়দানে তিনি প্রায়ই ঘুরতেন সাইকেল চড়ে এ মাঠ থেকে ও মাঠে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে খেলোয়াড়দের ভুল চুক লক্ষ্য করতেন, তারপর হাফ-টাইমে অথবা খেলার শেষে তাদের কাছে গিয়ে বোঝাতেন ভুল ত্রুটি। দুখীরাম মজুমদার সব বাঙ্গালী খেলোয়াড়কেই বার বার বলতেন, বুট পরে খেল,

ফুটবল খেলায় বুট অপরিহার্য। তিনি আরও বলতেন, আউট সাইড ডজিং-এ দক্ষ না হলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যায় না। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত খেলোয়াড় ছোনে মজুমদারকে তিনি প্রায় সর্বক্ষণ বুট পরিয়ে রাখতেন। ছোনে মজুমদার তখন কলকাতার মাঠে বুট পরে খেলে সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। দুখীরাম মজুমদার ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য ইংরেজি ভাষায় "হিন্টস টু দি ইয়ং ফুটবলার্স" নামে ফুটবল প্রশিক্ষণের উপর একটি বই লিখে ভারতীয় ভাষায় প্রথম যেটি ফুটবল প্রশিক্ষণের গ্রন্থকার হিসাবে চিহ্নিত।

ভারতীয় ফুটবলের আদি যুগ থেকেই ২-৩-৫ প্রথায় খেলা প্রচলিত ছিল। এই প্রথার অর্থ হলো, ব্যাক দুজন, হাফ ব্যাক তিনজন এবং ফরোয়ার্ড লাইনে পাঁচজন। গোলকিপার তো একজনের বেশি হয় না অতএব তার উল্লেখ প্রয়োজন হয় নি।

দীর্ঘকাল বাদে পঞ্চাশ দশকে প্রথমে ৩-২-৫ এবং পরে সুরু হয় ৪-২-৪ এবং ৪-৩-৩ পদ্ধতির খেলা।

ভারতীয় ফুটবল দল চারবার মূল অলিম্পিক খেলায় যোগদান করেছে—১৯৪৮ (লণ্ডন), ১৯৫২ (হেলসিংকি), ১৯৫৬ (মেলবোর্ন) এবং ১৯৬০ (রোম)। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে টি, আও, শৈলেন মান্না, এস, ব্যানার্জি ও প্রদীপ ব্যানার্জি। মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় দল চতুর্থ স্থান অধিকার করে ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডিসুজা এবং প্রশিক্ষক রহিম অশেষ প্রশংসায় ভূষিত হন। এই রহিমই সর্বপ্রথম প্রশিক্ষক যিনি ভারতীয় ফুটবলে আধুনিক ফুটবলের আমদানি করেন।

লণ্ডন অলিম্পিকে ভারত খালি পায়ে ফুটবল খেলার চমক দেখিয়েছিল। দলের মধ্যে তাজমহম্মদ ও পরব বাদে সবাই ছিলেন বুটবিহীন। একমাত্র হেলসিংকি ছাড়া কোনও অলিম্পিকেই ভারত খারাপ খেলেনি।

প্রসঙ্গত, একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয় যে, ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তীরা অর্থাৎ গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমার, বলাই চ্যাটার্জি, সামাদ, সূর্য চক্রবর্তী, ছোনে মজুমদাররা অথবা তার পরবর্তীকালে ত্রিশ দশকের মধ্য ভাগে মহমেডান স্পোর্টিং-এর জুম্মা খাঁ, মাসুম, হাফিজ রসিদ, নূর মহম্মদ, রহিম কিংবা ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশরা বা মোহন বাগানের করুণা ভট্টাচার্য, সতু চৌধুরী, মন্মথ দত্তরা যখন খেলায় অংশ

গ্রহণ করতেন তখন যদি ভারত অলিম্পিকে খেলতো তাহলে ফলাফল কিরকম হতো। ভারত যে হকিতে অতুলনীয়, অলিম্পিকে যোগদান না করলে সেটা তো অজ্ঞাতই থেকে যেতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তো পশ্চিম জগতে ফুটবল জগতের নবযুগ সৃষ্টি হলো যার সুরু ছিল ঐ যুদ্ধের অল্প কাল পূর্বে। এই নবযুগের পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন। প্রথা প্রকরণও অনেক পরিবর্তিত হলো। অথচ, পূর্বেকার পদ্ধতিতে খালি পায়ে খেলেও ভারতীয় দলগুলি যথেষ্ট উন্নত ক্রীড়ামান প্রদর্শন করেছে কলকাতায় ব্রিটিশ সামরিক দলগুলির বিরুদ্ধে। সুতরাং, ঐ যুগে ভারতীয় ফুটবল দল অলিম্পিকে যোগদান করলে হয়তো ভালো ফলই দেখাতো। বস্তুত, অংশগ্রহণ না করার ফলে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তৎকালীন ভারতীয় ফুটবলের যাচাইকরণ সম্ভব হয়নি। অথচ, ১৯৪৮ সালে যখন ভারতীয় দল অলিম্পিকে খেললো তখন বিশ্ব ফুটবলে সুরু হয়ে গেছে চরম শৈলির ক্রমবিকাশ। পূর্বোক্ত খেলোয়াড়দের কালটাকে অনেক ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগ আখ্যাও দিয়ে থাকেন। ঐ সময়কার খেলোয়াড় সামাদ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইংরেজ ক্রীড়াবিদের অভিমত ছিল যে, ইংলণ্ডে জন্মালে ইংলণ্ড দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় স্ট্যানলি ম্যাথুজ ও সামাদই ইংলণ্ড দলের যথাক্রমে রাইট আউট ও লেফট আউটে খেলতেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী ভারতীয় ফুটবলের কর্ণধার ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-জগতের সঙ্গে সুপরিচিত পঙ্কজ গুপ্ত ও মনীন্দ্র দত্ত রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সামাদ যদি চল্লিশ বছর পরে ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তিনি পেলে, পুসকাস, ইউসোবিও প্রভৃতির মতন ফুটবল জগতের বিশ্ব-তারকা হিসাবে চিহ্নিত হতেন। সামাদ ফুটবলের যাদুকর আখ্যা পেয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে দু ব্যাক প্রথার শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ব্যাক ছিলেন গোষ্ঠ পাল। "চীনের প্রাচীর" আখ্যাপ্রাপ্ত গোষ্ঠ পাল প্রায় ২৫ বছর ভারতীয় ফুটবলের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর সমকালীন সব খেলোয়াড়ের মতে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ পর্যায়ের খেলোয়াড়। ১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ড ফাইনালের রেফারি এইচ, জি, পুলার লিখেছেন যে, গোষ্ঠ পাল ইংলণ্ডে খেলার সুযোগ পেলে সেখানকার প্রথম ডিভিসনের এক উজ্জ্বল রত্ন হয়ে জ্বলতেন। আর, উমাপতি কুমারকে তিনি শিবদাস ভাদুড়ীর চেয়ে আরও পরিণত খেলোয়াড় বলে বিশ্বাস করতেন। আর পরবর্তী কালের হাফিজ রসিদকে সর্ববাদিসম্মতক্রমে ভারতের শ্রেষ্ঠ

স্ট্রাইকার বলা হয়। নিখুঁত হেডিং, দুপায়ে সমান মাপা সট, গোল অঞ্চলে ঢুকে সঠিক অচঞ্চলতা, ও ড্রিবলিং করার ক্ষমতা—সব কিছুর সমন্বয়ে এক অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন এই রসিদ। আবার ছোনে মজুমদার ছিলেন এমন এক খেলোয়াড় যিনি গোল বাদ দিয়ে বাকি দশটি স্থানেই প্রায় সমদক্ষ ছিলেন। সর্বদাই তিনি বুট সমেত খেলেছেন। মূলত, ব্যাকের খেলোয়াড় ছোনে মজুমদার সম্পর্কে গোষ্ঠ পাল লিখেছেন যে, ছোনে তাঁর চেয়েও বেশি ভাল খেলতো ব্যাকে।

এই জাতীয় খেলোয়াড়দের তালিকা বৃদ্ধি না করে আবার সেই প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করবো—এই কালের ভারতীয় দল কি সুযোগ পেলে পারতো না অলিম্পিকে ভারতের ফুটবলকে চিহ্নিত করতে? সফল হলে, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস লেখা হতো অন্য ভাবে।

বিভিন্ন সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতে বর্তমানে যে কয়টি বিশিষ্ট সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির নাম হলো—আই, এফ, এ শীল্ড, ডুরান্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ন্ট্যাফোর্ড কাপ, ফেডারেশন কাপ, দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি ও বরদলৈ ট্রফি। এছাড়া ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতার নাম হলো সন্তোষ ট্রফি। আই, এফ, এর ভূতপূর্ব সভাপতি সন্তোষের মহারাজার স্মৃতিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ বারই বাংলা দল বিজয়ী হয়েছে। আন্তঃরাজ্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের পারদর্শিতা যাচাই করেই সাধারণত ভারতের জাতীয় দল গঠিত হয়। এ ছাড়া সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার নাম স্যার আশুতোষ মুখার্জি ট্রফি।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাগুলি পরিচালনা করার দায়িত্বের জন্য আছে এ্যাসোসিয়শন অফ্ ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ্। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিবছর বিভিন্ন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ভারপ্রাপ্ত হন।

বিদ্যালয় পর্যায়ের সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম সুব্রত মুখার্জি কাপ। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতার খেলা হয়।

প্রথম ভারতীয় ফুটবল প্রশিক্ষকের নাম দুখীরাম মজুমদার। ভারতীয় ফুটবলের আদি যুগেই ইনি উপলব্ধি করেছিলেন ফুটবল খেলায় বুটের অপরিহার্যতা। ইনি আরও বলেছিলেন যে, যে খেলোয়াড় "আউট সাইড

ডজ" করতে সক্ষম সে ফুটবলের নিপুণতার একটা বড়ো অংশ আয়ত্ব করেছে, একথা মানতে হবে এবং সে খেলার মাঠে বিপক্ষ দলের ভীতির কারণ হবেই। এ সবই আধুনিক ফুটবলের কথা। সেই আদি যুগেই তিনি এই জাতীয় তত্ত্ব প্রচার করে নিজের অসামান্য ফুটবল-জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

ভারতীয় ফুটবল প্রশিক্ষক

পরবর্তীকালের প্রশিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বাঘা সোমের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ফুটবল দীর্ঘকালব্যাপী কোনও প্রশিক্ষকের সাহায্য পায়নি। এই সময় ভারতে ইংলণ্ডের কয়েকটি দল এবং গোরা সামরিক দলগুলির খেলা দেখেই বস্তুত ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিজেদের খেলার পদ্ধতি স্থির করতেন। বিপক্ষ কেমন খেলে, তাদের ত্রুটি কোথায়, কী উপায়ে এবং কোন কোন কৌশল অবলম্বন করে তাদের হারানো সম্ভব—এসব আলোচনা করার জন্য কোনও প্রশিক্ষক ছিলেন না। খেলোয়াড়রা নিজেদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্বল করে এসব আলোচনা মাঝে মাঝে করতেন।

বাঘা সোম ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকার খেলোয়াড়। সেখানে যখন ইংলণ্ডের ইশলিংটন কোরিন্থিয়ান দল খেলতে এসেছিল ১৯৩৭ সালে তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত এক বিখ্যাত খেলোয়াড় হিসাবে ঢাকাদলের ছেলেদের প্রশিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরে-ছিলেন যে, এই প্রচণ্ড শক্তিশালীদলের বিরুদ্ধে সফলতার একমাত্র চাবি-কাঠি হলো খেলোয়াড় দম বৃদ্ধি করানো। সেই অনুসারে তিনি প্রায় একমাস ঢাকার খেলোয়াড়দের নিয়মিত দৌড় ও শারীর পটুতার ব্যায়াম অভ্যাস করিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। ঐ বিদেশী-শক্তিশালী দলটি যারা সমগ্র ভারতে অপরাজেয় ছিল তারা ঢাকার কাছে পরাজিত হয়েছিল ১-০ গোলে। গোলদাতা ছিলেন ভূপেন সেন (পাখি) যিনি পরবর্তীকালে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ও রেলদলে খেলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাঘা সোম পরবর্তীকালে কলকাতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের সাহায্য অনেক খেলোয়াড় তৈরি করেছেন।

বাঘা সোমেরই সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত প্রশিক্ষক ছিলেন বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়। মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় বলাই চ্যাটার্জি সর্বভারতীয় দলেরও প্রশিক্ষক ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, এঁরা দুজনেই

ছিলেন কলকাতার ফুটবল মাঠের প্রকৃত প্রশিক্ষক। দুখীরাম মজুমদারের পরে দীর্ঘকাল বাদে এঁদের আবির্ভাব। ফুটবল-নিবেদিন প্রাণ এই দুই মহান প্রশিক্ষকের কাছে ভারতীয় ফুটবল চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে প্রশিক্ষণের জন্য বাঘা সোম ও বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয়। বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণের সর্বপ্রধান বস্তু ছিল শারীরিক সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি। শারীর পটুতার নানারকম ব্যায়াম সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বলাইবাবু খেলোয়াড়দের নিয়মিতভাবে ফিজিকাল ফিটনেসের বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলন করাতেন। তিনি নিজে শুধু অসামান্য ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন না, এ্যাথলেটিকস্ ও বক্সিং-এ সারা ভারতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিশেষত, এ্যাথলেটিকসের প্রায় সবগুলি ইভেণ্টেই তিনি সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। এছাড়া, হকি, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, সাঁতার প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ক্রীড়াবিদ্যার প্রায় সব কয়টি বিভাগে এই ধরণের পারদর্শিতা অদ্যাপি অপর কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদের মধ্যে দেখা যায়নি। এই রকম অভিজ্ঞ এবং দক্ষ একজন ফুটবল প্রশিক্ষকের স্পর্শে কত ফুটবল খেলোয়াড় যে তৈরি ও উপকৃত হয়েছেন তার সীমা নেই।

ভারতীয় ফুটবল জগতে বিদেশী ক্রীড়া পন্থা সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন এঁদের পরবর্তীকালের সুপ্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক হায়দ্রাবাদের রহিম। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের আধুনিক ফুটবলের ক্রীড়াকৌশল ইনিই ভারতীয় ফুটবলে প্রথম আমদানি করেন। আধুনিক ফুটবল খেলা যে নিঃসন্দেহে প্রথাপ্রকরণ, নানা কৌশল ও পরিকল্পনা সমৃদ্ধ এবং প্রচণ্ড অনুশীলন-নির্ভর এক দলগত খেলা, এই বার্তা রহিম বিশেষ গুরুত্বসহকারে জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণও ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় অলিম্পিক দলের প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি বিদেশী ফুটবল বিশেষজ্ঞদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

রহিমের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সুদক্ষ প্রশিক্ষকদের মধ্যে কিটু, স্ববাজ ঘোষ, অরুণ সিংহ, নিখিল নন্দী, অমল দত্ত, মহম্মদ বাশা, অচ্যুৎ ব্যানার্জি, প্রদীপ ব্যানার্জি, অরুণ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অমল দত্ত ফুটবল প্রশিক্ষণ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৫০ সালে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমভাগে আমেরিকান মিশনারিরা ভারতে বাস্কেটবল প্রচলন করেন। তারপর মাদ্রাজের ওয়াই, এম, সি, এ-র প্রচেষ্টায় বাস্কেটবল খেলা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররাও ভারতে বাস্কেটবলের প্রসারতায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শনের পরিচালনায় প্রতি দুই বছর অন্তর সর্বভারতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশন

পৃথিবীর বাস্কেটবল খেলার মানচিত্রে যদিও ভারত এখনও পর্যন্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রাখতে পারেনি তথাপি ভারতের সর্বত্রই বিশেষত দক্ষিণ ভারতে বাস্কেটবলের প্রসার সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও বর্ধমানেই এই খেলা প্রায় সীমাবদ্ধ। খুশিরাম, হনুমন্ত সিং প্রভৃতি খেলোয়াড় ভারতীয় বাস্কেটবলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

পঞ্জাবের লুধিয়ানাতে ১৯৫১ সালে ভারতের ভলিবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্কেটবলের মত ভলিবল খেলাও বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমভাগে ভারতে প্রথম প্রচলিত হয় এবং এর পিছনেও ওয়াই, এম, সি, এ কলেজের দানই প্রায় ষোলো আনা। ১৯৫২ সাল থেকেই সুরু হয় ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতা। ভলিবল খেলা ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে খেলা হয়। ভারতের মতন দরিদ্র দেশে এই স্বল্প ব্যয়ের খেলাটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অবশ্য, সর্বত্রই খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ভলিবল খেলা হয় না, অর্থাৎ অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবেও খেলা হয়। তারও মূল্য অবশ্য কম নয়। খেলাধূলা মানেই তো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নয়। ভারতের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে, পুলিশ ব্যারাকে বা যে কোনও সামরিক ক্যাম্পে সাধারণত এই ধরণের মনোভাব নিয়েই ভলিবল খেলা হয়। এর ফলে, ভারতে খেলাধূলার জগতের এক বিশাল অংশ ভলিবল খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

ভারতের ভলিবল ফেডারেশন ও ভারতে ভলিবল খেলা

প্রতিযোগিতামূলক ভলিবল খেলাতেও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম নয়। ভারতের সব রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভলিবল খেলার রাজ্য-এ্যাসোসিয়শন এবং ভলিবলের নানান বিভাগের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা

করা হয়। পুরুষ, মহিলা, বালকদের জন্য পৃথক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালে মস্কোতে বিশ্বভলি প্রতিযোগিতায় ভারতের ভলিবল দল অংশগ্রহণ করে। লীগপ্রথায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত ৮ম স্থান অধিকার করে। এরপর ১৯৫৫ সালে জাপানে এশিয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারত বিজয়ীর সম্মান পেয়ে ভারতে ভলিবলের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্ম এই ভারতেরই বুকে। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে এই খেলা "পুনা" নামে প্রচলিত ছিল।

সর্বভারতীয় ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোসিয়শন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। তখন এর প্রধান অফিস ছিল কলকাতায়। ১৯৪৪ সালে চলে গেল বোম্বাইতে, তারপর অন্যান্য রাজ্যে। প্রথম কয়েক বছর সর্বভারতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হতো কলকাতায় ইলিয়ট রোডের ইও ইও ক্লাবে। প্রথম দু'বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে একক খেলায় বিজয়ী হন যথাক্রমে ম্যাডগাভকার ও তারা ব্যানার্জি। অবশ্য, এই দুবছর সব প্রতিযোগীই ছিলেন কলকাতার। তারপর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে পঞ্জাব এবং এসেই ভিনি ভিডি ভিসি। তবে মহিলাদের খেলায় বাংলার প্রতিনিধি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে পার্ল গস্, ইজ্‌ডন এবং অপর কয়েকজন বিজয়ীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখলেন।

সর্বভারতীয় ব্যাডিমিন্টন এ্যাসোসিয়শন ও ভারতে ব্যাডমিন্টন খেলা

এই সময় ভারতে ব্যাডমিণ্টন খেলার দ্রুত প্রসার হয় এবং প্রায় প্রতি শহরেই পাড়ায় পাড়ায় সান্ধ্য ব্যাডমিন্টনের আসর বসতে দেখা গেল। তারপর গঠিত হলো বিভিন্ন রাজ্য ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোসিয়শন এবং তার সঙ্গে নানা প্রতিযোগিতা। এই সব প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সাক্ষাৎ মিললো মনোজ গুহ, সুনীল বসু, গজানন হেমাডি, তারা ব্যানার্জি, ম্যাডগাফ্‌কার, কেশব দত্ত, টি, এন শেঠ, দাবিন্দার মোহন, নন্দু নাটেকর এবং পরবর্তী কালের দীপু ঘোষ, রমেন ঘোষ, সুরেশ গোয়েলের মতন গুণী খেলোয়াড়দের। পুরুষদের আন্তর্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারত অনেকবার যোগদান করেছে এবং সেখানে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে। মহিলাদের বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার নাম উবের কাপের খেলা। ভারতীয় মহিলা দল সেখানে অংশগ্রহণ করে।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে বিশ্বের মানচিত্রে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন প্রকাশ পাড়ুকন। তিনি বিশ্বজয়ী আখ্যা অর্জন করে খেলাধুলার জগতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের প্রথম সারিতে উন্নীত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ব্যাডমিন্টন খেলাতে ভারত আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ না করলেও মীনা শাহ, আমি ঘিয়া, মধুমিতা গোস্বামী প্রভৃতি খেলোয়াড় ভারতে মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত। মীনা শাহ ১৯৬২ সালে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং মধুমিতা গোস্বামী প্রথম বাঙ্গালী মহিলা যিনি সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, শাটলককের মূল্যের ক্রমউর্দ্ধগতির সঙ্গে ভারতে ব্যাডমিন্টন খেলার প্রসার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে।

ভারতের টেনিস খেলা

ইংলণ্ডে ১৮৭৭ সালে টেনিস খেলা জনপ্রিয় হবার পর থেকেই ইংরেজরা ভারতে প্রচলন করলেন টেনিস খেলা। ইংরেজরা ভালোবাসে প্রায় সব রকম খেলাধুলাই। যেহেতু ভারত ছিল তাদের পরাধীন এবং ভারতে অনেক ইংরেজ বসবাস করতো তাই নিজেদের টেনিস চর্চার জন্যই মূলত এদেশে তারা প্রচলন করলো এই খেলা। ১৮৮৫ সালের পঞ্জাব টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপই ভারতের প্রথম টেনিস প্রতিযোগিতা। তারপর সুরু হয় বেঙ্গল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ১৮৮৭ তে, দক্ষিণ ভারত এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন টেনিস প্রতিযোগিতা ১৯০৬ সালে, পশ্চিম ভারতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ১৯১২-তে, দিল্লী লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ১৯১৬-তে এবং বিহার ও উড়িষ্যা লন টেনিস প্রতিযোগিতা ১৯২৫ সালে।

প্রথম সর্বভারতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা হয় ১৯১০ সালে। প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছর ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেখা যায় টেনিস খেলা ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। যে বিদ্যালয়গুলি ইংরেজদের পরিচালনাধীনে ছিল সেখানেও ছাত্রদের মধ্যে টেনিস খেলার উৎসাহ দেখা গেল। লক্ষ্যণীয় বিষয় এটা যে, প্রধানত ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই খেলা এবং আজও পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম কম। ঐ সময়ে যে সব ক্লাবগুলিতে টেনিস খেলা সুরু হলো সে সবই ছিল বিত্তবানদের ক্লাব। ঐ যুগে ভারতীয়

মহিলাদের মধ্যেও কেউ কেউ টেনিস পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন।

সর্বভারতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হবার ১০ বছর পরে গঠিত হয় সর্বভারতীয় লন টেনিস এ্যাসোসিয়শন। এই সময় ভারতে কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড় টেনিসে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁরা ভারতের টেনিস প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এঁদের কয়েকজনের নাম নীচে দেওয়া হলো ঃ—

মহম্মদ স্লীম ঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ইনি টেনিস চর্চা সুরু করেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের গুণে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯২১, ১৯২৪, ১৯২৮ এবং ১৯৩৪ সালে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর খেলার মান অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ১৯২৪ সালে স্লীম ইংলণ্ডে আটটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন এবং ১৯২৮-এ ইতালীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও উইম্বলডনে সর্ব ইংলণ্ড প্লেট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এছাড়া, ভারতে তিনি পঞ্জাব সিঙ্গলস প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি ৮ বার এবং সর্বসমেত ১৩ বার বিজয়ী হন।

শুধু খেলোয়াড় হিসাবেই নয়, টেনিসের ব্যবস্থাপনাতেও তার দান স্মরণীয়। সর্বভারতীয় লন টেনিস এ্যাসোসিয়শনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সি, রামস্বামী ঃ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ইনি ভারতের টেনিস খেলোয়াড়দের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম ছিলেন। মহম্মদ স্লীমের মত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর টেনিস খেলাতে হাতে খড়ি হয়। তাঁর টেনিস পারদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্লু" অর্পণ করেন। ডেভিস কাপে ১৯২২ সালে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন।

এস, এম, হাদী ঃ ১৯২১ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হাদীকে "ব্লু" প্রদান করে। ইনিও ১৯২১ থেকে তিন বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কেম্ব্রিজের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন। ডেভিস কাপে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯২৩ সালে এবং ডাবলসের খেলায় তিনি এবং তাঁর সহযোগী খেলোয়াড় ডি, আর, রুত্নম্ উইম্বলডনে শেষ ১৬ জনের মধ্যে থাকার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

পরবর্তী কালে টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন ঘৌস মহম্মদ। একাদিক্রমে অনেক বছর তিনি ভারতের এক

নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। এই যুগের আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়ের নাম এন, কৃষ্ণস্বামী, এস, সহনি প্রভৃতি।

ভারতের টেনিস্ খেলা দিনে দিনে আরও জনপ্রিয় হয় এবং দেখা দেয় অনেক টেনিস প্রতিভাবানের মুখ যাঁরা আন্তর্জাতিক টেনিসে উন্নততর ভারতীয় মান প্রদর্শন করলেন। তাঁদের নাম সুমন্ত মিশ্র, দিলীপ বসু, নরেশ কুমার, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎলাল, রামানাথন কৃষ্ণন (ইনি ১৯৬০-৬১ সালে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনালে উঠেছিলেন এবং ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম), বিজয় অমৃতরাজ প্রভৃতি। বিজয় অমৃতরাজ বর্তমানে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের খেলা : কাবাডি

কাবাডি সম্পূর্ণ ভারতীয় একটি খেলা। একেবারেই অজানা কবে এর উৎপত্তি। তবে খুব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের নানা স্থানে এই খেলার প্রচলন ছিল। শহরের চেয়ে পল্লী অঞ্চলেই লোকেরা এই খেলায় বেশি অংশগ্রহণ করতো। ভারতের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল কাবাডির। বিভিন্ন স্থানে এর নামের পার্থক্য বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতে কাবাডি হলো চেডুগুডু, আবার পশ্চিমবঙ্গে হাডুডু। নামের তফাতের সঙ্গে খেলার নিয়মেরও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা কাবাডি খেলার নিয়ম প্রণয়ন করে। অবশেষে মাদ্রাজ অলিম্পিক এ্যাসোসিয়শন কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী ওয়াই, এম, সি, এ-র খেলাধুলার নিয়মাবলীর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেটাই এখন দেশের সর্বত্র সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশনের পরিচালনায় প্রতি বৎসর সর্বভারতীয় কাবাডি জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের খেলা : খো খো এবং আট্য পাট্য

খো খো খেলা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় মহারাষ্ট্রে। এটিও একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা। দাক্ষিণাত্য জিমখানা এই খেলাটির নিয়মাবলী সংশোধিত আকারে প্রকাশ করে এবং ১৯১৪ সাল থেকে খো খো খেলার কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে আসছেন। আবার ১৯৩৫ সালে অখিল মহারাষ্ট্র শারীরিক শিক্ষণ মন্ডল খো খো খেলার নিয়মগুলি পরিমার্জনা করে মুদ্রিত করে।

আট্যপাট্য অপর একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং গ্রামীণ ক্রীড়া। খো খো এবং আট্য পাট্য এই দুটি খেলাই বিনা সরঞ্জামের খেলা। অতএব,

ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত খেলা।

তেনজিং এবং হিলারির ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট আরোহণের পরেই ভারত সরকার কর্তৃক দার্জিলিঙে "হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পর্বতারোহণ বিদ্যা শেখানো হয়। তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতের অধিবাসিরা সেই কোন আদি যুগ থেকে হিমালয়ের আকর্ষণে সাড়া দিয়ে হিমালয়ের বুক বেয়ে উপরে আরও উপরে উঠেছেন কিন্তু তাঁদের জানা ছিল না পর্বতারোহণের নানা কৌশল। এই ইন্সটিটিউটের কর্তব্য হলো যাত্রীদের আরোহণ বিদ্যা অর্থাৎ উপায় ও কৌশলগুলি শিক্ষা দেওয়া।

ভারতে মাউন্টেনিয়ারিং বা পর্বতারোহণ শিক্ষা

সুইজারল্যাণ্ডের মাউণ্টেনিয়ারিং বিদ্যালয় থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত মেজর এন, ডি, জয়াল নিযুক্ত হলেন দার্জিলিং এর এই ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ এবং তেনজিং হলেন ডিরেক্টর। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৫৮ সালে মেজর জয়াল ২৬,৮৬৭ ফুটের এক পর্বতাভিযানের যাত্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ৩৫ দিন স্থায়ীত্বের ট্রেনিং বছরে ছয়বার দেওয়া হয়। এই ছয়টি ট্রেনিং সুরু হয়—১লা মার্চ, ৭ই এপ্রিল, ১৪ই মে, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১২ই অক্টোবর এবং ১৮ই নভেম্বর। বিদ্যালয়ের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এখানে ভর্তির নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ধার্য হয়েছে। সাধারণত, বয়ঃক্রম ৪০ অনূর্ধ্ব এবং ন্যূনতম ১৮ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোনও স্বীকৃত ডাক্তারের দেওয়া শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেট অবশ্য প্রয়োজন। যাঁরা পর্বতারোহণ বিদ্যায় উচ্চ মানের দক্ষতা অর্জনে ইচ্ছুক কিংবা পর্বতের অনেক উচ্চে যেখানে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় সেখানে ওঠার ফলে মানুষের শরীর এবং মনের উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে, এ বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী তাঁদের জন্য "অগ্রসর" কোর্স এই ইন্সটিটিউটে চালু আছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এরকম দেখা গেছে যে, ঐরকম উচ্চস্থানে আরোহীরা মাঝে মাঝে নানারকম মানসিক ভ্রমের শিকার হন। একদা ফ্র্যাংক স্মাইদ নামে এক স্বনামধন্য পর্বতারোহী একাকী ঐরকম উঁচুতে উঠে মনে করতে লাগলেন যে, কে যেন একজন সঙ্গী তাঁর পাশে পাশে চলেছেন। তিনি এতদূর বিভ্রান্ত

হয়েছিলেন যে ঐ সঙ্গীকে তিনি নিজের কিছু খাবার দিতে চেয়েছিলেন। পরলোকগত মেজর জয়ালকে একবার কামেট অভিযানে যাত্রা কালে দেখা গেল তিনি নিজের ডান হাত দিয়ে কী যেন টেনে তুলছেন, অথচ টেনে তোলার মত কিছুই সেখানে ছিল না। তাঁকে সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো যে, তিনি নাকি একটি ছাগলকে টেনে তোলার চেষ্টা করছিলেন। এমনি বিচিত্র বিভ্রান্তি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান হয় ১৯৬০ সালের ২রা মার্চ। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং এর পরিচালনায় দার্জিলিং ইনস্টিটিউটের ২০ জন সদস্য ছিলেন এই অভিযাত্রী দলে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, তেনজিং-এর এভারেস্ট বিজয়ের অভিযান ভারতীয় অভিযান নয়। সুইজারল্যান্ড কর্তৃক এই অভিযান স্বীকৃত হয়। জ্ঞান সিং-এর দল দুই মাস তেইশ দিন পরে পৌঁছেছিলেন ২৮,৩০০ ফুট পর্যন্ত। বাকি ছিল আর মাত্র ৭২৮ ফুট।

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান

টেবল টেনিস খেলায় ভারতের অবদান সামান্য নয়। যদিও ১৯৩৮ সালে ভারতীয় টেবল টেনিস গঠিত হয় কিন্তু তার অনেক পূর্বেই ১৯২৬ সালে ভারত আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস সংস্থার "প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের" অন্যতম ছিল এবং ১২ বারের মধ্যে ৯ বার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য এই সময় যাঁরা ভারতীয়দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন তাঁরা সবাই ছিলেন ইংলণ্ডের বাসিন্দা। কেউ পড়াশুনার ব্যাপারে, কেউ কর্মোপলক্ষ্যে তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। লণ্ডনে ১১২ নম্বর গাওয়ার স্ট্রিটে অবস্থিত ওয়াই, এম, সি, এ ছিল ঐ সময় ভারতীয় ছাত্রদের টেবল টেনিস খেলার প্রধান কেন্দ্র। সেখানে অনেকগুলি টেবল টেনিস বোর্ড ছিল। এই বোর্ডগুলিতেই অনেক ভারতীয় ও ইংরেজ প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের টেবল টেনিসের হাতে-খড়ি হয়েছিল।

ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশন ও টেবল টেনিস

ভারতীয়দের মধ্যে ১৯২৪-২৫ সালে সর্ব ইংলণ্ড প্রতিযোগিতায় পি, এন, নন্দ জয়ী হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নন্দ টপ-স্পিন ড্রাইভ মারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নন্দ দেশে ফিরে আসার পরে আর, জি, সুপায়া নামে অপর এক ভারতীয় ঐ একই প্রতিযোগিতায় পর পর দু'বার বিজয়ী হয়ে ভারতীয়দের গর্বের ব্যক্তি হন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকারী ভারতীয়দের মধ্যে আয়ুব, আয়ার, বরফওয়ালা, জিমি দাশ প্রভৃতি খেলোয়াড়রা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশন গঠন হবার পূর্বেই ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেবল টেনিস এ্যাসোসিয়শন। বেঙ্গল টেবল টেনিস এ্যাসোসিয়শন হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয় নি। কলকাতায় ওয়াই, এম, সি, এ-র বিভিন্ন শাখায় টেবল টেনিস খেলার চর্চা অনেক বছর আগে থেকেই সুরু হয়। শোনা যায়, ১৯১১ সালেও সবুজ টেবিলে সেলুলয়েডের বল দিয়ে এই খেলার প্রচলন ছিল ওয়াই, এম, সি, এ-র সদস্যদের মধ্যে। তারপর ১৯২০ সালে কলকাতায় টেবল টেনিসের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পেল। ওয়াই, এম, সি, এ-র বাইরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট, মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট এবং মিশনারি কলেজের হোস্টেলগুলিতে টেবল টেনিসই ছিল ইণ্ডোর খেলার মধ্যে ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয়।

পরবর্তীকালে, কলকাতায় তো বটেই, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও টেবল টেনিসের দ্রুত প্রসার হলো। যে সব ভারতীয় খেলোয়াড় টেবল টেনিস খেলায় সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো ঃ— শিবরমন, কল্যাণ জয়ন্ত, কুমার ঘোষ, থ্যাকারসে, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক ঘোষ, রূপা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অনেক প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে মল্লযুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয়, খালি হাতে বাহুযুদ্ধের নামই ছিল মল্লযুদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মল্লযুদ্ধ ভারতে প্রচলিত আছে। পুরাকালে প্রায়ই

ভারতের কুস্তি : উৎপত্তি ও ইতিহাস

রাজপ্রাসাদে মল্লবীররা মল্লযুদ্ধের কৌশল দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ পেতেন এবং প্রচুর দর্শক সমক্ষে নানারকম মল্লক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে রাজার কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করতেন। মহাভারতের আদি পর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভীম ও শল্য রাজার মল্লযুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় এবং সভাপর্বে দেখা যায় ভীম ও মগধরাজ জরাসন্ধের প্রবল মল্লযুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার বনপর্বে ভীমের সঙ্গে কির্মি নামে এক অনার্য বা রাক্ষসের মল্লযুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই সব যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি আমাদের বলে দেয় মল্লযুদ্ধ কাকে বলা হতো। বনপর্বে কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের বাহুযুদ্ধ বা মল্লযুদ্ধের ঘটনা বিবৃত আছে। এছাড়া, ভীমের সঙ্গে হিড়িম্ব এবং বকরাক্ষসের ও কীচকেরও ভয়ানক বাহুযুদ্ধের বর্ণনা আছে। আবার ভাগবতের দশম স্কন্ধে লিখিত আছে যে, রাজা কংসের চানুর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল নামে পাঁচজন মল্ল-

বীর ছিল। এই চানুরের সঙ্গে কৃষ্ণের ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণের দাদা বলরামের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। শিবের থেকেই বাহুযুদ্ধের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম কৃষ্ণের কাছে বাহুযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

বর্তমানের কুস্তি মল্লযুদ্ধেরই খানিকটা পরিবর্তিত রূপ। অন্যান্য সব ক্রীড়ায় যেমন যুগে যুগে পদ্ধতি পাল্টায় মল্লক্রীড়াতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কুস্তি শব্দটি আমরা প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে পাইনা কারণ এটি সংস্কৃত শব্দ নয়। হয়তো মুসলমানী শব্দ। কুস্তিগীরদের আমরা পালোয়ান বলে উল্লেখ করি। কেউ কেউ মনে করেন "পহ্লব" জাতি থেকেই পহ্লবান বা পালোয়ান শব্দের উৎপত্তি। প্রসঙ্গত, বীর সোরাব ও রুস্তম জাতিতে ছিলেন পহ্লব। রুস্তম তৎকালীন যুগে বাহুযুদ্ধে অপরাজেয় ছিলেন। তাঁরই স্মরণে এখনও পর্যন্ত অসাধারণ কুস্তিগীরদের ভারতে "রুস্তম-ই-হিন্দ্" উপাধি প্রদত্ত হয়।

হনুমান, ভীমসেন ও জরাসন্ধ প্রাচীন যুগের এই তিন মল্লবীরের নামানুসারে ভারতে তিন প্রকার কুস্তির নামকরণ হয় হনুমন্তী, ভীমসেনী ও জরাসন্ধী। পঞ্জাবের কুস্তিগীররা হনুমন্তী আর মথুরার চৌবেরা ভীমসেনী পদ্ধতি অবলম্বন করতো। ভীমসেনী পদ্ধতিতে দৈহিক শক্তির প্রয়োগ বেশী এবং হনুমন্তী পদ্ধতিতে প্যাঁচের কৌশলই বেশি। জরাসন্ধী কুস্তি প্রায় অপ্রচলিত।

ভারতের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে ভারতীয় কুস্তিগীরদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুরু হয় ভারতীয় কুস্তিগীরদের নানা কীর্তি ও খ্যাতির ইতিহাস। এর পূর্বেকার কুস্তিগীরদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুপস্থিত।

ভারতের পালোয়ানদের মধ্যে বুটা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সেরা কুস্তিগীর। ১৮৩৮-এ লাহোরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনকালে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে কুস্তিগীর মহলে। তৎকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ

বুটা সিং

কুস্তিগীরকে "গুরুজবন্ধ্" উপাধিতে ভূষিত করা হতো। ভারতীয় কুস্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখক শ্রীসমর বসুর প্রবন্ধে থেকে জানা যায় যে, ১৮৬৯ সালে অমৃতসরের "গুরুজবন্ধ্" উপাধিধারী রামজীকে বুটা এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লড়াই করে ধরাশায়ী করে "গুরুজবন্ধ্" উপাধি লাভ করেন। এই ঘটনার পর থেকে বুটা ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন ১৮৮৪ সালে বুটা অবসর গ্রহণ করেন। বুটার আর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শিয়ালকোটের

বালী। শোনা যায়, তাঁর সঙ্গে বুটার লড়াই অমিমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিল।

১৯৪১ সালে সর্বভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনিরে উল্লেখ আছে যে, ইংলণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপস্থিতিতে ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরকে পরাজিত করে বুটা মহারাণীর কাছ থেকে ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান এবং নৃসিংহগড়ের মহারাজা বুটার এই কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে ৮০,০০০্ টাকা ও একখানা গ্রাম তাঁকে দান করেছিলেন।

ভারতের সব পালোয়ানই যাঁকে প্রায় দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে সেই

গোলাম পালোয়ান

গোলাম পালোয়ানের প্রকৃত নাম ছিল গোলাম মহম্মদ। ১৮৬০ সালে অমৃতসরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন "গুরুজবন্ধ্"। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ৫ ফুট ৮½ ইঞ্চি, বুক ৫৮ ইঞ্চি।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক বিখ্যাত প্রদর্শনীতে গোলামকে নিয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন কালু, রহমান, গুল্লু ও গোলামউদ্দিন নামে আরও চারজন পালোয়ান। ২৯শে মে তাঁরা প্যারিসে পেঁছান এবং ঐদিনই মতিলাল নেহেরু বিশ্বের যে কোনও পালোয়ানকে গোলামের সঙ্গে কুস্তির জন্য আহ্বান জানাবার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় প্রত্যহ ভারতীয় পালোয়ানদের কুস্তির অভ্যাস দেখার জন্য দলে দলে প্যারিসের লোকেরা উপস্থিত হতো এবং সেখানে তাঁদের নাম ডাক এতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁরা যেখানেই যেতেন সেখানেই লোকেরা অবাক বিস্ময়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আর গোলাম পালোয়ানের জন্য প্যারিসের প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বার খোলা ছিল।

তুরস্কের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বিশালদেহী কুর্দি আলীর সঙ্গে ঐ প্রদর্শনীতে গোলামের কুস্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কুর্দি আলী তখন ইউরোপেই ছিলেন এবং বড় বড় কুস্তির আসরে লড়াই করে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্থির হয় যে, ইউরোপের গ্রীকো-রোমান পদ্ধতিতে কুস্তি হবে গোলাম বনাম কুর্দির। যে কোনও ভারতীয় পালোয়ানের পক্ষে এই পদ্ধতিতে কুস্তি করা তখন অনভ্যাসের দরুণ অসুবিধাজনক ছিল। তথাপি তিন ঘণ্টা ব্যাপি লড়াইয়ে গোলাম তিনবার কুর্দিকে আছাড় মেরে চিৎ করে ফেলে দিয়েছিলেন কিন্তু গ্রীকো-রোমান পদ্ধতিতে চিৎ করা হয়নি বলে লড়াই শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকে। তবে উপস্থিত সব কুস্তি বিশারদেরাই মনে করেন যে, গোলাম কুর্দি আলীর

চেয়ে উন্নততর পালোয়ান। গোলামকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলতেও কেউ কেউ দ্বিধা করেন নি। শ্রদ্ধেয় লেখক সমর বসুর লেখা থেকে উপরোক্ত লড়াইয়ের কথা জানা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন ময়মনসিংহের কৈলাস বাঘা। ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। আসল নাম ছিল কৈলাস চন্দ্র বসু। একবার একটা নৌকোর বৈঠা দিয়ে তিনি একটা বাঘ মেরে

কৈলাস বাঘা

বাঘা উপাধি পেয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে এক-বার এক ইরাণী পালোয়ান ঢাকায় এসে কুস্তিগীরদের আহ্বান জানালেন তাঁর সঙ্গে বাজী ধরে কুস্তি করার জন্য। তাঁর নাম ছিল শাহনওয়াজ। ঢাকায় তখন প্রচণ্ড শক্তিধর পালোয়ান পরেশনাথ ঘোষ ছিলেন, কিন্তু ঐ পেশাদারী পালোয়ানের সঙ্গে বাজী ধরে কুস্তি লড়তে তিনি সম্মত হন নি। বস্তুত, ঢাকায় কোনও পালোয়ানই তাঁর সঙ্গে ঐ সর্তে লড়তে রাজি হননি। বেশ নাম ডাকও আছে। কৈলাসবাঘা বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষার্থে তাঁর সঙ্গে লড়তে সম্মত হলেন। শাহনওয়াজের মাথার খুলি ছিল আশ্চর্যরকম শক্ত। কুস্তি সুরু হতেই তিনি মাথা দিয়ে কৈলাসবাঘার মাথায় এক প্রচণ্ড ঢুঁ মারলেন। কৈলাসবাঘা স্বভাবতই এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি আচমকা ঢুঁ খেয়ে হতচকিত হন এবং মাথায় খুবই ব্যথা অনুভব করেন। তথাপি সামলিয়ে নিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করলেন। এইভাবে কৈলাস বাঙ্গালীর মান রক্ষা করেন।

করিম বক্স ছিলেন লাহোরের এক বিখ্যাত কুস্তিগীর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। তাঁর দেহসৌষ্ঠব ও কুস্তির দক্ষতায় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। করিম ছিলেন বুটার এক প্রিয় ছাত্র। একবার

করিম বক্স

প্রসিদ্ধ সর্ব ইংলণ্ড বিজয়ী কুস্তিগীর টম ক্যানন ভারতে এসেছিলেন এখানকার কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়াইয়ের আকাঙ্খায়। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সহায়তায় টম ক্যাননের সঙ্গে করিম বক্সের এক কুস্তির আয়োজন হয় কলকাতার ময়দানে ১৮৯২ সালে। মহারাজা স্বয়ং কুস্তির মধ্যস্থতা করেন। বিশাল জনসমাবেশের সম্মুখে সুরু হয় সেই ইংরেজ বীর বনাম ভারতীয় কুস্তিগীর করিমের লড়াই। ক্যাননের দেহের আকৃতি করিমের চেয়ে বৃহত্তর থাকায় প্রথমে দর্শকেরা কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েন কিন্তু লড়াই সুরু হবার মুহূর্ত মধ্যে করিম ক্যাননকে ধরাশায়ী করেন এবং

জনতার আনন্দ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হয় লড়াই। দ্বিতীয় বারে চার মিনিটের মধ্যেই আবার করিম ক্যাননকে চিৎ করে তাঁর পিঠ মাটিতে লাগিয়ে দিলেন।

বিলাতের ডেইলি নিউজ পত্রিকায় প্রথমে এই লড়াইয়ের কথা প্রকাশিত হয় এবং তারপরে অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হয় এই ঐতিহাসিক লড়ায়ের খবর। সর্বইংলন্ড বিজয়ী বীরের একজন ভারতীয়ের কাছে পরাজয়ের সংবাদ তখন কুস্তিগীরদের মহলে বিশেষ আলোড়নের সঞ্চার করেছিল এবং ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ছিল এই লড়াইয়ের ফলাফল।

পরবর্তীকালে করিম বক্স গোলাম পালোয়ানের মৃত্যুর পরে রুস্তম-ই-হিন্দ্ অর্থাৎ ভারতের এক নম্বর কুস্তিগীর হয়েছিলেন।

অমৃতসরের কিক্কড় সিং ছিলেন বুটার শিষ্য এক অসাধারণ বলশালী ও বৃহত্তম দেহের অধিকারী। আনুমানিক সাড়ে ছয় ফুট উচ্চতায় তাঁর বুক ছিল আশী ইঞ্চি চওড়া। ভারতে আর কোনও পালোয়ানের

কিক্কড় সিং

আজ পর্যন্ত এতখানি চওড়া বুকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর দেহে মেদের আধিক্য ছিল বলে জানা যায় এবং মহিষের মতন ঘাড়ে পুরু খাঁজ ছিল। শোনা যায় ভারত শ্রেষ্ঠ গোলাম পালোয়ানও কিক্কড়ের শক্তিতে সন্ত্রস্ত ছিলেন। একবার ইন্দোরে অনুষ্ঠিত গোলাম ও কিক্কড়ের লড়াইয়ে কিক্কড়ের হাতের ঝাপটে গোলাম রীতিমত শঙ্কিত ও বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তবে লড়াইয়ের কৌশল দ্বারা তিনি কিক্কড়কে পরাস্ত করেছিলেন।

সারা পঞ্জাব কিক্কড়ের শক্তির বর্ণনায় মুখরিত ছিল। গোলামের পরবর্তী যুগের পালোয়ানদের মধ্যে গামাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপের

গামা

শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের পরাজিত করে লাহোরের গামা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

গামার কুস্তির শিক্ষাগুরু ছিলেন হিন্দু পালোয়ান মাধব সিং। ১৯০৯-১০ সালে লাহোরের দুইজন প্রতিভাবান পহলবানের নাম দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। একজন গামা অপরজন গোলাম মহীউদ্দিন। এ ছাড়া, অমৃতসরের আহমেদ বক্শ্‌ও অতি উচ্চ শ্রেণীর কুস্তিগীর ছিলেন কিন্তু গামাও তিনি একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। সুতরাং প্রচলিত রীতি বা প্রথা অনুযায়ী এঁরা কখনও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হননি। তবে গামার সঙ্গে মহীউদ্দিনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য এক উল্লেখযোগ্য লড়াইয়ের

ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে দীর্ঘসময় এই দুই শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত গামাই জয়ী হয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত রেওয়ার মহারাজা গামার এই বিজয়ে এতদূর আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি নিজের চোগা খুলে গামাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে মার্চ মাসে শ্রীশরৎ কুমার মিত্র ও গোবরবাবু গামাকে বিলাতে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন পহলবান গামার ভাই ইমাম বকশ্ আহমদ বকশ্, গামু পালোয়ান ও বিদ্যাধর পণ্ডিত (বিলাতে শ ডেসমন্ডের মতে ইনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল)। লণ্ডনে এই দলের ম্যানেজার ছিলেন বেঞ্জামিন সাহেব। এই দলকে প্রথমে লণ্ডনে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। তারপর ম্যানেজারের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত কুস্তিগীর ডাক্তার রোলারের সঙ্গে গামার লড়াইয়ের বন্দোবস্ত হলো। ক্যাচ্-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান পদ্ধতিতে এই কুস্তি হয়েছিল। এই পদ্ধতিতেই বিদেশে কুস্তি হতো যার ফলে কুস্তিগীরের পরিধেয় ধরা নিষিদ্ধ অথচ, ভারতীয় পালোয়ানরা পরিধেয় ধরে প্যাঁচ লাগাতে অভ্যস্ত ছিল। যাই হোক, মাত্র সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোলার কুপোকাৎ। রোলার ধরাশায়ী, গামা বিজয়ী। পরীক্ষা করে পরে জানা গেল ডাক্তার রোলারের দুটো পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে। রাতারাতি এই জয়ের খবর প্রচারিত হলো এবং গামার নাম এক বিস্ময়ের দৃষ্টি করলো বিলাতে।

তারপর তৎকালীন বিশ্বসেরাদের অন্যতম পোল্যাণ্ডের বিস্কোর সঙ্গে গামার লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হলো ইংলণ্ডে। যেহেতু দুজনেই ছিলেন পেশাদার তাই বাজি রইলো বিজয়ী পাবেন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের পুরস্কার "জন বুল বেল্ট" ও নগদ ২৫০ পাউণ্ড। লণ্ডনের এক বিরাট স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসমষ্টির সম্মুখে সেই ঐতিহাসিক লড়াই চললো ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। বিস্কো গামার পরাক্রম দেখে কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত হবার পরই উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। গামার পক্ষে তাঁকে শত চেষ্টা করেও চিৎ করা সম্ভব হয়নি। তবে কুস্তির নিয়মানুসারে গামাকেই জয়ী ঘোষণা করা হলো। এরপর দীর্ঘকাল বাদে বিস্কো ভারতে আগমন করে গামার সঙ্গে পাতিয়ালাতে লড়াই করেছিলেন, গামা মাত্র ৪২ সেকেণ্ড বিস্কোকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন।

গামার কুস্তির বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মরক্ষামূলক লড়াই। যদিও কুস্তির সবরকম প্যাঁচ ও কলা কৌশলই গামার আয়ত্ত ছিল তথাপি আত্মরক্ষা

মূলক ও দাঁড়িয়ে কুস্তিতে তাঁর সমকক্ষ কুস্তীগীর দুনিয়াতে দুর্লভ ছিল। পরবর্তীকালে গামাকে কেউ কুস্তিতে আহ্বান জানালে তাঁর নির্দেশ ছিল যে আগে ছোট গামা ও ইমাম বকশ্‌কে পরাস্ত করতে হবে, তবেই তাঁর সঙ্গে লড়াই করবার তার অধিকার জন্মাবে, নচেৎ নয়।

গামা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসাবে পরিগণিত হতেন। যৌবন কালে তাঁর দেহ ছিল শক্তি ও সৌন্দর্যের এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয়। গ্রীক আদর্শে তাঁর দেহ তৈরি ছিল। তাঁকে সামনে থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে এই প্রশ্ন জাগতো—ভীম অথবা হারকিউলস কি এঁর চেয়েও বেশি শক্তিধর ছিলেন? গামার উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৭½ ইঞ্চি এবং বুক ৪৮ ইঞ্চি ও বাহু ১৮ ইঞ্চি।

ইমাম বকশ্ তাঁর দাদা গামার কাছে শিক্ষা করেছিলেন কুস্তি। গামার তুলনায় তাঁর দেহ ছিল বেশ মেদবহুল ও নরম। বিদেশী কুস্তিগীররা তাঁকে প্রথম দর্শনে রীতিমত ধীর ও যথেষ্ট কম শক্তিধর বলে মনে

ইমাম বকশ্

করতো। কিন্তু মল্লক্ষেত্রে অবতরণ করলেই তাঁর তখন অন্যমূর্তি। কী ক্ষীপ্রতা, কী কৌশলের প্রয়োগ সবই ছিল ইমামের অসাধারণ। বিস্কোর মতে জমির কুস্তিতে ইমাম গামার চেয়ে উন্নততর ছিলেন। লণ্ডনের পত্রিকায় তিনি "প্যান্হার" নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

ইমাম যখন গামার সঙ্গে বিলাতে গিয়েছিলেন তখন জন লেম নামে এক বিশিষ্ট ইউরোপীয় মল্লের সঙ্গে লড়াইতে তিনি তাঁর সঙ্গে নিতান্ত অনায়াস ভঙ্গীতে কুস্তি করে অল্প সময়ের মধ্যেই ধরাশায়ী করেন। লেম এর পূর্বে কখনও এত কম সময়ে এরূপ সহজভাবে পরাজয় বরণ করেননি। এই লড়াই দুবার হয়েছিল। প্রথমবার লেম বিস্কোর অনুকরণে গদীতে উপুড় হয়ে ঘাপটি মেরেছিলেন কিন্তু ইমাম তাঁকে প্যাঁচ কষে মাত্র ৩ মিনিট ১ সেকেন্ডের মধ্যেই চিৎ করে দেন। দ্বিতীয়বার আরও কম সময়ে লেমকে চিৎ হতে বাধ্য করলেন ইমাম ১ মিনিট ৮ সেকেণ্ডে। লেম তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লদের অন্যতম ছিলেন।

পশ্চিম জগতে গামা ও ইমামের কৃতিত্বে ভারতীয় কুস্তির গৌরব বৃদ্ধি পেল। ইমামের কাছে লেমের পরাজয়ের পর প্যাট কনোলি নামে এক আয়র্লণ্ডের পালোয়ানকে আনা হলো লড়াইয়ের জন্য। ইমামের ভয়ঙ্কর কুস্তির কাছে কনোলি ১০ মিনিটেই চিৎ হলেন। ইমামের দৈর্ঘ্য ছিল ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি ও বুক ৪৬ ইঞ্চি।

গোবরবাবুর ভাল নাম ছিল যতীন্দ্রমোহন গুহ। ১৮৯৪ সালের ১৩ই মার্চ এই বীর বঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়। সৌভাগ্যবশত, গোবরবাবুর জন্মই হয় এক বিখ্যাত কুস্তিগীরের বংশে। গোবরবাবু তাঁর পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহ যিনি অম্বুগুহ নামেই খ্যাত ছিলেন, তিনি নিজে এক প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ছিলেন। অম্বুগুহ নিজে ছিলেন প্রচুর ধনের মালিক এবং বঙ্গদেশে কুস্তির প্রসারের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ক্ষেত্রচরণ গুহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন ভারত বিখ্যাত কুস্তিগীর রূপে স্বীকৃতি পান। ইনি ক্ষেতুবাবু নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতায় তাঁর কুস্তির আখড়া ক্ষেতুবাবুর আখড়া নামে সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেছিল। সমস্ত বাংলা এবং পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত পালোয়ানদের আড্ডা ছিল এই আখড়া।

গোবরবাবুর মতো বিদেশীদের সঙ্গে এতবার কেউ কুস্তি লড়েন নি। ১৯১৩ সালে বিলেতে গিয়ে তিনি প্রথম বিদেশী কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়াই সুরু করেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি পার হয়নি। গোবরবাবুকে সেখানে সকলে বলতো "বালক কুস্তিগীর।" কিন্তু তখনই তাঁর দেহ ছিল বিপুলায়তন এবং সেই দেহে শক্তি ছিল অসাধারণ। স্কটল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন জিমি ক্যাম্বেলকে হারিয়ে এই "বালক কুস্তিগীর" স্কটিশ চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন। ২৭শে আগস্ট ক্যাম্বেলকে হারিয়ে তারপর ৩রা সেপ্টেম্বর এডিনবরার অলিম্পিক অডিটোরিয়ামে তাঁর চেয়ে ও বড়ো কুস্তিগীর জিমি এসেনের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। এসেন তখন "বৃটিশ এম্পায়ার রেস্টলিং চ্যাম্পিয়ন" ছিলেন। গোবরবাবুর চেয়ে দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তিনি বড় ছিলেন। এসেন দৈর্ঘ্যে ছিলেন ৬ ফুট ৩ ইঞ্চির চেয়েও কিঞ্চিৎ বেশি এবং তাঁর বুক ছিল ৫০ ইঞ্চি ও বাহু ১৮ ইঞ্চি। ৩৯ মিনিট লড়াইয়ের পর গোবরবাবু এসেনকে পরাজিত করেন। এসেনকে হারিয়ে গোবরবাবু "বৃটিশ এম্পায়ার রেস্‌লিং চ্যাম্পিয়ন" হলেন। আর কোনও ভারতীয় ঐ উপাধি লাভ করতে পারেনি। তারপর গোবরবাবু দেশে ফিরে আসেন এবং তার কিছুদিন পরেই আবার বিদেশ যাত্রা করেন। এবার ইউরোপে নয়, আমেরিকায়।

১৯২১ সালের ৩০ শে জানুয়ারি নিউইয়র্কে হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ মল্ল বীর টমি ড্রাকের সঙ্গে কুস্তি হয়। লড়াই সুরু হওয়া মাত্র তিনি প্রচণ্ড

ভাবে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে ড্যাক্‌কে পর্যুদস্ত করে তুললেন। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর গোবরবাবু তিন মণ ওজনের ড্যাক্‌কে দুহাতে শূন্যে তুলে এক প্রবল আছাড় মারলেন। তারপরে মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে চিৎ করে দিলেন। গোবরবাবু খুব সহজেই জয়ী হলেন কেন না, ড্যাক ঐ আছাড়ের ফলে রীতিমত কাবু হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র ৪ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে গোবর বাবু ড্যাককে পরাস্ত করে দিলেন।

এই জয়ের পর সমগ্র আমেরিকায় গোবরবাবুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অ্যাড স্যাণ্টেলকে হারিয়ে দেন। যার ফলে আমেরিকার সরকারি রেস্টলিং এ্যাসোসিয়শনে তাঁকে সরকারিভাবে "বিশ্বের লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন" পদবীতে ভূষিত করেন, বিশ্বের দুজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন বড় বিস্কোর সঙ্গেও গোবরবাবুর লড়াই হয়েছিল। তাতে উভয় উভয়ের কাছে একাধিকবার পরাজিত হয়েছেন।

কুস্তি-বিদ্যায় গোবরবাবুর মতো এত বড় বিশেষজ্ঞ ভারতে কেউ ছিলেন না। ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় প্রকার কুস্তিতেই তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভারতীয় কুস্তিগীর।

এছাড়া, তৎকালে আরও অনেক বড় বড় কুস্তিগীর ছিলেন যাঁরা ভারতীয় কুস্তির ঐ স্বর্ণযুগে দাটের সঙ্গে কুস্তি লড়েছেন। এমনি কয়েকজন পহলবানের নাম হলো, গামু, রহিম, গুঙ্গা (এঁর প্রকৃত নাম ছিল ফিরোজউদ্দিন, বোবা ও কালা ছিলেন বলে তিনি গুঙ্গা নামেই খ্যাত ছিলেন। এঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব একবার ইমাম বখশকে পরাজিত করা), ছোট গামা, আহমদ বখশ্ কাল্লু, মহীউদ্দিন, ভুট্টান সিং, হামিদা, সাহাবুদ্দিন, বস্‌সা, হরবন্স সিং প্রভৃতি।

ভারতীয় কুস্তিগীররা প্রায় সকলেই পেশাদার ছিলেন এবং কুস্তি করে তাঁরা অনেকেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। বৃটিশ শাসনকালে ভারতের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় বড় পালোয়ানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ভারতীয় কুস্তির অবনতি দেখা যায়। ভারতীয় কুস্তির সেই স্বর্ণযুগে এদেশে এমন অনেক কুস্তিগীর ছিলেন যাঁরা বিদেশে গেলে সহজেই সেখানকার শ্রেষ্ঠদের পরাস্ত করতে পারতেন। তবে স্বভাবতই, পাশ্চাত্য জগতে কুস্তির ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান ও গ্রীকো রোমান প্রথা প্রচলিত থাকায় ভারতীয় কুস্তিগীরদের সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, পাশ্চাত্য

কুস্তিগীররা সর্বদাই তাঁদের প্রথায় ভারতীয়দের লড়তে বাধ্য করেছেন। তথাপি ভারতীয় কুস্তিগীরদের অসাধারণ প্রতিভায় তাঁরা বারবার পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতের কুস্তির দুই মহারথী হ্যাকেনস্মিথ ও গচ্ বারবার গামাকে এড়িয়ে গেছেন কেন একথার উত্তর একমাত্র তাঁদেরই জানা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানসিকতায় এক প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-শিক্ষার সঙ্গে শুভ সংযোগে এর সূচনা। এরই নাম নব জাগরণ বা রেনেসাঁ। আর তারই এক ফসল বাঙ্গালীর শরীর চর্চার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ। ঠাকুর পরিবার এবং মনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত এ বিষয়ে দেশবাসীকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এই সময় বঙ্গদেশে শরীর চর্চার ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবারে প্রায় সব ব্যাপারেই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার ফলস্বরূপ অনেকটা মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স থেকেই ব্যায়াম অনুশীলন করতেন। অর্থাৎ, পিতা দ্বারকানাথ তাঁর পরিবারে একটা শরীর চর্চার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

উনিশ শতকে ভারতীয় শরীর চর্চায় বাঙ্গালীর অবদান

হীরা সিং নামে এক বড় কুস্তিগীর নিয়মিতভাবে ঠাকুর বাড়ীতে এসে ছেলেদের কুস্তি শিক্ষা দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ কুস্তিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সন্তরণ পটু। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে কুস্তি চর্চার কথা সম্ভবত কারোর অজানা নয়। "জীবনস্মৃতি"তে তিনি লিখেছেন—"আমাদের বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদার (হেমেন্দ্রনাথ) বিশেষ উৎসাহ ছিল। ……ভোরে অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া ল্যাঙটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত।…ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমন্যাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন।"

রবীন্দ্রনাথ পিতার প্রেরণাতেই শরীর চর্চার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শিক্ষা করেছিলেন যার ফলে যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অটুট স্বাস্থ্য ও সুন্দর দেহের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

বাঙ্গালীর শরীর চর্চার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর "তত্ত্ববোধিণী" পত্রিকার দান সামান্য নয়। ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকার সম্পাদক

অক্ষয় কুমার দত্ত শরীরচর্চা বিষয়ে প্রায়ই কিছু জোরালো প্রবন্ধ রচনা করে এই পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। সুতরাং তাঁর এই প্রবন্ধাবলী অনেক বাঙ্গালীর মনেই অনুপ্রেরণা এনে দিতে পেরেছিল।

১৮৫৭ সালে বিখ্যাত গুহ পরিবারের কুস্তির আখ্ড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অম্বু বাবু ও ক্ষেতুবাবুর প্রচেষ্টায় এই আখ্ড়া বঙ্গদেশের তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আখড়ায় পরিণত হয়। এই আখড়া প্রথমে ছিল মসজিদ বাড়ী স্ট্রিটে। তারপর গোয়াবাগান স্ট্রিটে চলে আসে।

ঐ শতাব্দীতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। "ন্যাশনাল পেপার" নামে সেই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় নবগোপাল মিত্র নামে এক আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে। এই পরম উৎসাহী মানুষটির একটি জাতীয় সভা গঠন করার বাসনা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় দেখা যায় "নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল। আমি আগাগোড়া তাহার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত। কুস্তি, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল। কিন্তু কিরকম হওয়া উচিত সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।" সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্রের স্বপ্ন সফল হয়। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সভা। জাতীয় সভার অধিবেশনে স্থিরিকৃত হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যার নাম ছিল হিন্দুমেলা। হিন্দুমেলায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল নানারকম ব্যায়াম ও কুস্তি। হিন্দুমেলার কার্যক্রমগুলি পরিচালনার সুবিধার জন্য ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। ষষ্ঠ ভাগ ছিল শরীর চর্চা সম্পর্কে প্রস্তাব। এই প্রস্তাব অনুসারে "যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা হইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।" শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্রের এক প্রবন্ধ থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"মেলায় এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্টি। এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা, পরে লাঠিতে ভর দিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া। তৎপরে কুস্তি করা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরানো দেখিয়া আশ্চর্য

বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণপূর্বক মস্তকে ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করেন। আর একজন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তাহার পৃষ্ঠের ধারে চারখানি ইঁট রাখা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা লইয়া এক আঘাতে ইঁটগুলি চূর্ণ করে। আর একজন শবের ন্যায় স্পন্দনহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিট কাল সমাহিত রাখা হইয়াছিল। পরে একজন যুবক অশ্বারোহণপূর্বক বেড়া লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ প্রসংসা লাভ করেন। তৎপরে নৌকার বাইচ খেলা হয়।"

নবগোপাল মিত্র যুবকদের অশ্বারোহণবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের লোকেরাও ঐ বিদ্যা শেখার অভিলাষে ভর্তি হয়েছিলেন।

এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবগোপাল মিত্রের ১৮৭২-এ ন্যাশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন। শিল্প, সংগীত ও শরীর চর্চা ছিল এই বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। শরীর চর্চা ও শিল্পচর্চার এই সহাবস্থান বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে প্রশংশিত হয়। এই বিদ্যালয়ে প্যারালাল বার, হরাইজণ্টল বার ইত্যাদির সঙ্গে ছোরা ও লাঠি খেলা এবং কুস্তির শিক্ষাও অনুশীলন হতো। জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যাও ছিল প্রচুর এবং তাদের মধ্যে অনেকেই শরীর চর্চায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত খবর প্রকাশিত হয়— "প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পুত্র (স্যার সুরেন ব্যানার্জির ছোট ভাই ক্যাপ্টেন জিতেন ব্যানার্জি) অসীম শক্তিধর পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা দেখিলাম তিনি অর্ধ মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড লৌহ পিণ্ড উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবলীলাক্রমে বাহুদ্বয়ের মাংসপেশীর উপর বারম্বার ধারণ করিতে লাগিলেন।" বলা বাহুল্য, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

এই বিদ্যালয়ের অপর ছাত্র শ্যামাচরণ ঘোষ দেশীয় সিভিল সার্ভিসে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হন। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হতেন তাঁদের শিক্ষাগত মান যথেষ্ট উঁচু ছিল। এই কারণে তৎকালীন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষকের পদগুলিতে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্তরাই নিযুক্ত হতেন।

নবগোপাল মিত্র খুবই অর্থবান ব্যক্তি হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অজস্র অর্থব্যয় করে অবশেষে খুবই অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী জীবনে তাঁর শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করে এক বাঙ্গালী সার্কাস দল স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশত, শেষ জীবনে নবগোপাল মিত্র প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় মারা যান।

এই সময় বাঙ্গালীরা ব্যায়াম চর্চা ছাড়াও অন্যান্য খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ সুরু করে। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রচলন হয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল কিছু ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান।

পূর্বে উল্লিখিত জাতীয় সভা ও হিন্দুমেলা প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পরবর্তীকালের ব্যাপক শরীর চর্চা ও ক্রীড়ার প্রসারে।

উনিশ শতকে কয়েকজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিও শরীর চর্চা ও নানা খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় বিদ্যালয় এবং অম্বুগুহের আখড়ায় শরীর চর্চা করতেন। বিভিন্ন রকম ব্যায়ামের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত বলশালী হয়ে উঠেছিলেন। খেলাধুলাতেও তাঁর বিশেষ উৎসাহের সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতার বিখ্যাত টাউন ক্লাবে তিনি ক্রিকেট খেলতেন এ তথ্যও পাওয়া যায়।

বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায় অম্বু গুহর ব্যায়ামাগারে দেহ চর্চা করে সুস্বাস্থ্য লাভ করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিক্রমপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের সম্পাদক হিসাবে খেলাধুলার প্রসারে ও সংগঠনের কার্য করেছিলেন। তিনিও টাউন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবত নিজেও ক্রীড়াবিদ ছিলেন। প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুও সুদক্ষ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ছিলেন।

এছাড়া, তৎকালীন বিপ্লবীদের গুপ্ত আখড়ায় কুস্তি, যুযুৎসু, লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দেওয়া হতো। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি নিজে অতিশয় ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং নিজে একটি কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। তিনি নিজে হা-ডু-ডু ও সাঁতারে দক্ষ ছিলেন।

কবি নজরুল ইসলাম ও কবি জীবনানন্দ দাশও ক্রীড়া দক্ষ ছিলেন। নজরুলের ফুটবলে এবং জীবনানন্দের ক্রিকেটে পারদর্শিতা ছিল অধিক। নজরুল ইসলাম লাঠি চালনা ও মুষ্টিযুদ্ধেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। জীবনানন্দ তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা "বনলতা সেন"-এ বনলতা সেনকে

"নাটোরের বনলতা" বলে উল্লেখ করেছেন। নাটোরের মহারাজার প্রবল ক্রিকেট-প্রীতি সুবিদিত। হয়তো বা, কবি ও মহারাজাকে কাছাকাছি এনে দিয়েছিল উভয়ের ক্রিকেটের আকর্ষণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি বাড়ীর পাঠশালাতে যেমন লেখাপড়া করতেন তেমনি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করতেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮১৭ সালে। ঐ কালে কলকাতায় যুবকরা খেলাধূলার চেয়ে ফুলবাবু সেজে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে বেশি পছন্দ করতেন। শরীর চর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল না বললেই চলে। সেই সময় ঠাকুর বাড়িতে কিছু কিছু শরীর চর্চা প্রচলিত হয়েছিল। এ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে একটি কুস্তির আখড়া খুলেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কুস্তি করে শরীর গঠন করতেন।

ঠাকুর বাড়ীর শারীর শিক্ষা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্যায়াম করে সুগঠিত দেহের অধিকারী হয়েছিলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি কুস্তি ও লাঠি খেলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের লাঠির শিক্ষক ছিলেন এক মুচি লাঠিয়াল। রবীন্দ্রনাথ পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কীভাবে তিনি এই লাঠিয়ালকে অভিনন্দন জানাবেন। মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতেন। তৎকালীন সমাজে এ ঘটনা পরমাশ্চর্য ব্যাপার ছিল।

ঐ সময়ে ভদ্রপরিবারের রমণীদের বাড়ীর বাইরে আসা এক রকম নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল বলা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক জগতের আলো এসে ঠাকুরবাড়ী পড়ার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে অশ্বারোহণ শিখিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে জোড়াসাঁকো থেকে দু'টি আরবি ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে ছুটে বেড়াতেন।

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ শরীর চর্চায় ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে সকলের চেয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথও কম যেতেন না। তিনি তাঁর "আমার বাল্যকথা" গ্রন্থে লিখেছেন "ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চার অভাব ছিল না।···তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া এসব ছিল। হীরা সিং বলে এক পালোয়ানের কাছে আমরা কুস্তি শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুর ভাঁজা—কত রকম কুস্তির দাঁও, মার প্যাঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তিতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম।" রবীন্দ্রনাথের শারীর শিক্ষার

প্রতি অনুরাগের কথা সম্ভবত কারো অজানা নয়। তার পুত্র রথীন্দ্রনাথ নিজের স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক কান চোখ ও অবয়ব মাত্রেরই খুব চর্চায় প্রয়োজন আছে—বাবা বিশ্বাস করতেন। ছেলেরা ডানপিটেমি করলে তিনি ভয় পেতেন না, কখনো শাসন করতেন না। সেই অল্প বয়স থেকেই আমার স্বাধীনতা ছিল যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া, লাঠি সড়কি খেলা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি সবরকম খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ করার।...বাবা আমাকে নিজেই সাঁতার শিখিয়েছিলেন।"

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানের বিখ্যাত জুজুৎসু ও জুডো প্রশিক্ষক তাকাগাকিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন দু'বছরের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একবার মোহনবাগানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য। তাঁর ঘরে চায়ের নিমন্ত্রণে মোহনবাগান দল ঢুকতেই তিনি বলে উঠেছিলেন, "কই, তোমাদের গোষ্ঠপাল ? যার নাম ইংরেজরা দিয়েছে চাইনিজ ওয়াল ? সে এসেছে তো ? গোষ্ঠপালকে দেখে বললেন, "হ্যাঁ চাইনিজ ওয়ালই বটে।" তোমাকে আশীর্বাদ করছি।"

ঠাকুরবাড়ী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যুগ থেকেই বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের রীতিনীতি বিষয়ে সমসাময়িকতার বেড়া ডিঙিয়ে অন্তত একশো বছর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরীর চর্চা ও শরীর গঠনের প্রতি মনোযোগ ছিল ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের। প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে প্রায় তিন মাইল হাঁটা, সকালে পড়াশুনার পর পুকুরে সাঁতার কাটা, বিকেলে প্যারালাল বার, হরাইজন্টল বারের নানা ব্যায়ামের পর পালোয়ান হীরা সিং-এর কাছে কুস্তি শিক্ষা—এগুলি ছিল তাদের নিত্য অভ্যাসের অন্তর্গত।

শরীর চর্চা কখনই শুধুমাত্র দেহগঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অনেকগুলি মানসিক বৃত্তির উন্নতি সাধনও এর উদ্দেশ্য।

বাংলার ব্রতচারী

অতএব, আমরা শিক্ষা বলতে ব্যাপক অর্থে যা বুঝি শারীর শিক্ষা অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত।

ব্রতচারী এমনই একটি শিক্ষা যা শরীর ও মনকে সমান্তরাল রেখায় উন্নত করতে নিবিড়ভাবে সহায়তা করে। নৃত্য-গীত সহযোগে যে ব্যায়ামগুলি ব্রতচারী শিক্ষার অঙ্গ সেগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শরীর গঠনকারী ও মানবিকতার মহৎ আদর্শের দ্বারা মণ্ডিত। ব্রতচারীর

আদর্শের মধ্যে একটি সুন্দর জীবন-পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রচলিত ব্রতচারী শিক্ষা ইংরেজ শাসিত ভারতে প্রথম দেখা যায়। যেহেতু এর সংগীতগুলি সবই বাংলা ভাষায় রচিত সেই কারণে বাঙ্গালীদের মধ্যেই ব্রতচারী শিক্ষা মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য গানগুলি সবই হিন্দীতে ভাষান্তরিত হওয়ার বাংলার বাইরেও ব্রতচারী শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে।

বাঙ্গলার শহর, গ্রাম, গঞ্জ সর্বত্র ব্রতচারী প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে কয়টি শারীর শিক্ষাদানের মহাবিদ্যালয় আছে তার সব কয়টির শিক্ষাক্রমের মধ্যেই ব্রতচারী কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ব্রতচারী শিক্ষাদানের জন্য বাংলার ব্রতচারী সংস্থা থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ব্রতচারীতে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী উভয় প্রকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা বিদ্যালয় সহ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাবে ব্রতচারী শিক্ষাদান করেন।

ব্রতচারী শিক্ষা দীর্ঘকাল ব্যাপি বাংলার জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু বাঙ্গলার বাইরে নয় ভারতের বাইরেও ব্রতচারীর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।

ব্রতচারী-নৃত্যের মধ্যে যেমন বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের নৌকা বাওয়ার ভঙ্গী, কোদাল চালোনোর ভঙ্গী আছে তেমনি আছে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এবং মানসিংহের সৈন্যদের যুদ্ধের ভঙ্গীও আছে। ব্রতচারীর যে কোনও পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান দেখলেই অনুভব করা যায় কী মহান্ আদর্শ কী অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী, কী ব্যঞ্জনাপূর্ণ সংগীত রচনা, কী বিজ্ঞানসম্মত শরীর গঠনের ব্যায়াম দ্বারা পরিপুষ্ট এই শিক্ষা!

ব্রতচারীর স্বরূপ কী? কী এর উদ্দেশ্য? এ সম্পর্কে ব্রতচারীর স্রষ্টা গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন—

"মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক, সফল ও পূর্ণতাময় করে তোলবার অভীষ্ট সিদ্ধি করবার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করা হবে তাকে আমরা পাঁচ ভাগে অথবা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রতে বিভক্ত করেছি। সেগুলি এই: জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। ব্রতচারীর এই পাঁচটি ব্রত, অথবা পঞ্চব্রত এই পাঁচটি ব্রতের সমষ্টিকেই আমরা মানুষের পূর্ণাদর্শের জীবন ব্রত বলে ধরে নিতে পারি। যিনি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন এবং পাঁচটি এক সঙ্গে পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন ও জীবনে কায়মনোবাক্যে এই পঞ্চব্রত পালন করবার জন্য সরলভাবে

আচরণ করে থাকেন, সেই পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকাকেই আমরা বলি ব্রতচারী।"

ব্রতচারীর এগারোটি পণ আছে। সেগুলি নীচে দেওয়া হলো ঃ—

ছুটবো খেলবো হাসবো
সবায় ভালো বাসবো
গুরুজনকে মানবো
লিখবো পড়বো জানবো
সত্য কথা বলবো
সত্য পথে চলবো
হাতে জিনিস গড়বো
শক্ত শরীর করবো
দুলের হয়ে লড়বো
গায়ে খেটে বাঁচবো
আনন্দেতে নাচবো।

ব্রতচারীর দৈনিক কৃত্য হলো—
খেলাধুলো ব্যায়াম ও নৃত্য
দৈনিক ব্রতচারী কৃত্য।

চীন

পাঁচ হাজার বছরেরও অধিক পুরাতন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অবদানে চীন সমৃদ্ধ। এদিক দিয়ে চীন সহজেই ভারতবর্ষ ও মিশরের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে এবং এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক অনন্য সাধারণ
চীন
আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিচয় বহন করছে। এই শক্তির উৎস হয়তো তার পরিবার ও সমাজ গঠনের দৃঢ় ও সংহত বন্ধন এবং সর্বদা মানবিক আদর্শের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার মহৎ প্রয়াস। প্রাচীন চীনের মহা-মান্য দার্শনিক কনফিউসিয়াস মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও ক্ষমার আদর্শ প্রচার করেন এবং আত্মসংযম ও সহনশীলতা অভ্যাস করার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেন। কনফিউসিয়াসের সমকক্ষ আরেক মনীষী লাও-সে মানুষকে বিলাসবর্জিত সহজ জীবন যাপন ও সংচরিত হবার জন্য আহবান জানান। অবশ্যই প্রাচীন কালে চীনে ধর্ম ও দর্শনের কথাই বেশি শোনা যেত। তবে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা যে অবহেলিত ছিল একথা মনে করার কোনও কারণ নেই কেননা খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দু'-হাজার ছয়শত বছর পূর্বেও সমাজে প্রচলিত ছিল বাহু ঊর্ধে উত্তোলন করে দেহকাণ্ড বাঁকানো ও ঘুরানো আর উপবিষ্ট অবস্থায় কয়েকরকম শারীর ক্রিয়া ও তৎসহ নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যায়ামগুলির নাম কং ফু ব্যায়াম।

পরবর্তী কালে, সম্ভবত যীশুখৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে চৈনিক চিকিৎসক হুয়া-তো মানব দেহে পটুতা ও সচলতা সঞ্চারের জন্য কয়েক প্রকার অভিনব শারীর ক্রিয়া প্রবর্তন করলেন, যে-গুলির মধ্যে ছিল বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, বানর প্রভৃতি জন্তুর চলা-ফেরা-দৌড়, লাফ দেওয়া, দোল খাওয়া ইত্যাদি ভঙ্গীর অনুকরণ। পাখীর ডানা বন্ধ করা ও মেলে ধরার অনুকরণ সহ দৌড়ও ছিল এর মধ্যে।

মানবদেহকে সুস্থ সবল ও সচল রাখার জন্য এই জাতীয় ব্যায়ামগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন যুগের চীনের শারীর শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব ও সুচিন্তিত মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

এছাড়া, আনন্দ বর্ধন ও অবসর যাপনের জন্য ছিল ঘুড়ি ওড়ানো,

ছোট ছোট লাঠি সহযোগে নানারকম নৃত্য। এই নৃত্য ছিল চীনের বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। আর সামরিক শিক্ষার অঙ্গ ছিল ধনুর্বিদ্যা ও অশ্বারোহণ। এ দুটি বিষয়ে পারদর্শিতার উপর সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ বিজয় অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

এরাজ আহমেদ খাঁ-এর শারীর শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বাটিং, জুজুৎসু, পোলো, মুষ্টিযুদ্ধ এবং ফুটবল খেলা প্রাচীন কালে চীনে বেশ প্রচলিত ছিল তবে স্বভাবতই তার নিয়মকানুন বর্তমানের সঙ্গে অনেকটাই মিলবে না।

বাটিং খেলা

খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ সালে বাটিং খেলা এখানে প্রথম প্রচলিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোনও জন্তুর চর্মে দেহ আবৃত করে এবং তাদের শৃঙ্গযুক্ত মাথা নিজেদের মাথায় লাগিয়ে মুখোসধারী হয়ে পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে সুরু করতো এই খেলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ধাক্কাধাক্কি পরিণত হতো প্রচণ্ড মারামারিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের রক্তে ক্রীড়া প্রাঙ্গণ মাখামাখি হয়ে যেত। মাঝে মাঝে এই লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা একক না হয়ে জোড়ায় আবির্ভূত হতো একজনের কাঁধে অপরজন চড়ে। লড়াইকে আরও চিত্তাকর্ষক করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রথা ছিল।

এই বিবরণ পাঠে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কি এই বাটিং খেলা প্রাচীন রোমের গ্ল্যাডিটোরিয়াল কম্ব্যাটেরই রূপান্তর ?

জুজুৎসু

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতানুসারে জুজুৎসুর প্রথম আবির্ভাব জাপানে নয়, চীনে। যদিও এর নাম তখন জুজুৎসু ছিল না এবং প্যাঁচের রীতিতেও ছিল অনেক পার্থক্য, যেমন লাথি মারা ও সজোরে ধাক্কা দেওয়া আইন সঙ্গত ছিল। তথাপি, মোটামুটি ভাবে সে লড়াই জুজুৎসু ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

মুষ্টি যুদ্ধ

তৎকালীন যুগে যুদ্ধে যেহেতু বাহুবলের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম এই জন্য সৈনিকদের মুষ্টিযুদ্ধের শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্বৈত কিংবা দুই দলে মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল সৈনিকদের সামরিক শিক্ষার কর্মসূচীতে। চীনে এ খেলার নাম ছিল তখন উসু। উসু খেলার রকম ভেদও ছিল। মুষ্টি যুদ্ধ আর মল্লক্রীড়ার সমন্বয়েও উসু খেলার প্রচলন ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানার বদলে থাকতো লাঠি। এ খেলার কৌশলের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। কখনও প্রতিপক্ষকে দ্রুত আঘাত করেই পিছিয়ে আসা অথবা

পাশে সরে যাওয়া। আবার জাপ্টে ধরার কৌশলও ছিল। স্পষ্টতই, প্রথমটি মুষ্টিযুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি মল্লক্রীড়ার পদ্ধতি বলে অনুমিত হয়।

বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মুষ্টি বা উসু শিক্ষায় রপ্ত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবত, দুর্বৃত্তকারীদের হাত থেকে মঠ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বাধ্য হয়ে অহিংসার উপাসকদের এই যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়েছিল।

একদা চীনে লোম ভর্তি চামড়ার বল দিয়ে যে খেলাটি প্রচলিত ছিল তাকে ফুটবল বলতে অসুবিধা হয় না।

ফুটবল

চীনে ফুটবল খেলার আকর্ষণ আজকের নয়, চিরকালের। একবার মঙ্গোলিয়াতে যুদ্ধরত সৈন্যরা খাদ্যের অভাবে খুবই নিরুৎসাহ হয়ে পড়াতে সেনাপতি তাদের অবসর সময়ে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার মনের উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাস্তবিকই, ফুটবল এক মন পাগল-করা খেলা। মনকে যেমন ভোলায় তেমনি জাগায়।

প্রাচীন চীনের কবিরাও ফুটবলকে ভালোবেসেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কবি লি-ইউ ফুটবল খেলার মধ্যে যে মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ দেখা যায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক অতুলনীয় কবিতা রচনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলায় যে আদর্শ প্রচারিত হয় তার সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ এবং গ্রন্থকার কর্তৃক সেই ইংরেজির বাংলায় ভাষান্তর—উভয়ই নীচে লিপিবদ্ধ করা হলো।

A round ball and a square wall,
The ball flying across like the moon,
While the teams stand opposed,
Captains are appointed to take their places.
No allowances are made for relationship,
According to unchanging regulations,
There must be no partiality.
But there must be determination and coolness,
Without the slightest irritation at failure.
And if all this is necessary for football,
How much more for the business of life ?

গোলাকার বল, পূর্ণচন্দ্রের মতো বল,
চতুষ্কোণ গোল-দেয়ালে দ্রুত চলাচল।
মুখোমুখী দুই পক্ষ প্রতিযোগিতায় মত্ত,
কর্তব্য সাধনে মাঠে নায়কদ্বয় নিযুক্ত।
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দুর্বলতা ও পক্ষপাতিত্ব
হলেও বা তারা প্রিয়তম কিংবা রক্ত-সম্পর্কিত।
থাকবে—অটল আত্মপ্রত্যয়, নির্বিকার নিরুত্তাপ,
থাকবে না—পরাজয়েও বিন্দুমাত্র প্রকোপের ছাপ।
হয় যদি এই সব ফুটবলের অঙ্গের অলংকার,
জীবনকে হিরণ্ময় করতে আর কি কিছু দরকার ?

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নানা দিকে সহজে বাঁকানো, দ্রুত লাফানো, নানারকম ভারসাম্যের ব্যায়াম ইত্যাদি জিমনাস্টিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মতো চীনেও জিমনাস্টিকের জন্ম সুদূর অতীতে। খুবই বিস্ময়ের কথা, প্রাচীন কালে চীনের সমাধিস্তম্ভের গায়ে নানাপ্রকার জিমনাস্টিকের অঙ্গভঙ্গী খোদিত আছে। ভারসাম্য, পিরামিডের ভঙ্গী ও অন্যান্য দেহভঙ্গী তার মধ্যে দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সমাধিগুলি উদ্ধার করে চীনের প্রাচীন শারীর শিক্ষার একটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

জিমনাস্টিক

চীনের প্রাচীন লেখকরাও লিপিবদ্ধ করেছেন ডিগবাজি খাওয়ার নানা ভঙ্গী ও হাতের উপর ভর করে পা'দুটি উপর দিকে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম হ্যান বংশের রাজত্বকালে মাটির তৈরি বাসনপত্রের গায়ে বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গী ও জিমনাস্টিকের কৌশলের ছবি অংকিত আছে।

বর্তমান যুগে চীনে জিমনাস্টিকের যে অসামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তার প্রেরণার উৎস শারীর শিক্ষায় পুরাকালের এই ইতিহাস।

চীনের শারীর শিক্ষার প্রাচীন ইতিহাসে ঝিয়াংপু নামে এক রকমের কুস্তির উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৬৬ অব্দে জো রাজবংশে এই কুস্তির প্রচলন ছিল। এই ঝিয়াংপুর জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের কুইং রাজবংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

ঝিয়াংপু কুস্তি

রাজদরবার ছাড়িয়ে ঝিয়াংপু জনসাধারণের মধ্যেও নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছিল।

মাণ্ডু ভাষায় ঝিয়াংপুর কুস্তিগীরদের বলা হতো বুকু। এই কুস্তিতে

যে পারবে বিপক্ষকে উঁচুতে তুলে নিয়ে তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে সেই বিজয়ী ঘোষিত হবে। বুরুদের পোষাক ছিল এই রকম—ঢলঢলে সাদা জামা, সেটা কোমরে কটিবন্ধ দিয়ে বাঁধা আর গ্রীকো রোমান কুস্তিগীরদের মতন হাঁটু পর্যন্ত বুট জুতোর মধ্যে ঢোকানো থাকতো পরনের পায়জামা।

মহাদেশের মতো বৃহৎ চীনদেশের সর্বত্র এই ঝিয়াংপু কুস্তির পদ্ধতি একরকম ছিল না। জয় পরাজয়ের নির্ধারণ রীতিও ছিল পৃথক। কোনও কোন স্থানে নিয়ম ছিল যে, বিপক্ষের মাথা ও কাঁধ মাটিতে স্পর্শ করাতে পারলে তবেই হবে জিৎ। এই জাতীয় কুস্তিগীরদের পোষাক ছিল শুধু-মাত্র হাফ প্যাণ্ট।

চীনের প্রাচীন শারীর শিক্ষার ইতিহাসে ইংগং নামে একটি শক্তি-সমৃদ্ধ ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা ভাষায় "ইং" শব্দের অর্থ ইং গং দেহবল এবং "গং" বলতে বোঝায় নৈপুণ্য বা কৌশল। সপ্তম শতকের তাং রাজবংশের রাজত্বকালের ইতিহাসে বো-তং নামে এক ইং গং-এ বিশেষ দক্ষ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যাঁর অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তি থাকার দরুণ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মল্লবীররা তাঁকে রীতিমত ভয় ও ভক্তির চোখে দেখতেন।

একবার বো-তং তাঁর দেহবলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার জন্য চীনের শ্রেষ্ঠ তিনজন মল্লবীরকে এক অদ্ভুত খেলায় আহবান জানালেন। তিনি নিজের বিছানায় একটি শক্ত ও মজবুত বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং ঐ তিন বিশাল দেহধারী মল্লবীরদের তাঁর মাথার তলা থেকে বালিশটি টেনে বার করার জন্য আহবান করলেন। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঐ তিন বীর বিফল হলেন। তাঁর মাথার চাপ মুক্ত করে বালিশ টেনে আনতে পারলেন না। এ খেলাটি ছিল ইং গং খেলার অন্যতম কৌশল।

অষ্টম শতাব্দীতে তাং বংশের আর একজন সম্রাটের রাজত্বকালে ওয়াংজি নামে ইং গং পারদর্শী অপর এক ব্যক্তি ছিলেন।

ওয়াং-জি-র একটি বিস্ময়কর খেলা দেখে সকলেই অবাক হয়ে যেতো। তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবেন এবং তাঁর পিঠের উপর একটি বিশালাকৃতি চেপ্টা পাথর রেখে তার উপর কয়েকটি কাঠের খুঁটি দিয়ে কুড়ি ফুট উঁচুতে একটি মঞ্চ বানানো হবে এবং সেই মঞ্চের উপর আরাম

করে বসে একদল সঙ্গীতজ্ঞ কনসার্ট বাজাবেন। যতক্ষণ বাজনা বাজবে ততক্ষণ ওয়াং-জি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকবেন।

ওয়াং-জি তাঁর অসামান্য শারীরিক বলের জন্য রাজার সৈন্যদলে সেনাপতির পদ পেয়েছিলেন। চতুর্দশ শতকে ঔ-কিয়ংজিন নামে অপর এক ইং গং-এর দক্ষ বৃদ্ধ বয়সে একবার বনপথে অশ্বারোহণে যাবার সময়ে সম্মুখে একটি সরু সেতু পড়ে। তাঁর অশ্ব ঐ সরু পথে তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে ভয় পাওয়ায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দু'হাত দিয়ে ঘোড়াটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেতু পার হয়ে গিয়েছিলেন।

দূর পাল্লার দৌড়

দূরপাল্লার দৌড় যে মানুষকে অসামান্য শারীরিক সামর্থ্য এনে দেয়, শরীরের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেলেও তার দেহ অটুট রেখে দেয় এ তথ্য সুপ্রাচীন কালেও চীনের রাজাদের অজানা ছিল না। এই কারণেই খ্রীষ্টপূর্ব অন্তত অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্বের চীনা সম্রাটরা তাঁদের সৈন্যবাহিনীকে দূর পাল্লার দৌড়ে অভ্যস্ত করাতেন।

উয়ুর রাজা তাঁর সমগ্র বাহিনীকে সবরকম যুদ্ধাস্ত্র সমেত দূরপাল্লার দৌড় অনুশীলন করাতেন। একবার কোনও এক বিবাদের ফলে উয়ুর রাজা চুয়ুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। চুয়ুর সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও উয়ুর ক্ষীপ্রগতির সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। উয়ুর রাজা চুয়ুর রাজ্য দখল করে নিলেন। দূরপাল্লার দৌড় বিজয়ী সৈন্যদের এনে দিয়েছিল অফুরন্ত দম অর্থাৎ ফুসফুসের শক্তি আর শরীর সঞ্চালনে তীব্র তৎপরতা। তৎকালীন মুখোমুখী যুদ্ধে এগুলি ছিল সৈন্যদের অতিরিক্ত অস্ত্র। এ অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্রও বলা যায়।

উয়ুর রাজার সমকালীন যুগেই আর একটি রাজ্য ছিল, তার নাম উই রাজ্য। সেখানকার সেনাবাহিনীতে দৌড় ছিল একটি নিত্য আবশ্যিক কর্ম। তাদের যুদ্ধকালীন পোষাক ছিল আপাদমস্তক আবৃত গণ্ডারের পুরু শক্ত চামড়ায় ভারি জামা। তাদের ট্রেনিং-এর সময়ে প্রতিদিন ভোর বেলা দৌড় সুরু করে মধ্যাহ্নের পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতে হতো। দৌড়ের সময় তাদের শরীরে থাকতো ঐ পোষাক, কোমরের কটিবন্ধে তরবারি, হাতে ধনুক, ৫০টি তীরসমেত পিঠে তূণ এবং খাবার সমেত ব্যাগ।

এই কঠোর সামরিক ট্রেনিং-এ সাফল্য অর্জনকারীদের পুরস্কার ছিল

গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়—ভূমি ও গৃহ।

ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কুবলাই খাঁ তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে "গুই চি" নামে একদল রাজ-প্রহরী তৈরি করেছিলেন। মঙ্গোলীয় ভাষায় গুই চি বলতে বুঝায় দ্রুতগামী। প্রতি বছরে একবার অনুষ্ঠিত দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় তারা অংশ গ্রহণ করতো। বিজয়ীরা নানাভাবে পুরস্কৃত হতো। প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার ছিল একটি ভারি রূপার বাঁট, দ্বিতীয় পুরস্কার পোষাক তৈরি করার জন্য চারটি মূল্যবান কাপড়, তৃতীয় পুরস্কার পোষাক তৈরি করার জন্য তিনটি মূল্যবান কাপড় এবং বাকিদের জন্য একটি পোষাক তৈরির কাপড়।

চীনা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নব্য প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত অনেকগুলি তীরের অগ্রভাগ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছেন যেগুলি পাথর এবং হাড়ের তৈরি। বন্য জন্তু শিকার এবং যুদ্ধের জন্যই সম্ভবত সেগুলি ব্যবহার করা

তীরন্দাজী

হতো। অগ্রভাগগুলি ছিল গাছের ডাল থেকে নির্মিত তীরের সঙ্গে। চীনের প্রাচীন ইতিহাস-কাহিনীতে সেই ধনুকের প্রচণ্ড টংকার ধ্বনির উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছর পূর্বে চীনদেশের সৈনিকদের হাতে থাকতো তীর ধনুক। এটাই ছিল তাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। এই সময়েই প্রচলিত হয় এর চেয়ে বড় আকারের আড়াআড়ি একরকম ধনুক। তীরন্দাজরা দুই পা দিয়ে সেই ধনুক ভূমিতে চেপে ধরে দুই হাতের সাহায্যে টেনে নিয়ে গুণ পরাতো। যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন ছিল এই রকম ভাবে গুণ পরাতে। স্বভাবতই, এই ধনুকে নিক্ষিপ্ত তীর আরও বেগে ছুটতো এবং আরও দূরে পৌঁছাতো। হরিণ থেকে বাঘ শিকার পর্যন্ত চলতো এই ধনুকে।

মধ্যযুগে মিং বংশের রাজত্বকালে নৌকা চালনা সম্পর্কে প্রকাশিত

নৌকা-চালনা

একটি গ্রন্থে তৎকালীন প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী, চালকেরা কে কোথায় বসবে, নৌকার আকৃতি কিরকম হবে সেগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সেই সঙ্গে প্রতিযোগীদের জন্য নানারকম পরামর্শ ও উপদেশও দেওয়া আছে।

ঐ যুগে নৌকাচালনা প্রতিযোগিতায় চালকেরা নিজেদের দক্ষতা ও শারীর ক্ষমতা দেখিয়ে জনসাধারণের অশেষ প্রশংসা লাভ করতেন। নদীর দুই তীরে অগণিত দর্শকেরা নিজ নিজ দলকে নানারকম ধ্বনি দিয়ে উৎসাহ

দান করতেন।

প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোনও কোনও সময়ে দিনের আলোর বদলে রাত্রির অন্ধকারে নৌকা নামানো হতো জলের বুকে। নৌকাগুলিকে প্রায় আগাগোড়া ছোট ছোট লণ্ঠনের আলোয় মুড়ে দেওয়া হতো। নৌকার দোলার সঙ্গে দুলতো লণ্ঠনের আলো। অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোকোজ্জ্বল সারি সারি নৌকোর ধেয়ে চলা—আলোয় চালকদের একত্রে দাঁড় টানা—তাদের বাহু ও পিঠের পেশীর ওঠা-নামার ছন্দ—আলোর মালার এগিয়ে যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—নদীর দুই তীরে দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি—সব মিলিয়ে সেই পরিবেশ যেন এক স্বপ্নলোকের রূপ ধরতো।

ঘোড়ায় চড়ে এক হাতে তলার দিকটা বাঁকানো লাঠি দিয়ে বল ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গোলে পাঠানোর খেলার নাম পোলো খেলা। প্রাচীন চীনে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতকে জিজু নামে একরকমের খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার সঙ্গে পোলো খেলার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। পরবর্তী কালে সপ্তম শতকে তাং রাজত্বকালে চীন দেশে এই খেলার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত, তখন পারস্য থেকে তিব্বত অতিক্রম করে পোলো চীনে প্রবেশ করে। তিব্বতেও ছিল পোলো খেলা। তবে নামে ছিল কিঞ্চিৎ তফাৎ। তিব্বতে একে বলা হতো পুলু।

পোলো খেলা

কথিত আছে, একজন চৈনিক রাজার পোলো-প্রীতির এমনই আধিক্য ছিল যে, তাঁর এই খেলায় পক্ষপাতিত্বের প্রতি কটাক্ষ করার অপরাধে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে আরেকজন নৃপতি তাঁর নিজস্ব পোলো খেলার মাঠটিকে বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই দেবার অভিপ্রায়ে সেখানে বালি ফেলে তারপর একরকম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাত্রিকালেও পোলো খেলার আসর বসাবার জন্য মাঠের চতুর্দিকে সহস্রাধিক মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতেন। ঘোড়ায় চড়ে এই খেলাটি অবিলম্বে চীনের সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের ট্রেনিং-এর অঙ্গীভূত হলো। যারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখালো পোলো খেলার মাঠে তারা সামরিক বাহিনীতে উচ্চপদে উন্নীত হলো।

রাজবংশের ব্যক্তিদের মধ্যে এই খেলা বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ায় পোলো খেলার অধিকাংশ মাঠগুলিও তৈরি হলো রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে। চীন দেশেরতাং রাজবংশ, সং রাজবংশ এবং মিং রাজবংশের রাজত্বকালে

কয়েকটি বিখ্যাত পোলো খেলার মাঠ তৈরি হয়। চতুষ্পার্শ্বের পরিমন্ডল এবং সুন্দর সমতল ভূমি এই মাঠগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এগুলি পোলো খেলার আদর্শ মাঠ হিসাবে বিবেচিত হতো।

কয়েকটি গ্রামীণ ক্রীড়া

গ্রামীণ প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার চমৎকারিত্ব। এতে অংশগ্রহণকারী ও দর্শক উভয়ই আনন্দের অংশীদার হয়। এ-ছাড়া, অন্যান্য সব খেলার মত এতেও শরীরকে সচল করে ও বল যোগায়।

অ্যামোডো খেলা

অ্যামোডো একটি গ্রামীণ ক্রীড়ার নাম। এই খেলার ধরণটি অনেকটা ব্যাডমিন্টনের মতন। তিনটি মুরগীর পালক দিয়ে তৈরি সাটল ককের মতন আকৃতির বলের সাহায্যে খেলাটি হয়। দু'ধারে খেলোয়াড় থাকে দুই বা ততোধিক। মাঝখানে জালের মতনই একটি জিনিস থাকে দু'পাশের খুঁটিতে বাঁধা। তবে ব্যাডমিণ্টনের মতন র‍্যাকেট ব্যবহার হয় না এই খেলায়। তার পরিবর্তে হাতের চেটো দিয়ে মেরে বল বিপরীত কোর্টে পাঠানো হয়।

চীন দেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে কু-কং অঞ্চলে এই অ্যামোডো খেলাটির প্রচলন আছে। সেখানে সামাজিক উৎসবে নৃত্যগীতের পরে এই খেলাটি হয়।

গদা নিক্ষেপ

দক্ষিণ পশ্চিম চীন দেশের ইউনান প্রদেশেও কয়েকটি গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় যেগুলি অনেক প্রাচীন যুগ থেকে পল্লীর জনজীবনের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে গদা নিক্ষেপ, তীর নিক্ষেপ ও তরবারিসহ নৃত্য এই তিনটি খেলা বিশেষ জনপ্রিয়। গদা নিক্ষেপ খেলার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ১০ মিটার দূরে পোঁতা কয়েকটি ছুঁচালো লাঠিকে ছোট আকারের কাঠের গদা নিক্ষেপ করে ভূপাতিত করা হয়। যে খেলোয়াড় যতো অধিক সংখ্যক লাঠি ভূপাতিত করতে সক্ষম হবে, সেই-ই হবে জয়ী।

তীর নিক্ষেপ

তীর নিক্ষেপের খেলায় দুটি বাঁশের তীর কোণাকুণি ভাবে মাটিতে পুঁতে একটি ত্রিভুজ তৈরী করা হয় এবং প্রায় ৭৫ মিটার দূর থেকে তার মধ্য দিয়ে তীরন্দাজেরা তীর নিক্ষেপ করে। যে তীরন্দাজের তীর বেশি বার লক্ষ্যভেদ করে তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। লিসু অঞ্চলের পল্লীবাসীদের মধ্যেই এই খেলাটি বেশি জনপ্রিয়।

তরবারি নৃত্যের খেলাটি জিং পো জাতির সামাজিক উৎসবের প্রিয় অনুষ্ঠান। ডিম্ ডিম্ প্রবল শব্দে অতিশয় দ্রুতলয়ে ড্রামের বাজনার

তালে তালে যখন তরবারি হাতে নিয়ে উদ্দাম নৃত্য সুরু হয় তখন সমবেত দর্শকরাও আর নীরব থাকতে না পেরে তাদের সঙ্গে খালি হাতেই নৃত্য সুরু করে দেয়। প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ সেই দৃপ্ত নৃত্য চীনের গ্রামীণ ক্রীড়াকে সবিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে। গ্রামীণ ক্রীড়া যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি বহন করে এই নৃত্য তার উজ্জ্বল সাক্ষী।

তরবারি নৃত্য

দক্ষিণপশ্চিম চীনের ইউনান, সিচুয়ান এবং গুইঝু প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে ইয়ি জাতির লোকেদের মধ্যে কুস্তির অসামান্য গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, তাদের বিবাহ বাসরেও কুস্তি প্রবেশ করেছে। বরকে তো ভাল মল্লবীর হতেই হবে, বরের যে বন্ধুরা তার সঙ্গে আসবে তাদেরও কুস্তিতে দক্ষতা থাকা চাই। কন্যা পক্ষের দলেও মল্লবীরের ছড়াছড়ি। প্রথমে কন্যাপক্ষ থেকে একজন মল্লবীর আহ্বান জানায় বরপক্ষের মল্লবীরদের মধ্যে যে কোনও একজনকে। পূর্বপরিকল্পনা মতো তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে সুরু করে লড়াই। কয়েকবারের লড়াইতে দু'পক্ষই অন্তত দুই একবার স্বেচ্ছায় হার মেনে নেয়। দুই পরিবারের নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনের এটাই হলো রীতি বা ইঙ্গিত।

বিবাহে কুস্তি

তারপর সুরু হয় দু'জন শ্রেষ্ঠ মল্লবীরের প্রদর্শনী কুস্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর সর্বশেষে সুরু হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় লড়াই। তাতে থাকে বর এবং কন্যাপক্ষের মনোনীত দুই বলবান মল্লবীর। অবশ্য, এই লড়াইয়ে জয়পরাজয় বড়ো কথা নয়। তবে কণের সামনে এই ভাবে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে হয়।

ইয়ি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে প্রায়ই বলাবলি হয় যে, কুস্তি না জানা থাকলে সে কিসের মরদ! বিবাহ করতে হলে পুরুষকে মল্লবীর হওয়া দরকার। অর্থাৎ বরকে বীর হতেই হবে।

চীনের উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চলে গুয়াংডং প্রদেশে কয়েক রকমের ক্রীড়া প্রচলিত আছে যেগুলিতে শারীর পটুতা ও শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। সূক্ষ্ম কৌশলের স্থান সেখানে কম দেখা যায়।

কয়েকটি পার্বত্য ক্রীড়া

সুপারি গাছের সমান উঁচু কাঠের গোলাকার কতকগুলি খুঁটি সারিবদ্ধ ভাবে মাটিতে পুঁতে প্রতিযোগীরা সেগুলি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে আবার দ্রুত নেমে আসে। এই ওঠা-নামার কাজটি যার সবার আগে সমাপ্ত হবে তাকেই এক নম্বর বিজয়ী বলা হয়। এই কাঠের খুঁটিগুলি

এতো মসৃণভাবে পালিশ করা থাকে যে সেগুলি বেয়ে ওঠা বাস্তবিকই রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

আর একটি খেলা হলো খুব পুরু পরিধির একটি গাছের ডালকে দু'ধার থেকে দু'জনে ঠেলবে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দুই প্রতিযোগী ডালটিকে ঠেলে পরস্পরকে পিছনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, সফল ব্যক্তিই জয়ী ঘোষিত হয়।

এই পার্বত্য প্রদেশের শিশুরা গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের ঝর্ণার জলে লাফালাফি করে, স্নান করে আর পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে জলের মধ্যেই দৌড়ে পালায়। পাহাড়ের কোল তখন ঐ শিশুদের কলরবে এক নতুন প্রাণ পায়।

পুরানো যুগকে পিছনে ফেলে চীন যখন আধুনিক যুগে পদক্ষেপ করলো তখন পশ্চিম জগতের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই হলো। ইউরোপ আমেরিকার কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক চীনা ছাত্র ভর্তি হলো জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। তারা দেশে ফিরলো শিক্ষা সম্পর্কে নব নব চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হয়ে। পরিবারে ও সমাজে তার সূক্ষ্ম প্রভাব পরিলক্ষিত হলো কিছুদিনের মধ্যেই। সেই সঙ্গে চীনের নজরে পড়লো স্বল্প সময়ে প্রতিবেশী জাপানের অসামান্য প্রগতি। চীনকে আধুনিকীকরণে ওয়াই, এম, সি, এ-র অবদানও কম নয়। ওয়াই, এম, সি, এ-র মিশনারি স্কুলগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে শারীর শিক্ষাদান প্রচলিত হলো। অন্যান্য কয়েকটি স্কুলেও শারীর শিক্ষার আংশিক কর্মসূচী গ্রহণ করে কয়েক প্রকার শারীর ক্রিয়া এবং ড্রিল, প্যারেড ইত্যাদি ব্যায়াম ছাত্রদের শেখানো সুরু হয়ে গেল। তবে এই স্কুলগুলি ছিল সবই অর্থবানদের ছেলেদের জন্য।

আধুনিক যুগের শারীর শিক্ষা

১৮৯৬ সালে ব্যারন ডি পিয়ের কুবার্তিন কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক অলিম্পিকও চীনকে চোখ খুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯১০ সালে গঠিত হলো চীনের জাতীয় এ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৩২ এর পূর্বে চীন অলিম্পিকে যোগদান করতে পারেনি। সেই বছর লস্ এ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে চীন থেকে ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ের জন্য প্রতিযোগী প্রেরিত হয়েছিল।

চীনের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হলো ১৯১৬ সালে নান্‌কিং এ শারীর শিক্ষা কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৭তে

জাতীয় পিকিং নর্ম্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বিষয় হিসাবে শারীর শিক্ষার প্রবর্তন। এই সময় দেশে আধুনিক শারীর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়ার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি শারীর শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি শারীর শিক্ষক তৈরি করার জন্য আরও কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন বিভিন্ন প্রদেশের মিউনিসিপালিটিগুলি তাদের নিজস্ব শারীর শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করলো যেখানে প্রতি বছর দলে দলে শিক্ষক তৈরি হলো খেলাধুলা ও শারীর শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য। এই সময় দেশে যে হাওয়া প্রবাহিত ছিল তাতে বিদ্যালয়ের বালিকারাও শারীর শিক্ষার কর্মসূচীতে যোগ দিতে এগিয়ে এলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হবার পরে আমেরিকার খ্যাত-নামা শিক্ষাবিদ জন ডিউই এবং পল মন্‌রোকে আধুনিক যুগের পশ্চিমী শিক্ষা কী ভাবে চীনের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলন করা যায় সে সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চীনে আনা হলো। সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে শরীর শিক্ষা ও খেলাধুলা শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ করলেন।

এই সময়ই চীনদেশে বিভিন্ন রকম শরীর চর্চা ও খেলাধুলাকে শারীর চর্চা আখ্যা দেওয়া হয়।

চীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯২৯ সালে শারীর শিক্ষাকে আবশ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করা হলো এবং তার জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম বা কার্যক্রম তৈরি করে দিল নবগঠিত শারীর শিক্ষার জাতীয় কমিটি। শুধুমাত্র আবশ্যিক ও কার্যক্রম প্রস্তুত করে দিলেই তো দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না, শারীর শিক্ষাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য চাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। তাই, স্কুলগুলিতে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় ও মাঠের ব্যবস্থার জন্য সরকার কর্তৃক অনুদান মঞ্জুর করা হলো। এতদ্ব্যতীত যে প্রতিষ্ঠানগুলি শারীর পটুতা ও শরীর গঠনের শিক্ষাদান করে সেখানে পৌঁছে গেল সরকারী অনুদান।

শারীর শিক্ষার প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৩৩ সালে সুরু হলো জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা। এর ফল ফললো হাতে হাতে। ১৯৩৬ এর বার্লিন অলিম্পিকে চীন থেকে ১৪০ জন প্রতিযোগী যোগ-দান করেছিল।

বিদ্যালয় পর্যায়ে শারীর শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও উৎসাহ সঞ্চার করার জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান নানা ক্রীড়া-কর্মসূচী প্রবর্তণ করলো। সেই সঙ্গে ১৯৩৯ সালে শিক্ষা-মন্ত্রকের এক নব প্রবর্তিত আইনানুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক মিউনিসি-পালিটির অন্তত একটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য খেলার মাঠ তৈরি করা বাধ্যতামূলক হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় শারীর শিক্ষার কর্মসূচী কিছুটা পরিবর্তিত হলো। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিটের শারীর চর্চার ক্লাশ রাখা আবশ্যকীয় করা হলো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদেদের জন্য খালি হাতে ব্যায়াম, তালে তালে এগিয়ে যাওয়া, ছন্দের তালের সঙ্গে কয়েকটি ব্যায়াম এবং তাদের উপযুক্ত কিছু স্বল্প পরিসরের চিত্তাকর্ষক খেলা প্রচলিত করা হলো।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সপ্তাহের প্রতিদিনই শারীর শিক্ষার জন্য কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হলো। মেয়েরাও বাদ গেল না শারীর শিক্ষার কার্যক্রমের কর্মসূচী থেকে। তাদের জন্য নানারকম ছন্দতালের ব্যায়াম নির্দিষ্ট করা হলো।

কলেজের ছাত্রদের শারীর শিক্ষায় নানা রকম জনপ্রিয় খেলা যথা ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, বেসবল, টেনিস, এবং সাঁতার, বক্সিং ও জিমনাস্টিকে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ও ব্যবস্থা করা হলো।

সাম্প্রতিক যুগ

১৯৪৯ সালে চীনে জনগনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ার পরে শারীর শিক্ষার প্রসারের প্রতি মনোযোগ বর্দ্ধিত হয়। দেশের সর্বত্র শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য রাজধানী বেজিংয়ে একটি জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের বিভিন্ন সুপারিশ অনুযায়ী শারীর শিক্ষাকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সরকারের আদর্শ অনুসারে শ্রমের মর্যাদাকে সবিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়। বলাই বাহুল্য, এই আদর্শকে রূপায়িত করতে শারীর শিক্ষার দ্বারস্থ হতেই হবে কারণ শারীর শিক্ষা তো মানুষের শ্রম শক্তিকে বৃদ্ধি করবেই। স্কুলকে নির্দেশ দেওয়া হলো কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্র তৈরি ক'রে লেখাপড়ার সঙ্গে সেখানে শ্রম করতে। আবার, কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে স্কুল তৈরি করে লেখাপড়ার চর্চায় উৎসাহ দান করা হলো। স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই যাতে শ্রমের মর্যাদায় আস্থাবান থাকে সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকলো।

১৯৫৬ সালে সাংহাইতে অবসর সময়ে শিক্ষালাভের জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই স্কুলের অনুপ্রেরণায় চীনের বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের আরও অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। সেখানে বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ্যাথলেটিকস্, ফুটবল, জিমনাস্টিক, টেবল টেনিস, সাঁতার, তরবারি চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্গত।

যাকে বলা হয় নয়া চীন সেখানে খেলাধুলায় মেয়েরা পূর্বের চেয়ে অধিকতর সংখ্যায় যোগ দেওয়া সুরু করে। শারীর শিক্ষার ট্রেনিং কলেজেও মেয়েরা ভর্তি হয়ে নানারকম খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করে। বর্তমানে চীনের মেয়েরা খেলাধুলার সর্বক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় চীনের মেয়েরা শ্রেষ্ঠ সম্মানও লাভ করেছে।

চীনের অনেক শিল্প-সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নের নিজস্ব ক্রীড়া-বিভাগ গঠিত হয়েছে। সেখানকার কর্মীদের যুগপৎ স্বাস্থ্য চর্চা ও প্রমোদের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ক্রীড়াবিভাগের পরিচালনায় নানারকম খেলাধুলা ও তার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১৯৫৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বচীন শ্রমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়—বিভিন্ন খেলায় ১৭টি ট্রেড ইউনিয়নের ১২ লক্ষ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিল। এই সংখ্যা থেকে সহজেই বোঝা যাবে আধুনিক চীনে খেলাধুলা ও শারীর শিক্ষার প্রসারের পরিমাণ।

আধুনিক চীনের রেডিও মারফৎ যে দৈনিক ক্যালিস্থেনিক্স শিক্ষাদান করা হয় তার জনপ্রিয়তা প্রচুর। ঘরে থেকেই মানুষ এখন দেহ চর্চার সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে আরও পরিশ্রম করার উপযুক্ত করে তুলছে—ফুসফুস আর হৃদযন্ত্রের ক্ষমতা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সচলতা বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্ব শ্রেণীতে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্গত। চীনের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা বলবৎ আছে।

রাশিয়ার মত চীনেও পরিশ্রম ও দেশরক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকার জন্য শারীর শিক্ষার কর্মসূচীতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহণ করে।

আধুনিক চীন যে বাস্তবিকই শারীর শিক্ষার ব্যাপারে কত আন্তরিক সেটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যখন জানা যায় সেখানে স্কুলের জিমনা-

সিয়ামের সরঞ্জামগুলি পর্যন্ত দক্ষ পর্যবেক্ষক কর্তৃক সঠিক বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া, স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি থাকে।

শারীর শিক্ষার প্রসারের জন্য স্টেডিয়াম, জিমনাসিয়াম ও সাঁতার পুল নির্মিত হয়েছে। এগুলিতে আধুনিক শারীর শিক্ষার সর্বরকম ব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদিত হয়। স্টেডিয়াম ও সাঁতার পুলে দর্শকাসনের সংখ্যাও প্রচুর কেননা দর্শকের উপস্থিতিই তো প্রেরণা জোগাবে খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে। এছাড়া, চীনের বিপুল জনসংখ্যার জন্যও তো চাই আসনের প্রাচুর্য।

শারীর শিক্ষার জন্য সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও তার রূপায়ণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শারীর শিক্ষক তৈরি করা। তাই, চীনের বিভিন্ন স্থানে সর্বাধুনিক প্রথায় রাজধানী বেজিং, সাংহাই, উহান, শেন-ইয়াং, চেংটু এবং সিয়ানে শারীর শিক্ষক তৈরির কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার মতো এখানেও শারীর শিক্ষার গবেষণার উপর যথেষ্ট প্রাধান্য প্রদত্ত হয়। জাতীয় শারীর শিক্ষা কমিটির অধীনে গবেষণা কার্যের জন্য একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শারীর শিক্ষার গবেষণার ফলাফলগুলি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

বর্তমান শতাব্দীর ৬০ থেকে ৭০ দশকে চীনে শারীর শিক্ষার প্রভূত উন্নতি ও প্রসার হয়েছে। এই সময় জিমনাসিয়ামে, স্কুলে, পার্কে কারখানায় এমন কি রাস্তায় ও কতো রকমের খেলা, নৃত্য এবং শারীর ক্রিয়ায় মেতে উঠেছে চীনের ছেলেমেয়েরা। এই ধারা আজও অব্যাহত। প্রাণ প্রাচুর্যের ফোয়ারা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। অফিসে, দোকানে, কারখানার কর্মীরা কর্তব্যকালীন থাকার সময়তেই দশ মিনিটের কাজের বিরতিতে খানিকটা শারীর পটুতার ব্যায়াম করে। কাজে ক্লান্তি ও এক-ঘেঁয়েমী অপসারণ করে অধিক কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে এই ব্যায়াম সমষ্টি এবং তার ফলে সামগ্রিক দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং কর্মধারা ত্বরান্বিত হয়।

বেজিং এর ক্রীড়া বিদ্যালয়

চীনের রাজধানী বেজিং এ ১৯৫৮ সালে একটি ক্রীড়া বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের শারীর শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য এখানে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকরা আছেন। শিক্ষণীয়

বিষয় হলো ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ড বল, ভারোত্তলন-, জিমনাস্টিক, কুস্তি, দাবা, টেবল টেনিস ও উশু।

বেজিং এর এই ক্রীড়া বিদ্যালয়টি যেমন সর্বরকম আধুনিক বন্দোবস্ত দ্বারা সমৃদ্ধ তেমনি খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য ইংরাজি প্রবচন ''ক্যাচ দেম ইয়াং'' কথাগুলি যে এখানকার প্রধান আদর্শ তা বেশ বোঝা যায় স্কুলের শিক্ষার্থী ভর্তি করার বয়সসীমা লক্ষ্য করে। ভর্তি হবার জন্য আবেদনকারীদের প্রথমে তিন মাসের এক কার্যক্রমের মাধ্যমে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই ট্রেনিং-এ যারা কৃতকার্য হয় একমাত্র তারাই এই ক্রীড়া বিদ্যালয়ের পরবর্তী পর্যায়ের উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য অনুমোদিত হয়।

দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত এখানকার ট্রেনিং পদ্ধতি অত্যন্ত উচ্চ মানের। শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং-এর কার্যসূচীকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রশিক্ষকেরা সদাই যত্নবান এবং তাঁরা নিজেরা ছাত্রদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং সর্ব রকম ক্রীড়া কৌশল নিজেরা প্রদর্শন করে দেখান। এছাড়া, ছাত্ররা যাতে বিশেষত, জিম-নাস্টিক ও কুস্তি শেখার সময় কোনও রকম আঘাত না পায় তার জন্য সর্বরকম ব্যবস্থা থাকে। যার ফলে, শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্ত মনে বিনা দ্বিধায় প্রশিক্ষকের নির্দেশগুলি পালন করে এবং সুফলও পায় হাতে হাতে। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কেউ কেউ চীনের-জাতীয় দলেও স্থান পেয়েছে। বিশ্ব জিমনাস্টিকের বিংশতম প্রতিযোগিতায় এই ক্রীড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত জিমনাস্টিক বিশারদ মা-ইয়ান হং বারের খেলায় বিশ্বজয়ী হয়েছেন।

সমগ্র চীনের গৌরব এই ক্রীড়া-বিদ্যালয়ের জিমনাসিয়ামের আয়তন হলো ১৫৭০ বর্গ মাইল। আর, ১০০০ বর্গ মাইল আয়তনের বিশাল হল ঘরে ৩০ টি টেবল টেনিস বোর্ডে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে বেজিং শহরের টেবল টেনিস দলের শতকরা ৮০ জন খেলোয়াড় এই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। অবশ্য বাস্কেটবল এবং ভলিবল কোর্টগুলি অদ্যাপি অনাচ্ছাদিত। তবে তার মধ্যে কয়েকটিতে রাত্রে খেলার জন্য আলোকিত করার ব্যবস্থা আছে।

বেজিং-এর কিনডার-গার্টেন স্কুল

বেজিং-এর পয়লা নম্বর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলটি একটি চারতলা বৃহৎ দালানে স্থাপিত হয়েছে। ৫০ জন নার্স ও শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনশতর কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী এখানে থাকে।

নানারকম মজার খেলা, খেলার মাধ্যমে শারীর ক্রিয়া, নাচ, গান, গল্প শোনার মধ্য দিয়ে এই শিশুদের বড়ো করে তোলা হয়। প্রাথমিক স্কুলে যাবার প্রস্তুতি পর্বে তাদের আনন্দপূর্ণ জীবন যাত্রার কর্মসূচীটি খুবই মূল্যবান। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা কাল প্রথম বিভাগে—অনুকরণের মাধ্যমে নানারকম শারীর ক্রিয়া। শিক্ষক নিজে ভঙ্গী বা খেলাটি দেখিয়ে দেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকেই অনুকরণ করে। কখনও খরগোসের চলার অনুকরণ, কখনও বা কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া চালানোর অনুকরণ। দ্বিতীয় বিভাগে—ছোট ছোট বালির থলে নিক্ষেপ করা, লাইন করে দাঁড়িয়ে সামনে, পিছনে ও পাশে একজনের অপরজনকে বড় রবারের বল দ্রুত হস্তান্তর করা, স্কিপিং করা, শাটল কক নিয়ে খেলা ইত্যাদি। তৃতীয় বিভাগে—অল্প চওড়া বীমের উপর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে হাঁটা, ম্যাটিং-এর উপরে গড়াগড়ি খাওয়া।

সাড়ে নটা থেকে সাড়ে এগারোটার সময় ছবি আঁকা, গান, ভাষা শিক্ষার ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে ব্যাঙ্ এবং আরও কয়েক রকম প্রাণীর লাফানোর অনুকরণ, কয়েকটি রিলে খেলা, বাধা অতিক্রম করার খেলা এবং জিমনাস্টিক।

দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা অনেক রকম ঘরে ও বাইরের খেলা, নাচ গান সবই থাকে। প্রতিটি খেলাই উদ্দেশ্য মূলক।

বাল্যকাল থেকেই শারীর শিক্ষার প্রতি যত্নবান করে তোলার জন্য চীন বর্তমানে এক অভিনব পন্হা অবলম্বন করেছে। চীনের যে স্কুলগুলির পড়াশুনার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত সেখানে ভর্তির জন্য যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে শারীর শিক্ষারও একটি পরীক্ষা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই প্রথাটি প্রথম অবলম্বন করে ১৯৭৯ সালে সাংহাইর চোং মিং মাধ্যমিক স্কুল। এই স্কুলটির অনুকরণে এখন শত শত উন্নত মানের স্কুলে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

স্কুলে ভর্তি কালে শারীর শিক্ষার পরীক্ষা

বর্তমানে চীন দেশে শারীর শিক্ষার সার্বিক উন্নতি বিধানের জন্য দুইটি ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হয়েছে—দি স্টেট ফিজিক্যাল কালচার এণ্ড্ স্পোর্টস কমিশন অভ্ দি পিপল্স রিপাবলিক অভ্ চায়না এবং দি অল চায়না স্পোর্টস ফেডারেশন। প্রথমটি সরকারি এবং দ্বিতীয়টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারি সংস্থাটি মন্ত্রী সভার সঙ্গে যুক্ত।

ক্রীড়া সংস্থা

অল চায়না স্পোর্টস ফেডারেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য খেলাধূলাকে উন্নতি প্রসার ও জনপ্রিয় করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দান করা।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ক্রীড়া সংস্থা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্রীড়া সংস্থাও আছে। আবার, শিল্প সংস্থা এবং রেল কর্মীদের জন্য পৃথক ক্রীড়া সংস্থা আছে।

চীনা অলিম্পিক কমিটিও আছে। বিশ্ব অলিম্পিকের জন্য প্রতিযোগী মনোনয়ন করা এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। বিশ্ব অলিম্পিকের মহান ক্রীড়া আদর্শ প্রচার করাও চীনা অলিম্পিক কমিটির অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব।

চীন দেশে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যও শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাঁরা যাতে আরও বেশি দিন এই পৃথিবীটা ভোগ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এই সংস্থাগুলি। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা বার্ধ্যক্যে ভারে জর্জরিত না হন তার জন্য এই জাতীয় সংস্থাগুলি চেষ্টার অন্ত নেই।

এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ভোরবেলায় নিয়মিতভাবে নানারকম ব্যায়াম ও শারীর ক্রিয়া করা বর্তমানে চীনে অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

বেজিং, সাংহাই, ঝিয়ান এবং আরও অন্যান্য স্থানে বৃদ্ধদের কয়েকটি ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস খেলার টিমও গঠিত হয়েছে। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে ম্যাচ খেলে প্রচুর আনন্দ পান। জগিং বা স্বল্পগতির দৌড় তো আছেই। এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতাও বাদ নেই।

বৃদ্ধদের এই ক্রীড়া সংস্থা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধদের নিয়ে প্রকৃতির কোলে, শহর থেকে দূরে ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হয়।

এই সংস্থা গঠনের ফলে দেশের যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সংস্থার বিভিন্ন শারীর ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আনন্দ উপভোগ করেন তাঁরা সকলেই নিজেদের জীবনে আবার যৌবনের ডাক শুনতে পান। তাঁরা যে সমাজের বাতিল নন, তাঁদের জীবনও যে অর্থবহ এ বোধ তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে।

ক্রীড়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র

১৯৫৮ সালে চীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। খেলাধূলার মানের উন্নতি এবং খেলোয়াড়দের আঘাত প্রাপ্তির চিকিৎসা এবং আঘাত না পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য।

পশ্চিম জগতের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি চীনের নিজস্ব চিকিৎসা আকুপাঙ্কচার এবং বৈশিষ্টপূর্ণ মালিশ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং তাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে গাছ গাছড়া থেকে প্রস্তুত একরকম মলম আছে যেটি আঘাত প্রাপ্ত স্থানে মালিশ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়। আর একটি চিকিৎসা যন্ত্রের নাম হলো "হাইড্রলিক ম্যাসাজ মেশিন।" এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্লান্তি বিনোদন, অনিদ্রা রোগীর নিদ্রা বৃদ্ধি, পেশীর শক্ত হওয়া কিংবা টেনে ধরা, কোনও গ্রন্থিতে তরল দ্রব্য জমে যাওয়া ইত্যাদি রোগে খুবই ভালো ফল পাওয়া গেছে।

শারীর শিক্ষকদের জন্য স্বর্ণ পদক

শারীর শিক্ষাদানে যাঁরা সবচেয়ে বড়ো সহায়ক সেই শারীর শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন অবশ্য প্রয়োজন মনে করে চীন সরকার সম্প্রতি দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শারীর শিক্ষকদের মধ্যে এক হাজার শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে একটি করে সুবর্ণ পদক উপহার দিয়েছেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছে।

চীনের বৃহত্তম সাঁতার স্টেডিয়াম

সিচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংডুতে নির্মিত হয়েছে চীনদেশের বৃহত্তম সাঁতার স্টেডিয়াম। ১১৫.৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪৮.৬ মিটার প্রস্থ এবং ২২ মিটার উচ্চ এই স্টেডিয়ামে প্রথম শ্রেণীর সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সব রকম ব্যবস্থা আছে। ওয়াটার পোলো এবং ডাইভিং-এরও সুযোগ আছে এখানে। নতুন আকারে নির্মিত এই স্টেডিয়ামে দর্শকদের বসার স্থান শুধু এক পাশে রাখা হয়েছে। দর্শকাসনের সংখ্যা ১৮০০। অপর পাশের জায়গা কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার পরিচালক ও বিচারকদের সুবিধা জনকভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংরক্ষিত করা আছে।

জলের তলায় সাঁতার

জলের তলা দিয়ে সাঁতারও চীনদেশে এখন বেশ জনপ্রিয়। ষাট দশকে এই সাঁতার পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি সাঁতার ক্লাব গঠিত হয় এবং বর্তমানে জলের তলায় সাঁতারের জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস

ব্যাডমিণ্টন ও টেবল টেনিস এই দুটি ইনডোর খেলায় বর্তমানে চীন এখন তুঙ্গে। ব্যাডমিণ্টনে চীন না ইন্দোনেশিয়া কে সকলের উপরে একথা স্পষ্ট করে বলা শক্ত। তবে চীনে যে পরিমাণে উচ্চমানের খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

গত বছর ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রথম নন-অলিম্পিক খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যাডমিণ্টনে সিঙ্গলস্ বা একক খেলায় বিজয়ী হয়েছেন চীনের খেলোয়াড় চেন্-চ্যাংজি। এই প্রতিযোগীতায় ইন্দোনেশিয়া, ডেন মার্ক, ইংলণ্ড, ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, পেরু, কানাডা ও মালয়েশিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন।

টেবল টেনিস খেলায় বর্তমানে চীনের প্রাধান্য সর্বজন বিদিত। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের বিশ্ব টেবল টেনিশ প্রতিযোগীতায় চীনের কৃতিত্ব অসামান্য। এই কুড়ি বছরের মধ্যে ১১ বার বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে চীনের পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা সম্ভবপর হয়নি তবে বাকি ৯ বারের মধ্যে চীনের পুরুষ দল ৭ বার বিশ্বজয়ী হয়েছে। মেয়েদের চীনাদল জয়ী হয়েছে ৫ বার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্যাপার হলো যে, ১৯৮১ সালের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় চীন এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ রেকর্ড স্থাপন করেছে। প্রতিযোগীতার ৭ টি বিষয়ের সবকটিতেই জয়ী হয়েছে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগীতার গত ৫৫ বছরের ইতিহাসে এই রেকর্ড অভূতপূর্ব।

সম্প্রতি, ঝিনজিয়াং ইলেকট্রোনিকস্ গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তায় চীনের উরুমকি শারীর শিক্ষার পৌর কমিশন একটি বিদ্যুৎ পরিচালিত টেবল টেনিস রোবট প্রস্তুত করেছে। এই রোবট একটি যান্ত্রিক টেবল টেনিস খেলোয়াড়। টেবল টেনিস খেলার সব রকম স্ট্রোকই এই যন্ত্রের সাহায্যে মারা সম্ভবপর। বলা বাহুল্য, এই যন্ত্রটি চীনের খোলোয়াড়দের অনুশীলনের পরম বন্ধু।

ফুটবল খেলা চীনে কম জনপ্রিয় নয়। মানের বিচারে যদিও চীনের ফুটবল অদ্যাপি ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ দলগুলির সমকক্ষ হতে পারেনি, তবে নিরন্তর চেষ্টা ও অনুশীলনের ত্রুটি নেই এবং বর্তমানে চীন ফুটবল দল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দলগুলির অন্যতম।

ফুটবল

চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের লুডা শহরে সারা বছরই ফুটবল মরশুম। এখানকার ছেলেরা স্কুলের মাঠে, পার্কে, পথের পাশের ফাঁকা জায়গায় সর্বত্রই ফুটবল খেলে সময় পেলেই। এখানকার প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অনেকগুলি করে ফুটবল টিম আছে। অনেক স্কুলেই ফুটবল প্রশিক্ষকও আছেন। এই লুডা শহরের ফুটবল প্রিয়তার জন্য একে ফুটবল

শহর বলা হয়। অবাক হতে হয় যখন জানা যায় যে, এমন একটি প্রাথমিক স্কুল আছে যার ক্লাশ সংখ্যা ৩০ অথচ ফুটবল টিমের সংখ্যা ৫০। অর্থাৎ স্কুলের প্রায় সব ছাত্রই ফুটবল খেলোয়াড়।

লুডা শহরের সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো যে চীনের জাতীয় ফুটবল দলে প্রায় সর্বদাই ৫০ ভাগ খেলোয়াড়ই থাকে এই লুডা শহরের খেলোয়াড়।

চীনদেশে প্রমীলা ফুটবলও সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। লুডাতে কয়েকজন প্রমীলা প্রশিক্ষক আছেন যাঁরা ছোট ছেলেদের প্রশিক্ষণ দান করেন।

চীনের অন্যান্য খেলার মধ্যে বাস্কেটবল, ভলিবল সমধিক প্রসিদ্ধ। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে এই দুইটি খেলায় চীনা খেলোয়াড়রা নিজেদের ক্রীড়া কৌশল ও শারীর পটুতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং স্বভাবতই তাদের খেলার মান বিশেষ উন্নত। যে খেলাগুলিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য জিমনাস্টিকের বিশেষ প্রয়োজন ভলিবল তার অন্যতম। চীনের প্রশিক্ষণে দেখা যায় যে, ভলিবল খেলোয়াড়দের নানা রকম জিমনাস্টিকের নিয়মিত অনুশীলন করানো হয়। ভলিবল এবং বাস্কেট বল এই খেলাদুটিতে স্পট জাম্প বা এক জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থা থেকে লাফানো বিশেষ কার্যকরী ও প্রয়োজন। জিমনাস্টিক এ বিষয়ে খেলোয়াড়কে অশেষ সাহায্য করে।

অন্যান্য খেলা

টেনিস, সফ্‌ট বল, তুষার স্কেটিং প্রভৃতি খেলাও চীনে প্রচলিত হয়েছে।

উশু খেলাটি চীন দেশের এ নিজস্ব জিনিস। খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে এই খেলাটি ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে এসেছে আধুনিক উশু হলো এক জাতীয় কুস্তি ও তরবারি খেলার সংমিশ্রণ। আধুনিক উশু অবশ্য শরীরের সচলতা ও পটুতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। উশু শিক্ষাদানের অনেক কেন্দ্র আছে চীনে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও উশুর প্রচলন দেখা যায়। চীনের প্রায় সর্বত্র উশু প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। যে কোনও উশু প্রতিযোগিতায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। শারীর শিক্ষার কলেজ ও স্কুলে উশুর প্রচলন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উশুর বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা কার্যে অনেক শারীর শিক্ষাবিদ নিযুক্ত আছেন। চীনের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও উশু অন্তর্ভুক্ত।

উশু খেলা

চীনদেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে কুইগং ব্যায়াম

অন্যতম। এটি এক ধরণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের ব্যায়াম। অনেক দিন থেকেই কুইগং সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ধারণা ছিল যে, অলৌকিক কিছু ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত আছে। অবশ্য, বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এর উপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় সে ধারণার অবসান হয়েছে। নানারকম রোগের চিকিৎসায় এখন কুইগং ব্যায়াম বেশ জনপ্রিয়। চীনের রাজধানী খাস বেজিং-এ ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুইগং ইনস্টিটিউট। এছাড়া বিভিন্ন পার্কে, কারখানায় এবং সরকারি সংস্থায় আপাতত তিনশত প্রশিক্ষক কুইগং বিদ্যায় হাজার হাজার রোগীকে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। সুস্থরাও কুইগং ব্যায়াম অভ্যাস রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য।

কুইগং ব্যায়াম

কুইগং অনুশীলনে যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তেমনি অবশ্য আবশ্যক গভীর মনঃসংযোগ। মনকে সর্বরকম চিন্তামুক্ত করে নিয়ে তারপর ব্যায়ামে মনকে ষোলো আনা যুক্ত করতে হবে। তারপর সুরু হয় কুইগং ব্যায়াম অনুশীলন।

ভারতীয় যোগব্যায়ামের সঙ্গে এই ব্যায়ামের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(ক) ৮ কোটি ৫৩ লক্ষ মানুষ শারীর পটুতার অন্তত সাধারণ মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার মধ্যে ১ কোটি কোনও না কোনও খেলায় পারদর্শী এবং ৫০০০ জন "মাস্টার অভ্ স্পোর্টস" আছেন। (খ) সমগ্র দেশের অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যেই ৩২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে বিভিন্ন ক্রীড়ায় শিক্ষাদান করেছে। (গ) শারীর শিক্ষার কলেজ গুলি থেকে ৩০ হাজার ছাত্র স্নাতক হয়েছেন এবং তাদের অধিকাংশই শারীর শিক্ষক, পরিচালক অথবা গবেষক হিসাবে কর্মরত। (ঘ) চীনা ক্রীড়াবিদ্‌রা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দুই শতাধিক বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

আধুনিক চীনের শারীর শিক্ষার উন্নতির সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

রাশিয়া

গত সহস্র বছরের রাশিয়ার ইতিহাসে বিভিন্ন শতাব্দীতে নানারকম শরীর চর্চা ও খেলাধুলার নিদর্শন পাওয়া যায়। তার অনেকগুলির অবলুপ্তি ঘটেছে কালস্রোতের প্রবাহে। অবশিষ্ট যেগুলি আছে তার অধিকাংশই অবশ্য গ্রামাঞ্চলের মানুষরাই আজও প্রচলিত রেখেছে তাদের জীবনযাত্রার আনন্দ সঙ্গী হিসাবে।

আদি যুগ

এমন এক যুগ ছিল যখন বিদেশী যাযাবররা বিনা ঘোষণায় সহসা ঝাঁপিয়ে পড়তো নিরীহ রুশীয়দের উপর। এদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের প্রয়োজন হয়েছিল অশ্বারোহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কয়েক রকম শারীরিক কসরৎ আয়ত্ত করা যথা, লাফিয়ে ঘোড়া টপকানো, ধাবন্ত ঘোড়ার উপর চড়ে বসা এবং তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ধনুক থেকে বান নিক্ষেপ করা। এ ছাড়া, আর একটি অভিনব তীর নিক্ষেপে তারা রপ্ত হয়েছিল যার খবর অন্য কোনও দেশের প্রাচীন ইতিহাসে মেলেনি। উঁচু বাঁশের খুঁটির উপর ঝোলানো থাকতো একটি গোলাকৃতি টার্গেট বা লক্ষ্যস্থল। আর, ভূমিতে শায়িত কোনও বালক তার সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে সেটিকে ওঠানামা করার সময় তীরন্দাজ তাতে তীর নিক্ষেপ করতো।

প্রাচীন রাশিয়ায় শ্ল্যাভ্‌দের মধ্যে শারীর শিক্ষা জীবন যাপনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ঢেউ তুচ্ছ করে সাঁতার আর নৌকো চালানো, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতার উত্তেজনা, আর বর্শা নিক্ষেপ ছিল তাদের বিশেষ প্রচলিত শারীর ক্রিয়া। যুবকরা এইসব কার্যে খুবই উৎসাহী ছিল। আর একটি অত্যন্ত উল্লাস ভরা খেলা ছিল দড়ি টানাটানি। এক মস্ত লম্বা মোটা দড়ি টানাটানি করে পাশাপাশি দুই গ্রামের লোকদের চলতো শক্তি পরীক্ষার এক দারুণ কোলাহলপূর্ণ প্রতিযোগিতা। যারা দড়ি ধরার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হতো তারা দুই পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সমর্থন জানাতো নিজ নিজ গ্রামের দলকে। অনেক দূর থেকে শোনা যেত সেই চিৎকার ধ্বনি।

প্রাচীন রাশিয়াতে আর একটি অভিনব সাঁতার ও মাছ ধরার প্রতিযোগিতা ছিল। সেটি যেমন পরিশ্রম সাপেক্ষ তেমনি চিত্তাকর্ষক। অপরাহ্ন বেলায় প্রতিযোগীরা নদীতে সকলে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁত্‌রে সাঁত্‌রে মাছ হাত্‌ড়ে বেড়াবে। মাছ হস্তবদ্ধ করতে পারা মাত্র নদীর তীরে অপেক্ষারত ব্যক্তির কাছে ছুঁড়ে দেবে। এমনিভাবে চলবে খেলা যতক্ষণ না পর্যন্ত কিয়েভ পাহাড়ের পিছনে

সাঁতার ও মাছধরা প্রতিযোগিতা

মিলিয়ে যাবে সূর্যের শেষ রশ্মি। বিজয়ী হবে সে যার মাছ সংগ্রহের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশি হবে। আর, বিজয়ীর পুরস্কার হলো রাজবাড়ীতে বোনা খাঁটি রেশমের এক বিশাল মাছ ধরার জাল। পুরস্কারের বস্তু থেকে অনুমিত হয়, প্রতিযোগীরা সম্ভবত সকলেই ধীবর।

মধ্য যুগে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর লোকদের মধ্যে তাদের উপযোগী কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল আজকের হিসাবে প্রায় ২৫ কিলোমিটারের মত দূরত্বের। তাদের সামরিক শিক্ষার অন্তর্গত শরীর চর্চার মধ্যে ছিল একজন বা দুইজন সঙ্গীকে পিঠে বহন করে বৃক্ষারোহণ। মাঝে মাঝে টারজানের মতো বড়ো বৃক্ষের নেমে আসা ঝুরি মুষ্টিবদ্ধ করে দোলা খেয়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন। তখনও কিন্তু পৃষ্ঠে লগ্ন থাকতো সঙ্গী বা সঙ্গীযুগল। কী অসাধারণ শক্তি ও শারীর পটুতা ছিল ঐ সৈনিকদের! এই কারণেই এদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মোঙ্গল ও তাতার বর্বর হানাকারীদের প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচানো।

দৌড় ও বৃক্ষারোহণ

শুনলে অবাক হতে হয়, যে-দেশে বর্তমানে ক্রিকেট খেলার কোন নাম গন্ধও নেই সেই দেশে প্রাচীন কালে ক্লিয়ক নামে একরকম গ্রাম্য ক্রীড়া প্রচলিত ছিল যার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার সাদৃশ্য রয়েছে। ক্লিয়ক খেলায় স্টাম্পের বদলে প্রোথিত হতো লাঠি এবং সেটিকে কিছুটা দূর থেকে অন্য লাঠি নিক্ষেপ করে ভূপাতিত করা হতো। ভূপাতিত হলে তখন অপর একজন খেলোয়াড় সেখানে এসে দাঁড়াতো।

ক্লিয়ক খেলা

চুর নামে একটি প্রাচীন রুশীয় খেলা দলগত বা টিম গেমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল খুব। দীর্ঘদিনের প্রচলিত এই খেলাটি গত শতাব্দীতেও মধ্য রাশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল এক শতর অধিক।

চুর খেলা

অনেকটা হকি স্টিকের মত লম্বা বাঁকানো লাঠি হাতে নিয়ে দুই দলের খেলা চলতো। কাঠের তৈরি বল বিপক্ষের গোলে অথবা গর্তে পাঠানোর দুরন্ত চেষ্টা চলতো ঐ লাঠির সাহায্যে। এক গোল থেকে অপর গোলের দূরত্ব ছিল দুই মিটার। চুর খেলায় লাঠি দিয়ে বল ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য সমতল মসৃণ জায়গা বেছে নেওয়া হতো। আর, শীতকালে জমাট নদী বা বিস্তৃত হ্রদের তুষারের বুকের উপর চলতো চুর খেলা।

রাশিয়াতে ফুটবলের আবির্ভাবের পূর্বে উনিশ শতকে কিলা নামে

একরকম খেলার বর্ণনা পাওয়া যায় যার সঙ্গে আধুনিক ফুটবলের মিল লক্ষ্যণীয়। কিলা খেলায় যে বল ব্যবহৃত হতো সেটিও চামড়ার, তবে তার ভিতরে হাওয়ার বদলে ভরা থাকতো জন্তুর লোম। আয়তন মোটামুটি ফুটবলের মতই। দুই দলের প্রায় সর্বসমেত আশীজন খেলোয়াড় মুখোমুখী লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে অবিকল আধুনিক কালের ফুটবল খেলার "কিক্-অফে"র মতো একজন খেলোয়াড় আস্তে করে সামনের দিকে কোণাকুণি ভাবে বলটি ঠেলে দিলেই সুরু হতো এই কিলা খেলা। ধাক্কা ধাক্কি করা একেবারেই বেআইনী ছিল। কিলাকে অনায়াসেই ফুটবলের এক পূর্ব সংস্করণ বলা যেতে পারে।

ফুটবলের পূর্বাভাস

গোরোদ্‌কি খেলা রাশিয়াতে জন্ম নিয়েছে আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে। রাশিয়ার এই সম্পূর্ণ নিজস্ব খেলাটি আধুনিক যুগের সব খেলার সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করেছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং সৌভাগ্যের কথা, এই চমৎকার খেলাটি যাকে আধুনিক ক্রীড়াবিদরা শারীরিক সামর্থ্য, অঙ্গ চালনার নিপুণতা ইত্যাদির এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, আজও রাশিয়ার শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই প্রিয় খেলা।

গোরোদ্‌কি খেলা

রাশিয়ার সর্বশ্রেণীর লোকেরাই গোরোদ্‌কি খেলায় অংশগ্রহণ করে অপার আনন্দ লাভ করেছে বিগত শতাব্দীতে। সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংগীতজ্ঞরাও তার থেকে বাদ ছিলেন না। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক টলস্টয়, গোর্কি, কুপ্রিন, শিল্পী রেপিন এবং সংগীতকার চালিয়াপিন গোরোদ্‌কি খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। স্বয়ং লেনিনও নিজে একজন ভালো গোরোদ্‌কি খেলোয়াড় রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি এই খেলায় অংশ গ্রহণ করে সমাজের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মেশবার বেশি সুযোগ পেতেন কারণ গোরোদ্‌কি খেলা মুখ্যত তাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল সর্বাধিক। রাশিয়ার পল্লী ক্রীড়াগুলির মধ্যে গোরোদ্‌কি প্রাচীনতম। বর্তমানে যেখানেই গোরোদ্‌কি খেলা সেখানেই সহস্র মানুষের ভিড় আর আনন্দ-উল্লাসের বন্যা, প্রাণ প্রাচুর্যের ফোয়ারা।

ল্যাপ্টা সোভিয়েট দেশের অন্যতম আদি গ্রামীণ ক্রীড়া। আশ্চর্যের কথা, সুদূর আমেরিকায় জাতীয় খেলা বেসবলের সঙ্গে এর বিলক্ষণ সাদৃশ্য রয়েছে। এ খেলাতেও ব্যাট বল আছে। আছে পিচের স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া। ক্রিকেটের সঙ্গেও মিল আছে বলতে বাধা নেই।

ল্যাপ্টা খেলা

উত্তর ককেশাস অঞ্চলে এখনও কিছু প্রাচীন গ্রামীণ ক্রীড়ার নিদর্শন আছে। এখানকার বার্ষিক জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাচীন পদ্ধতির মল্লক্রীড়া ও ভারি বস্তু নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলি চলাকালীন দর্শকদের মনোরঞ্জনার্থে এবং ক্রীড়াবিদ্‌দের উৎসাহিত করার জন্য উত্তেজক বাজনা বাজানো হয়। এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য হাজার হাজার নর নারী উপস্থিত হয় ক্রীড়া প্রাঙ্গণে। তখন সমগ্র ক্রীড়া প্রাঙ্গণ সঙ্গীত আর রঙ্ বেরঙের পোষাকধারী দর্শকদের সমাবেশে এক উৎসবের রূপ নেয়। চতুর্দিকের পতাকা আর বর্ণ সমুজ্জ্বল পরিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনুপ্রাণিত হয় সহজেই।

প্রথমে সুরু হয় কুস্তি। অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধ করার জন্য প্রতিযোগীদের দেহের ওজন মেপে নিয়ে মোটামুটি একই ওজনের দু'জন কুস্তিগীরের লড়াই হয়। বিজয়ী কুস্তিগীরকে উপাধি দেওয়া হয় "উত্তর ককেশাসের জিগিৎ।"

কুস্তির পর সুরু হয় প্রস্তর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা। আট থেকে দশ কিলোগ্রাম ওজনের বিভিন্ন আকৃতির পাথর সাজানো থাকে। প্রতিযোগীরা তার থেকে নিজেদের পছন্দ মত পাথর বেছে নেয়। প্রশস্ত বক্ষ আর পেশীযুক্ত সবল বাহু যাদের আছে-এই প্রতিযোগিতা তাদেরই জন্য।

প্রতিযোগীরা এক হাতে পাথরটি নিয়ে শরীরে কোনও রকম মোচড় না দিয়ে যত দূরে সম্ভব নিক্ষেপ করে। আধুনিক ডিসকাস নিক্ষেপের সঙ্গে এর মিল আছে।

আর এক রকম পাথর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা আছে। তাতে প্রতিযোগীরা দৌড়ে এসে যেমন ভাবে খুশি নিক্ষেপ করতে পারে। এই প্রতিযোগীতায় পাথর থাকে গোলাকার।

বলা বাহুল্য, এ সবগুলি প্রতিযোগিতাই শক্তির পরীক্ষা।

রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ জারের আমলে শিক্ষা জিনিসটাই ছিল সমাজের কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর জন্য। কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষরতার বোঝা বয়ে বেড়াতো আর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত হতো।

আধুনিক যুগ

খেলাধূলাও ছিল বিত্তবানদের বিলাসের সামগ্রী। কয়েকটি স্কুলে সামান্যভাবে সুইডেনের জিমন্যাস্টিক প্রচলিত ছিল।

রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯১৭ সাল থেকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। বিপ্লব মানেই দ্রুত পরিবর্তন। সেই বিপ্লবের বাতাস বইলো শারীর শিক্ষা জগতেও।

দেশের অগণিত শ্রমিক ও কৃষকের এই সরকারের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন ঘোষণা করলেন যে, চারদিকের শত্রু পরিবেষ্টিত এই দেশের এক বড়ো কর্তব্য হলো শারীর শিক্ষার সুচিন্তিত কার্যসূচীর মাধ্যমে যুবকদের শরীর গঠন করা। দেশের যুবশক্তিকে বল ও সামর্থ্যে ভরপুর করে দিতে হবে। লেনিন জানালেন, ক্যালিসথেনিক্স অর্থাৎ খালি হাতের ব্যায়াস, সাঁতার, নানারকম ব্যায়াম, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রচলিত করতে হবে। তাঁরই নির্দেশে স্কুলেও শারীর শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হলো। ১৯১৮ সালের সরকারি ঘোষণাতে সাধারণ শিক্ষায় ক্যালিস্থেনিক্স এবং ক্রীড়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

নবগঠিত রাশিয়ার নতুন চিন্তাধারায় এক শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করার পরিকল্পনা করা হলো। সাম্যবাদের আদর্শকে স্থাপন করার জন্য এক সর্বাত্মক চেষ্টা চললো। সর্ব প্রথমে দেশের এই নতুন পরিস্থিতিকে বজায় রাখার জন্য বা স্থায়ীত্ব দেবার জন্য সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তাদের জন্য নিয়মিত শরীর চর্চার আয়োজন করা হলো। ঐ শরীর চর্চার কর্মসূচীর মধ্যে সেনাবাহিনীর উপযোগী কিছু ব্যায়াম ও শারীর ক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করা হলো। সেই সঙ্গে অবশ্য একথাও বলা হলো যে, শারীর শিক্ষাকে শুধু শরীর চর্চা ও সামরিক বাহিনী গঠনের জন্য ব্যবহার করলেই চলবে না। এর মাধ্যমে জনগণের মনোবল, সহনশীলতা, দলগত সংহতি এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর বিকাশ করতে হবে।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরে জোসেফ স্ট্যালিন দৃঢ়তার সঙ্গে ২৯ বছর রাশিয়ার শাসন রজ্জু হাতে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কৃষিকার্যে আর শিল্পকার্যে প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় রাশিয়া সামরিক দিক দিয়েও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

এই ত্রিমুখী অগ্রগতির পিছনে শারীর শিক্ষার অবদান ছিল অসামান্য। কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধির জন্য শারীর শিক্ষার সহায়তায় শ্রমিকদের দেহ গঠন করা হয়েছে শক্তভাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতুড়ি পিটিয়ে কিংবা যন্ত্র চালনা ক'রে তারা ক্লান্ত হয়নি। ব্যায়াম আর পুষ্টি-কর খাদ্য তার শরীরে বল জুগিয়েছে বেশি খাটার, অধিক উৎপন্নের। কৃষক তার ফসলের উৎপন্ন বৃদ্ধি করেছে অপর্যাপ্ত পরিমাণে। এইভাবে,

সোভিয়েট রাশিয়া শারীর শিক্ষাকে দেশ গড়ার কাজে ব্যবহার করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জনগণের মধ্যে শারীর শিক্ষা বিপুল-ভাবে বিস্তার করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম আর জিমনাসিয়াম তৈরী হয়েছে দেশের প্রায় সর্বত্র। ১৯২৩ সালে গঠিত হলো "সুপ্রীম কাউন্সিল অভ্ ফিজিকাল কালচার।"

খেলাধূলার প্রতি রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরবর্তী কালের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে ছিল দলবদ্ধ শারীর ক্রিয়ার যুগ। এ যুগটাই ছিল সমতার। যা কিছু কর্ম সবই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। খেলাধূলাতেও তার প্রতিফলন ছিল। দলগত খেলার প্রাধান্য ছিল তখন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা গেল বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ব্যক্তিগত রেকর্ডের ছড়াছড়ি। ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার ক্রীড়াবিদ্রাই সেই সব রেকর্ডের অধিকারী। অলিম্পিকের সোনার পদকগুলোও তাদেরই গলায় ঝুললো। রাশিয়ার খেলোয়াড়দের নাম সেখানে অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতি রাশিয়ার জাতীয় মর্যাদাবোধে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এটাই যেন প্রমাণিত হয়েছিল, ক্রীড়ার জগতে সমাজ-তান্ত্রিক দেশের কোনও স্থান নেই। এই সময়েই রাশিয়ায় সুরু হয় ব্যক্তিগত সাফল্যকে সম্মান দেওয়া। তৎসঙ্গেই চলতে থাকে সমবেত শারীর ক্রিয়াও। জনসমাজের মধ্যে বিপুলভাবে শারীর শিক্ষার কর্মসূচী বিস্তারের ফলে তার থেকে ক্রীড়া প্রতিভার উদ্ভব হবেই, একথাও ঘোষণা করলেন দেশের কর্ণধারগণ।

শারীর শিক্ষার যে কোনও কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য তার সুরু হওয়া উচিত শৈশবকালেই। এই কথা মনে রেখে রাশিয়াতে স্কুলের ১ম শ্রেণী থেকেই আবশ্যিক করা হলো শারীর শিক্ষাকে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত চললো তার অব্যাহত ধারা। প্রত্যেক স্কুলেই জিমনাসিয়াম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হলো। সুন্দর আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে খোলা জায়গাতেও নানারকম শারীর ক্রিয়ার ক্লাশ নেওয়া সুরু হলো। হাইস্কুলের শারীর শিক্ষার পিরিয়ডগুলিতে কখনও কখনও দুইটি শ্রেণীকে একত্রে যুক্ত করে ক্লাশ নেন শিক্ষকেরা। অবশ্য হাইস্কুলের শারীর শিক্ষার ভার একমাত্র শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের উপরই ন্যস্ত থাকে। প্রাথমিক ক্লাশে যতদিন না পর্যন্ত

রুশ বিপ্লবের পরবর্তী স্কুল কলেজের শারীর শিক্ষা

শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া গেছে ততদিন স্কুলের অন্য শিক্ষকেরাই তাদের শারীর শিক্ষার ক্লাশ দিতেন। স্কুলের ক্রীড়াসূচীতে হরেকরকম খেলা, মার্চিং, দৌড়, লাফানো, দড়ি বেয়ে ওঠা এবং কিছু ভারসাম্যের ব্যায়াম রাখা হলো। আর একজন অপরজনকে ঠেলা দেওয়া, টেনে ধরা এগুলি খেলার মতন করে শিক্ষা দিতে লাগলেন শিক্ষকেরা। ছাত্ররা যাতে এগুলিতে বেশ মজা পায় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হলো। জুনিয়র স্কুলগুলিতে এর সঙ্গে শারীর পটুতার পরীক্ষাও গ্রহণ করা সুরু হয়। স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, স্কেটিং এবং স্কিয়িং এর ব্যবস্থা হলো। ছাত্রীদের জন্য থাকলো নৃত্য ও ছন্দোবদ্ধ কয়েকরকম ব্যায়াম শিক্ষা। ছাত্রদের জন্য সামরিক ব্যায়ামও বাদ গেল না।

বর্তমানে স্কুলের কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রকের তৈরি সিলেবাস অনুসারেই সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। শারীর শিক্ষার ক্লাশের সুরুতে কিছুটা শরীর গরম করা ব্যায়াম যাকে পরিভাষায় ওয়ার্মিং আপ বলা হয়, সেই ব্যায়াম করানো হয়। পঁচিশ থেকে তিরিশ জন ছাত্রকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষাদান করা হয়। অত্যন্ত দক্ষতা সম্পন্ন এই ক্লাশগুলি পরিদর্শন করে বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও মুক্তকন্ঠে এর প্রশংসা করেছেন। শারীর শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য অন্যান্য পাঠনীয় বিষয়ের মত এতেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে দক্ষতা অনুযায়ী গ্রেড দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতি বছর তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকেরা সহায়তা করেন।

ক্রীড়া প্রতিভার সদ্ব্যবহারের জন্য যে দু হাজার স্পোর্টস স্কুল আছে সেখানে বিশেষ পারদর্শীদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অত্যন্ত দক্ষ সব ক্রীড়া শিক্ষক আছেন সেখানে যাঁরা সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের প্রতিভা স্ফুরণের সর্বরকম চেষ্টা করেন। কোনও কোনও শিক্ষার্থী সেখানে যায় স্কুল ছুটির পরে আবার কেউ সেখানকার বোর্ডিং থেকে ট্রেনিং নেয়। এই স্পোর্টস স্কুলগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার আছে "কাউন্সিল অফ ফিজিকাল কালচার এন্ড স্পোর্টসের" উপর। রাশিয়ার এই স্কুলগুলি থেকে ট্রেনিং নিয়ে অনেক ছাত্রই কীর্তিমান হয়েছে ক্রীড়া ক্ষেত্রে।

"দি স্টেট ইন্স্টিটিউট অফ ফিজিকাল কালচার অ্যান্ড্ স্পোর্ট" ১৯২০ সালে মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই রাশিয়ার বৃহত্তম শারীর

শিক্ষা কেন্দ্র। এক বিশাল প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটে একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম ও একটি পার্ক আছে। ল্যাবরেটরি, অডিটোরিয়াম কিছুরই অভাব নেই এখানে। ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সোসাইটির উদ্যোগে শারীর শিক্ষার নানারকম গবেষণা কার্য এখানে হয়।

শারীর শিক্ষা-কেন্দ্র

এছাড়া, আরও অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর শারীর শিক্ষা কেন্দ্র আছে লেলিনগ্রাড, স্মোলেনস্ক্, ওমাস্ক, উক্রেন, বাইলোরুশিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, জর্জিয়া, আজার বাঈজান, কাঝাকাস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিয়া প্রভৃতি স্থানে। এই সব কটি কেন্দ্রেই অসাধারণ পারদর্শী শিক্ষার্থীদের শিক্ষান্তে "প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদ" অথবা "সোভিয়েট দেশের দক্ষ প্রশিক্ষক" এই উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

এই ইনস্টিটিউটগুলির চার বছরের শিক্ষাক্রমে তিনরকম ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত আছে। শারীর শিক্ষার শিক্ষক, বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষক বা কোচ এবং ক্রীড়া-চিকিৎসক।

এগুলি সবই উচ্চতর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সম্পর্কে বলা হলো। এর চেয়ে ছোট শারীর শিক্ষা কেন্দ্রে দুই বা তিন বছরের শিক্ষাক্রম চালু আছে। সেখানে থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা সাধারণত মাধ্যমিক স্কুলে নিযুক্ত হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়াতে শারীর শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকেরা অত্যন্ত উচ্চ হারে বেতন পান যার ফলে সমাজে তাঁরা বেশ সম্মানিত আসনেই অধিষ্ঠিত।

বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট এবং ট্রেনিং স্কুল থেকে ২৭,০০০ দক্ষ ক্রীড়াবিদ শারীর শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসছেন।

রাশিয়ায় যে কয়টি শারীর শিক্ষার বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র আছে তন্মধ্যে মস্কোর কেন্দ্রটি বৃহত্তম। শিশুর বাড়ীতে থাকাকালীন অবস্থা, তার বাড়ন্তকালে শরীরের উপর জিমনাস্টিকের প্রতিক্রিয়া, দেহের উপর ক্লান্তির প্রতিক্রিয়া, খাদ্যের সঙ্গে ব্যায়ামের সম্পর্ক, কারখানার শ্রমিক ও মাঠের কৃষকের স্বাস্থ্য—এই বিষয়গুলি গবেষণার অন্তভু্ক্ত। এ ছাড়া যে সব খেলোয়াড় ও শারীর শিক্ষাবিদরা অন্তভু্ক্ত। এছাড়া, যে সব খেলোয়াড় ও শারীর শিক্ষাবিদরা কঠোর ট্রেনিং বা শারীর ক্রিয়ায় যুক্ত থাকে তাদের সর্বদাই দক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

গবেষণা কেন্দ্র

এই গবেষণা কার্য রাশিয়াতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। শিশুদের শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা এবং এ্যাথলেটিকস্ প্রশিক্ষণ এই গবেষণা কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এ্যাথলিটদের কী উপায়ে আরও দক্ষ করা সম্ভব, কেমন করে তারা আরও বেগে দৌড়াবে, আরও উঁচুতে লাফাবে, আরও শক্তিমান হবে তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল দেখা যায় স্টেডিয়ামের মাঠের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে।

গবেষকরা তাঁদের গবেষণা লব্ধ বিষয় এবং সে সম্পর্কে নানা মন্তব্য নিয়মিত ভাবে কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

শিশুদের শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়া

ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার শিশুরা স্বাস্থ্য প্রকল্পের কর্মীদের মনোযোগের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাদের মায়েরা নির্দেশ পান ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুকে কিভাবে যত্ন করতে হবে, তার স্বাস্থ্য নিরোগ রাখার জন্য কী কী করণীয় একটু বড়ো হলে শারীর শিক্ষার কোন বিষয়গুলি তার উপযোগী হবে। আর, বলতে গেলে জন্মের পর থেকেই শিশুকে শারীর পটুতার প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

ক্রেচ্ এবং ঐ জাতীয় স্কুলে ভর্তি করে শিশুদের স্বাস্থ্যবান করে তোলার চেষ্টা করা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে রাশিয়ার প্রায় দেড় কোটি শিশু ভর্তি হয়। সেখানে শারীর শিক্ষার সঙ্গে তাদের এক মধুর পরিচয় ঘটে। স্বাস্থ্য গড়ার নানা সাজ সরঞ্জামের মেলা সেখানে। তাদের উপযোগী জিমনাসিয়ামও আছে। কোনও কোনও ক্রেচে শারীর পটুতার উপায় হিসাবে ছোট ছোট সাঁতার-পুলও তৈরি হয়েছে। খুব কম বয়সেই জলের মধ্যে তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তারা মনের আনন্দে খেলা করে, একে অপরকে জল ছিটিয়ে মজা পায়। এমনি ভাবেই একদিন জলে ভাসতে শিখে ফেলে। ক্রেচ ও কিন্ডারগার্টেনের শিশুরা নানারকম খেলায় মত্ত থাকার ফলে শরীরে বেশ খানিকটা ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা লাভ করে। এরা অন্য শিশুদের মতন যখন তখন পড়ে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে কিংবা অন্যভাবে সহজে আহত হয় না। এদের অসুখ বিসুখও অন্যান্য শিশুদের চেয়ে অনেক কমই হয়। সুতরাং অনায়াসে বলা যায়, খেলাই শিশুদের স্বাস্থ্যবান হবার ভিত্তি প্রস্তুত করে। মস্কোর নিকটেই ঝেলেনোগ্রাডে একটি কিন্ডারগারটেন স্কুলের খেলার মাঠে ট্র্যাপিজ, দোলনা, রিং, রবারের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক খেলার সামগ্রী এবং আরও খেলার সরঞ্জাম আছে।

শিশুর জন্মের পরে পিতামাতাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কেমন করে তাদের দেহ মালিশ করে দেওয়া কর্তব্য। সেই সঙ্গে তার জন্যে তার উপযোগী জিমনাস্টিক ব্যায়ামও শিখিয়ে দেওয়া হয় পিতামাতাকে। স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে শিশুর দেহের স্বাভাবিক শক্তির সঞ্চার করে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

শিশুদের খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষাদান কালে একটি জিনিস সব সময়েই লক্ষ্য করা যায়। সেটা হলো যে, এ ব্যাপারে তাদের চেয়ে বেশি উৎসাহী আর কেউ নয়। আর, নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওরা ভয়ানক আগ্রহী। অন্যদের হারিয়ে দেওয়ায় তারা অফুরন্ত আনন্দ পায়। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এই মনোভাব শিশুদের সহজেই শারীর শিক্ষার বিভিন্ন খেলায় দ্রুত দক্ষ করে দেয়।

টানেলের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটা বড় বল ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া, কোমরে হাত রেখে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একেবারে পায়ের "টো" এর উপর ভর করে লাফিয়ে সম্মুখের বৃত্তাকারে তৈরি রিং এর মধ্যে লাফিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা, অগভীর সাঁতার পুলের এপার থেকে ওপারে যেমন করে খুশি অতিক্রম করা অথবা দেওয়ালে আটকানো কাঠের মই বেয়ে ওঠা—এই সব শারীর ক্রিয়ায় শিশুদের যে প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখা যায় তার তুলনা নেই। অবলীলাক্রমে মনের আবেগ আর উৎসাহে তারা এগুলি করে। অবশ্য, সর্বদাই সঙ্গে থাকেন তাদের শিক্ষক। শিশুদের শারীর ক্ষমতার ক্রমোন্নতির উপর তাঁদের দৃষ্টি সজাগ থাকে।

সম্প্রতি নির্মিত গোরি ক্রীড়া বিদ্যালয় গোরির গৌরব। ৬০০ শতর চেয়েও বেশি ছেলে মেয়ে এখানে নানারকম খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষায় বিশিষ্ট প্রশিক্ষকদের কাছে শিক্ষালাভ করে। শিক্ষণীয় বিষয় হলো—

গোরি শহরের স্পোর্টস স্কুল

বাস্কেটবল, ভলিবল, এ্যাথলেটিকস্, জিমনাস্টিক, ফ্রি-স্টাইল কুস্তি, জুডো, হ্যাণ্ডবল, রাইফেল সুটিং, সাইকেল চালানো, মুষ্টি যুদ্ধ এবং দাবা। এখানে একুশ জন শিক্ষক আছেন, তাঁরা সকলেই শারীর শিক্ষা এবং বিভিন্ন ক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞের ট্রেনিং প্রাপ্ত।

এখানে শিক্ষালাভের জন্য কোন চাঁদা বা ফি প্রয়োজন হয়না তবে ছাত্রদের নিজেদের লেখা পড়ায় কোনও রকম অবহেলা দেখালে এখান থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়। পড়াশুনার স্কুলের ফলাফল এনে দেখাতে হয়। অর্থাৎ শুধু খেলে বেড়ালে চলবে না।

নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও আসলে নিকিতন একটি জিমনাসিয়াম। এখানে কয়েকটি খেলারও বন্দোবস্ত আছে। বোরিস্ নিকিতিন নামে এক শারীর শিক্ষাবিদ এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এখানে জন্মের কয়েক মাস পর থেকেই শিশুকে শারীর শিক্ষার ট্রেনিং দেওয়া হয়। তিন মাসের শিশুকে ঝোলার জন্যে ছোট্ট কাঠের তৈরি হরাইজণ্টল বার দেওয়া হয়। আট মাসে তাকে আসল জিমনাসিয়ামের কিছু কিছু যন্ত্র ব্যবহার করানো হয়। অবশ্য সবই তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী। জোর করে কিছুই নয়। এর ফলে যেমন তার শরীর বাড়ে তেমনি সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে। পরবর্তী কালে, ঐ শিশুরা বড় হলে আলাদা ও বিশেষ রকম তাদের উপযোগী জিমনাসিয়ামে নিয়ে গিয়ে নানারকম শারীর ক্রিয়া করানো হয়। রিং এর উপর ঝোলা, কাঠের মই বেয়ে ওঠা ও কয়েক রকম জিমনাস্টিক যেগুলি মেঝের উপর করা যায়—এই সব তাদের অভ্যাস করানো হয়। পরীক্ষামূলক ভাবেও কিছু কিছু শরীর চর্চা করানোর ব্যবস্থাও আছে।

নিকিতিন বিশ্ববিদ্যালয়

সোভিয়েট রাশিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য প্রথম দুই বছর শারীর শিক্ষা আবশ্যিক। ছাত্রদের মধ্যে সাঁতার না-জানা ছাত্রদের সাঁতার শিখে নিতেই হবে। জিমনাস্টিক, সাঁতার, বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস্, টেনিস, স্কিয়িং, মোটর সাইকেল চালানো এবং পর্বতারোহণ এই বিষয়গুলি থেকে ছাত্রদের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে। প্রত্যেকটি ক্রীড়া বিষয়ের জন্যই ট্রেনিং প্রাপ্ত দক্ষ শারীর শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তাঁরা ছাত্রদের ট্রেনিং দেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের খেলাধুলার ব্যবস্থাপনার খ্যাতি অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার স্পোর্টস ক্লাবে ৩৪ টি বিভাগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়েই এই রকম স্পোর্টস ক্লাব আছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সেগুলি পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তৎসংক্রান্ত অর্থব্যয় করারও অধিকার তাদের আছে। শারীর শিক্ষক যিনি আছেন তাঁর ট্রেনিং দেওয়া ছাড়া ছাত্রদের ক্রীড়া বিষয়ক কাজগুলি পরিদর্শন এবং তদারক করা কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস

সোভিয়েটের টিবিলিসি বিশ্ববিদ্যালয় তার ক্রীড়া প্রাধান্যের জন্য অনেকের কাছেই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। রুশ বিপ্লব সমাপ্তির মাত্র এক

বছর পরেই অর্থাৎ ১৯১৮ সালে জর্জিয়াতে এই বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। এখানেই সোভিয়েট রাশিয়ার শারীর শিক্ষক ও ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের প্রথম ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ হয়। এখানকার ছাত্ররা এ্যাথলেটিকস, ফুটবল, কুস্তি, জিমনাস্টিক ও দাবা খেলায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। ক্রীড়াবিদ্ তৈরীর এই কারখানা সোভিয়েট রাশিয়ার এক পরম গর্বের বস্তু।

বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়

বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া দিবসের মধুর দিনগুলি। উৎসাহ, উদ্দীপনার অন্ত নেই কদাপি, বরং প্রতিবছর মনে হয় আরও জৌলুস, আরও প্রাণ সঞ্চারিত হলো। এই উৎসবের উৎস বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আজ তার প্রসার অনেক দূর পর্যন্ত। অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিভিন্ন খেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্র ছাত্রীই অংশ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদের সম্মুখে মুষ্টিযুদ্ধের রিং আর কুস্তির জন্য পুরু মাদুরে ছাত্ররা যখন মেতে ওঠে ঘুসোঘুসি ও নানা কৌশলী প্যাঁচের খেলায় তখন তার পাশে বসা গ্রাম থেকে আগত সঙ্গীতকারদের যন্ত্রের তারে তারে মন মাতানো বাজনা বেজে ওঠে; ক্রীড়া উৎসব তখন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক। অন্যান্য বিষয়ের মতই এর গুরুত্ব। শারীর শিক্ষার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনাও থাকে; এখানকার শারীর শিক্ষার প্রশিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ব বিজয়ী ক্রীড়াবিদও আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এখানে একটি দিনও বিনা শারীর শিক্ষায় অতিক্রান্ত হয় না। সকাল বেলা বোর্ডিং-এর বাইরে এসে নানারকম শারীর শিক্ষার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং আবার বিকালবেলা খেলার মাঠের প্রোগ্রাম।

সোভিয়েট রাশিয়াতে ১৯৫৭ সালে বুরেভেস্টনিক স্পোর্টস সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর ২২ লক্ষ সদস্যের অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। শিক্ষকও আছেন। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত। সারা দেশ জুড়েই এই সোসাইটির শাখা ছড়িয়ে আছে।

বুরেভেস্টনিক স্পোর্টস সোসাইটি

বুরেভেস্টনিক স্পোর্টস সোসাইটি নানারকম খেলাধূলার ব্যবস্থার বিপুল আয়োজন করেছে। ৫০টি বিশাল স্টেডিয়াম, ৭০টি সাঁতার পুল, ৪০০টি স্কি কেন্দ্র, আচ্ছাদিত এবং অনাচ্ছাদিত মিলিয়ে জিমনাসিয়ামের সংখ্যা প্রায় ৪৫০০। আর ক্রীড়া সরঞ্জামের সংখ্যা সীমাহীন। সেগুলি ব্যবহারের কোনও বাধা নিষেধ নেই। সদস্যরা প্রয়োজন মত সেগুলি ব্যবহার করেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষা নানা উপদেশ দেবার জন্য প্রতি স্কুলেই ডাক্তারদের একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি স্কুলেই ভালভাবে শেখানো হয়। আবার প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে ডাক্তাররা বিশেষ ভাবে শারীরিক পরীক্ষা করেন

স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য

বছরে দু'বার। কোন ত্রুটি থাকলে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের ও দায়িত্ব আছে। স্কুল ডাক্তার তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের টিফিনের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করাও ডাক্তারের কর্তব্যের অন্তর্গত। ক্যালোরি মূল্য হিসাব করে তিনি খাদ্য তালিকা ঠিক করেন। খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ফ্যাট ইত্যাদির কোনও ঘাটতি না থাকে সে দিকে তার দৃষ্টি সজাগ।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শারীর পটুতা বা সক্ষমতা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে পি, ডব্লিউ, ডি ব্যাজ বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়। পি, ডব্লিউ, ডি-র অর্থ হলো "প্রিপারেশন ফর ওয়ার্ক

পি, ডব্লিউ, ডি

এন্ড ডিফেন্স।" অর্থাৎ সবরকম কাজ ও দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

জনসাধারণের শারীর পটুতার মান লক্ষ্য করে দেশের কর্ণধাররা এর দু'বছর পূর্বেই ১৯২৯ সালে এই পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা কল্পনা সুরু করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন দেশের অগণিত শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের সঙ্গে শারীর শিক্ষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটা প্রয়োজন। সেই কারণে শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার পুনর্গঠন করা সুরু হলো এবং এর অল্প কিছুদিন পরেই দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে শারীর শিক্ষাও যুক্ত হলো। পি, ডব্লিউ ডি ব্যাজ অর্জন করার জন্য বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি শারীর ক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনরায় এই ব্যাজ অর্জনের মান পুনর্বিন্যাস

করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। পূর্বের অভিজ্ঞতা, শারীর শিক্ষা বিষয়ে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ইত্যাদিকে ভিত্তি করে পি ডব্লিউ ডি পরিকল্পনাটিকে নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও আধুনিক আরও কার্যকরী করা হলো।

এই প্রকল্পে বর্তমানে ৭ থেকে ৬০ বছর বয়সী পুরুষ ও নারীর জন্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত নানারকম শারীর চর্চার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

বর্তমানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ব্যাজ অর্জন করে নিজেকে ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। পি ডব্লিউ ডি ব্যাজ অর্জন করা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানায়, অফিসে, কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সকলেই এগিয়ে আসে এই সম্মান সূচক ব্যাজ সংগ্রহের জন্য। বিভিন্ন স্টেডিয়ামগুলিতে পি ডব্লিউ ডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শারীর শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে এই পি ডব্লিউ ডি প্রকল্পের অবদান অসামান্য।

সোভিয়েট রাশিয়ার শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়া জগতের অগ্রগতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শারীর শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য দেশের সর্বত্র অসংখ্য স্টেডিয়াম, জিমনাসিয়াম, সাঁতার পুল, খেলার মাঠ, স্কিয়িং কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন ইউনিয়নের সহায়তায় কারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট প্রশিক্ষকদের কাছে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে নিজেদের শরীরকে আরও বেশি কাজ করার উপযুক্ত করে তোলেন এবং সেই সঙ্গে যাঁদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভা নিহিত আছে তাঁরা সেগুলি বিকশিত করার সুযোগ পান। খেলাধুলার অর্ন্তনিহিত আনন্দের আকর্ষণে এইভাবে জনসাধারণের এক বিশাল অংশ এগিয়ে এসেছে, যার ফলে দেশের কর্মযজ্ঞের সাফল্য স্পষ্টতই দৃশ্যমান ও সেই সঙ্গে দেশের নানা উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শারীর শিক্ষার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে অদৃশ্য হয়েছে কর্মীদের ক্লান্তি, অবসাদ। তাঁরা এখন অল্প সময়ে আরও বেশি কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। সুতরাং, ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্য এইভাবে শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলাকে ব্যবহার করে সোভিয়েট রাশিয়া দেশপ্রেমের এক নব নিদর্শন স্থাপন করেছেন। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাবগুলির সদস্য-সংখ্যা চার কোটিরও বেশি।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শারীর শিক্ষা

বরফের উপর স্কেটিং খেলাটি রাশিয়াতে দারুণ জনপ্রিয়। এ খেলায় শরীরে ভারসাম্য বজায় রেখে পা দিয়ে গতি সঞ্চারের মধ্যে এক আশ্চর্য উন্মাদনা আছে যার মোহে সহস্র সহস্র রুশ ক্রীড়াবিদ এই খেলায় মত্ত হয়ে যায়। রাশিয়ার পথ ঘাট আর পাহাড় যখন বরফ মগ্ন থাকে তখন তার উপর দিয়ে পায়ে চাকা লাগিয়ে স্কেটিং করতে কার না ইচ্ছা জাগে, বিশেষত, খেলার আনন্দ যাদের ধমনীতে প্রবাহিত।

আইস-স্কেটিং বা বরফের উপর স্কেটিং

রাশিয়াই এই স্কেটিং খেলার জন্মভূমি। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আজ থেকে ৩২০০ বছর পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত ওডেসা বন্দরের নিকটবর্তী দক্ষিণ বাগ নদীর তীরে বরফের উপর লোকেরা স্কেটিং করতো। সম্ভবত, তারাই জগতের প্রথম স্কেটিং খেলোয়াড়।

বর্তমানে রুশ যুবক যুবতীদের মধ্যে দ্রুতগতির স্কেটিং বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। শীতকালীন অলিম্পিক খেলাতেও দ্রুত গতির স্কেটিং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্কেটিং এর প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে রুশ মেয়েদের সমকক্ষ কেউ নেই।

পঞ্চাশ বছরের কিছু পূর্বে তুষারাচ্ছন্ন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে বরফের উপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালানোর খেলা সুরু হয়েছে। রোমাঞ্চ ও সাহসিকতায় পূর্ণ এই খেলাটি সোভিয়েট দেশের এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। রাশিয়ার পূর্ব ও উত্তরাংশেই যুবকেরা এই খেলায় বেশি অংশগ্রহণ করে। বলাই বাহুল্য, এটি শীতের দেশেরই খেলা। করাতের মতো দাঁতযুক্ত এই মোটর সাইকেলগুলো কঠিন বরফ কেটে তীব্র বেগে অগ্রসর হয়। দলগত মোটর সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত তিনবারের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবারই রুশ দলই বিজয়ী হয়েছে।

বরফের উপর মোটর সাইকেল চালানো

এই বিপজ্জনক ও শিহরণ জাগানো খেলাটিতে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে প্রতি মুহূর্তেই। বিপদের সম্ভাবনার আরও কারণ হলো যে, এই মোটর সাইকেলে ব্রেক থাকে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েট রাশিয়াতে তুষার হকির প্রচলন হয়। এ বিষয়ে সেণ্ট্রাল আর্মি ক্লাবের অবদান স্মরণযোগ্য। বিশ্বের তুষার হকিতে রাশিয়াকে শীর্ষে তুলে ধরার জন্য এই ক্লাবের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনুকরণের পথে না গিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে খেলেই রাশিয়া

তুষার হকি

বর্তমানে তুষার হকি জগতের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত।

মল্লক্রীড়া বা কুস্তি

পৃথিবীতে মল্লক্রীড়ার কবে সুরু এ খবর অজানার অন্ধকারে ঢাকা। তবে ৪৫০০ বছরের প্রাচীন মিশরীয় সমাধিতে অনেকগুলি মল্লক্রীড়ার চিহ্ন বিদ্যমান। বর্তমান কমিউনিস্ট সরকারের শাসনকালের অনেক পূর্ব থেকেই রাশিয়ার পল্লী অঞ্চলে কুস্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল। উজবেকিস্তানের "কুরেশ" নামক কুস্তি সাতশ বছরেরও অধিক প্রাচীন। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল "কুরেশ" দ্বৈত কুস্তি। এই কুস্তির সুরু পর্ব ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রথমে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের কোমর বন্ধ শক্ত করে এক পা সামনে রেখে দাঁড়ায়। উজবেকিস্তানের পল্লী অঞ্চলে আজও 'কুরেশ' কুস্তি দর্শকদের চিত্তে চাঞ্চল্য জোগায়। কুরেশীদের প্রতি স্থানীয় লোকেরা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকায়।

এই 'কুরেশ' কুস্তির আবার দুরকম পদ্ধতি আছে। একটির নাম ফরঘানা, অপরটির বুখারা-খোরেজেম। যেহেতু "কুরেশ" কুস্তি ছিল উৎসবের অঙ্গ সেই কারণে এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পোষাকও ছিল বেশ জমকালো। ঢোলা ফুলপ্যাণ্ট, চেপ্টা ভোঁতা বুট জুতো আর তুলো ভরা পুরু জামা। কোমরে চওড়া বেল্ট। এই পোষাক আজও অপরিবর্তিত। কুস্তি সুরুর পূর্বে দর্শকদের মনোরঞ্জনার্থে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথমে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচে। হয়তো শরীর গরম করা এবং পেশী সচল করে নেওয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কুড়ি মিনিটের জন্য একবারের কুস্তিতে একজন অপরজনকে উঁচুতে তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে দিতে পারলেই তার জিৎ। বর্তমানে সোভিয়েট দেশে কুস্তি খুবই জনপ্রিয়। প্রায় ৭লক্ষ লোক কুস্তি করে।

ব্যাডমিন্টন

সোভিয়েট দেশে ব্যাডমিণ্টনের আবির্ভাব যদিও বেশি দিনের নয় তথাপি এই খেলার চমৎকারীত্বে হাজার হাজার পুরুষ ও নারী শাটলকক আর র্যাকেট হাতে নিয়ে নেমে পড়েছে কোর্টে। ১৯৬১ সালে ব্যাডমিণ্টন খেলা সরাসরি সরকারের স্বীকৃতি লাভ করার পরে সোভিয়েটের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন গঠিত হয়।

বর্তমানে প্রায় দেড়লক্ষ রুশ ব্যাডমিণ্টন খেলে। ব্যাডমিণ্টন সোভিয়েট রাশিয়ার যে রাজ্যগুলিতে অধিক জনপ্রিয় সেগুলির নাম হলো উক্রেন, বাইলোরুসিয়া, আর্মেনিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, সাইবেরিয়া। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কর্মীরা অবসর সময়ে ব্যাডমিণ্টন খেলে।

ফুটবলের জনপ্রিয়তা সোভিয়েট রাশিয়ায় বর্তমানে বিপুল পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। ফুটবল খেলায় বাস্তবিক কতজন অংশগ্রহণ করে সেটা বলা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে সরকারিভাবে এটা বলা সম্ভব ফুটবল যে, প্রায় ৪৫ লক্ষ খেলোয়াড় প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েট দেশের লোকেদের কাছে ফুটবলের আকর্ষণ এত বেশি যে, প্রায় সারা বছরই খেলোয়াড়রা অবসর সময়ে মেতে ওঠে এই খেলায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেক ক্লাবই ছোটদের জন্য একটা ফুটবল খেলার বিভাগ খুলেছে। সেখানে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সের ছেলেদের জন্য খেলার সুযোগ আছে। তারা প্রশিক্ষণও পায় সুদক্ষ কোচের কাছে। এদের মধ্যে যে সব খেলোয়াড়ের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের বিশেষ ধরণের ফুটবল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এদের জন্য আলাদা ফুটবল প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। রাশিয়ার বার্ষিক লেদার বল টুর্নামেণ্ট এমনি এক প্রতিযোগিতা। সেখানে শুধু ১০ থেকে ১৫ বছরের ছেলেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই লেদার বল প্রতিযোগিতার কার্যকারিতা যে কতখানি তা প্রমাণিত হয়েছে যখন এখানকারই অনেক প্রতিযোগী ভবিষ্যতে রাশিয়ার তারকা চিহ্নিত ফুটবল খেলোয়াড় হতে পেরেছে। এমন কি, বিলিসি ডায়মণ্ড ক্লাবের মতন শীর্ষস্থানীয় ক্লাবেও এই প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়রা পরবর্তী জীবনে স্থান করে নিতে পেরেছে।

সোভিয়েট দেশে বর্তমানে ফুটবল মাঠের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সুতরাং, সহজেই অনুমেয় খেলোয়াড়ের সংখ্যা কী বিপুল।

আন্তর্জাতিক ফুটবল জগতে রাশিয়ার প্রবেশ কাল হলো ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। তবে ১৯৪৬ সাল থেকেই প্রকৃত পক্ষে, রাশিয়ার প্রবেশ আধুনিক আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠে এবং এই বছরই সোভিয়েট দেশ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সংস্থা ফিফার সদস্য পদ লাভ করে।

সোভিয়েট রাশিয়া আধুনিক যুগের ফুটবল খেলার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করেছে এবং সেই অনুসারেই অনুশীলন করে। এই প্রসঙ্গে কিয়েভ ডায়নামো টিমের বিখ্যাত কোচ ভিক্টর ম্যাসলভের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিই ১৯৬৬-তে তাঁর টিমের মাধ্যমে ৪-২-২ প্রথায় খেলা রাশিয়াতে সর্বপ্রথম দেখান। সোভিয়েটের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোচই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু অবদান নিশ্চয়ই আছে। প্রথম শ্রেণীর সব ফুটবল কোচেরই ব্যক্তিগত চিন্তাধারা

প্রস্তুত কিছু বিশিষ্ট কৌশল ও প্রকরণ থাকে যেগুলি খেলার মধ্যে প্রয়োজনানুসারে প্রযুক্ত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবলের মান এখন তুঙ্গে। রাশিয়ার ফুটবলকে বিশ্ব পর্যায়ে তুলে নিতে দারুণভাবে সাহায্য করেছেন সুদক্ষ কোচেরা। সরকারি সহযোগিতাও অবশ্য সর্বদাই বর্ধিত হয়েছে নানাভাবে।

জনপ্রিয়তায় এদেশের ফুটবলের স্থান তুষার-হকির পরেই। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফুটবলের খবর বিশেষ প্রাধান্য পায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতির সঙ্গে ফুটবল খেলার আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দেশের আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য একত্রে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সঙ্গে ফুটবল খেলার মূল পদ্ধতির মিল লক্ষ্যণীয়। ফুটবল খেলায় সাফল্যের জন্য, অর্থাৎ গোল দেবার জন্য খেলোয়াড়রা পরস্পরের সহযোগিতায় একত্রে অগ্রসর হয়। সাফল্যের সেটাই চাবিকাঠি। কে জানে, সোভিয়েটের ফুটবলের প্রতি এতো প্রীতির সেটাই প্রধান কারণ কিনা।

সোভিয়েট রাশিয়াতে দাবা খেলার জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। সেখানে যে দুই শতাধিক ক্রীড়া-বিদ্যালয় আছে সেগুলির দাবা বিভাগে প্রায় ২৫০০০ হাজার ছেলেমেয়ে দাবা খেলা শেখে। দাবা-শিক্ষকের সংখ্যাও

দাবা

প্রায় ৬০০ শত। ছেলে মেয়েদের জন্য দাবা খেলার সুযোগ শুধু ক্রীড়া-বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যালয়েও দাবা খেলার ব্যবস্থা আছে।

গত অর্ধ শতাব্দী জুড়ে দাবার প্রচলন দারুণ ভাবে প্রসার লাভ করেছে রাশিয়ায় অসংখ্য জনগণের মধ্যে। ক্লাবে, স্কুলে, গৃহস্থের বাড়ীতে সর্বত্র প্রবেশ করেছে দাবা তার নিজস্ব আকর্ষণের জোরে। আজকের রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ দাবায় মশগুল। নিত্য নতুন দাবা ক্লাব জন্ম নিচ্ছে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে।

বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়াতে সংখ্যাতীত দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন রাজ্যের নানা স্থানে। প্রতিযোগীর সংখ্যাও নিত্য বর্ধমান।

কুবান অঞ্চলের ক্র্যাসনোদার স্থানটি দাবা খেলার জন্য বিশেষ পরিচিত। এখানে একটি বিশাল আকারের দাবা ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। এখানে নিয়মিত ভাবে দাবা খেলার ক্লাশ নেওয়া হয়। পাঁচ ছয় বছরের শিশুরাও এখানে খেলতে আসে। বার্ষিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়রদের মধ্যেও দাবা প্রবেশ করেছে তার মস্তিষ্ক প্রয়োগের অসামান্য ঐশ্বর্যের জোরে। আজকের রাশিয়ায় এমন বিজ্ঞান গবেষণাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে দাবা প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয় রাশিয়ার দাবা। দাবার আলোচনা সভা, বক্তৃতা ও প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

সম্প্রতি, মস্কোর কেন্দ্রিয় দাবা ক্লাবে একটি দাবা সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েটের দাবা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যে ট্রফিগুলি পুরস্কার পেয়েছে সেগুলি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। দাবার এই সংগ্রহশালাটি সোভিয়েট সমাজে দাবা খেলার জনপ্রিয়তা ও তার প্রতি গভীর মর্যাদাবোধের স্বাক্ষর বহন করে।

যে খেলা যে দেশে অধিক জনপ্রিয় সেই খেলার মানও সেখানে স্বভাবতই খুবই উঁচুতে উঠে যায়। চর্চা থেকেই জন্ম কুশলতার, নিপুণতার। চর্চার কোনও বিকল্প নেই। এই কারণেই রুশ দাবা দাবা-প্রতিভা জগতে আবির্ভূত হয়েছেন আনাতোলি কারপোভের মতো আশ্চর্য প্রতিভার, যিনি তিনবার বিশ্বজয়ী হয়েছেন, এবং যাঁর তুলনা তিনি নিজেই। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানের পদবী—'অর্ডার অফ লেনিন'' অর্পণ করা হয়েছে তাঁকে।

দাবা খেলার দলগত বিশ্বপ্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার কৃতিত্ব বিস্ময়কর। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত একটানা বারো বছর সোভিয়েট রাশিয়া বিজয়ী হয়েছে।

মানুষের মনন সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় দাবা খেলা বুদ্ধিজীবীদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গভীর চিন্তাশক্তি এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধির এক আশ্চর্য আকর দাবার চালগুলি। মানুষকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে, অর্জুনের লক্ষ্যভেদের একাগ্রতা এনে দেয়, জ্ঞানী রাজনীতিবিদের মতো দূরদর্শী হতে শিক্ষা দেয়। আর, শিক্ষা দেয় আক্রান্ত হলে যুযুৎসু কিংবা জুডোর মতো কৌশল প্রয়োগে বিপদের জাল থেকে নিজেকে নিষ্ক্রান্ত করা। আক্রমণে প্রয়োজন নিখুঁত বিশ্লেষণপূর্ণ নিপুণ মস্তিষ্ক চালনা, যার সম্পাদনে বিপক্ষ বিপর্যস্ত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা শুধু প্রতিযোগিতায় জগিং বা ধীরগতি দৌড় জয়লাভের জন্য নয়, স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য নয়। মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পদে ভরপুর রাখা এবং দেহের যন্ত্রাবলীর

সচলতাকে দীর্ঘতর করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

যে কোনও বয়সের মানুষের ধীরগতি দৌড় বা জগিং এর জন্য এদেশে কয়েকটি দৌড় ক্লাব গঠিত হয়েছে। মুখ্যত, শহরের বাসিন্দাদের জন্যই এই ক্লাবগুলির সৃষ্টি। বহুল প্রচারিত সোভেটস্কি স্পোর্ট নামক সংবাদ পত্রটি জগিং এর উপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও ক্রীড়াবিদের প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনসাধারণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। কী ভাবে এই দৌড় হৃদযন্ত্রের কাজটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে কিংবা ফুসফুস ও পাকস্থলিকে সবলতর করে মানুষের সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায়।

সোভিয়েট দেশে আজকের দিনে জগিং এত প্রচলিত যে অফিসে অথবা কারখানায় একজন কর্মী অপর সহকর্মীকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—আজকে জগিং করেছো তো ?

খেলাধুলা ও শারীর শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া কোনও রকম কার্পণ্য করেনি। এর জন্য নির্মাণ করেছে আশাতীত সংখ্যার ক্রীড়াকেন্দ্র। বর্তমানে রাশিয়াতে স্টেডিয়ামের সংখ্যা তিন হাজার, জিমনাসিয়াম চল্লিশ হাজার, খেলার মাঠ পঁচাশি হাজার, আড়াই লক্ষ ভলিবল কোর্ট ও প্রায় দেড় হাজার সাঁতার পুল।

শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার স্থানের ব্যবস্থা

এছাড়া, লেনিন স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে ৪৬৪ একর জমির উপর। ১৯৫৬ সালে নির্মিত এই স্টেডিয়ামে এক লক্ষ পাঁচ হাজার দর্শকের বসার আসন আছে। এই মহাক্রীড়াঙ্গনে প্রায় সর্বরকম ক্রীড়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। অনেকগুলি খেলার মাঠ, সাঁতার পুল, ইনডোর স্কেটিং, শিশুদের ক্রীড়া বিদ্যালয় এবং সব রকম মানুষের জন্য শরীর চর্চা-কেন্দ্র এই স্টেডিয়ামের অন্তর্গত। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এখানে খেলাধুলায় রাজসূয় যজ্ঞের মতো ব্যবস্থা আছে।

মস্কো শহরের উপকন্ঠে লুঝ্নিকি নামক গ্রামে এই মস্কো লেনিন স্টেডিয়াম অবস্থিত। সোভিয়েট দেশের যে কোনও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য এই স্টেডিয়ামটি ব্যবহৃত হয়।
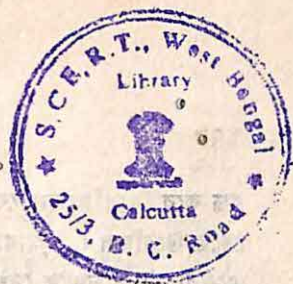
গ্রেট বৃটেন

প্রাচীন গ্রীস পৃথিবীকে দিয়েছিল প্রতিযোগিতার দ্বারা ব্যক্তির জয়-জয়কার এবং গুরুত্বলাভ। অপর পক্ষে গ্রেটবৃটেন ব্যক্তির বদলে দলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দলের গৌরবকে উঁচুতে তুলে ধরেছে যার ফলে উদ্ভব হয়েছে দলগত সংহতি, শৃঙ্খলাবোধ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, নেতৃত্ব করার যোগ্যতা, খেলোয়াড়ী মনোভাব, সহ-যোগিতার হাত বাড়ানো ইত্যাদি অনেক মানবিক গুণ। যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি জিমনাস্টিকের চর্চায় মগ্ন বৃটেন তখন আউটডোর খেলায় মাঠে মাঠে শরীর চর্চা আর আনন্দের উৎস ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলায় অতিবাহিত করেছে।

গ্রেট বৃটেন

পৃথিবীর শারীর শিক্ষা জগতে বৃটেনের সবচেয়ে বড়ো দান নিঃসন্দেহে দলগত খেলা। যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বের মাত্র ২% মানুষের বাস তারাই আপাতদৃষ্টিতে মন্ত্রবলে প্রায় সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েছে দলগত খেলার উন্মাদনা। এই মন্ত্র আর কিছুই নয়, ফুটবল, ক্রিকেট, হকির অন্তর্নিহিত আশ্চর্য আকর্ষণ আর সূক্ষ্ম কলা কৌশলের সৌন্দর্য। যে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হতো না তার সর্বত্র যখন ইংরেজ সামরিক বাহিনীর লোক, রাজ কর্মচারি, অন্যান্য কর্মচারি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্রেরা ইংলণ্ডের বাইরে অন্যান্য দেশে নিজ নিজ কর্মস্থলে কিংবা বিদ্যাস্থানে অবসর বিনোদনের জন্য এই খেলাগুলিতে নিজেরা অংশ গ্রহণ করতো তাদের খেলা দেখে সেইসব স্থানের যুবকেরাও শিখে নিয়েছিল খেলাগুলি। এইভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বড়ো ঘাঁটি বিশাল ভারতবর্ষেও প্রচলিত হয়েছিল ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি খেলা। এই দলগত খেলাগুলির নিজস্ব আকর্ষণই সাহায্য করেছিল এদের বিস্তৃতি ও প্রসার।

ইংলণ্ডের লোকেরা যে শুধু দলগত খেলাতেই অংশ নিয়েছে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে সর্বত্রই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল তীরন্দাজী। দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সকলের হাতেই ছিল তীরধনুক। এই সময় ইংলণ্ডের রাজারা কয়েকটি খেলাকে ঘোষণা দ্বারা

বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেননা সৈন্যরা তীরন্দাজীর চেয়ে ঐ খেলায় বেশি মেতে উঠেছিল। আবার পিউরিটান বা রক্ষণশীলেরাও এই খেলাগুলিকে একেবারেই সুনজরে দেখতেন না। তবে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাধা বিপত্তির কালো মেঘ বিদীর্ণ করে দলগত খেলাগুলি পুনরায় বেরিয়ে এলো পূর্ণ-জ্যোতিতে।

ইংরেজ জাতি বুঝেছিল যে, শারীর শিক্ষা শুধু কঠোর জিমনাস্টিক আর এ্যাথলেটিকসের দৌড় ঝাঁপ এবং বর্শা নিক্ষেপ নয়। শারীর শিক্ষার যে বিষয়ের মধ্যে আছে নির্মল আনন্দ, অনিশ্চয়তার দোলা, জয় পরাজয়ের উল্লাস সেখানে অংশগ্রহণে এক আলাদা আস্বাদান পাওয়া যায়। সেই কারণে ফুটবল, ক্রিকেট, হকিতে এত ছেলের ভিড়। আবার ইংলণ্ডের জলবায়ু ও আবহাওয়াও মানুষকে ঘরের বাইরে টেনে এনে খেলার মাঠে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে যখন মাঝে মাঝে মেঘমুক্ত হয়ে নীল আকাশ প্রকাশ পায় আর উজ্জ্বল হলুদে রোদ্দুর জ্বলে ওঠে তখন দলে দলে ঘরে ঠাণ্ডায় জমে থাকা মানুষগুলো বেরিয়ে পড়ে রোদ্দুরে স্নান করতে। আর যারা ভালোবাসে খেলার মাঠ তারা ফুটবল অথবা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে মেতে ওঠে খেলার আনন্দে। সেখানে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধারাও হাজির হন দর্শকের আসনে। হয়তো তাঁদের মধ্যে জ্যাক্ হবস্ কিংবা লারউডের মতন ক্রিকেট খেলোয়াড়ও থাকেন যাঁরা, এইসব খেলা দেখতে নিজেদের পূর্বগৌরবের কথা চিন্তা করে তৃপ্তি পান। হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এই ভেবে, হায়রে যদি যৌবনকালটা ফিরে পেতাম।

বৃটেনের শারীর শিক্ষায় জিমনাস্টিকের পদক্ষেপ খুব বেশি দিনের নয়। দুশো বছর বয়স হয়নি এখনও বৃটেনের জিমনাস্টিকের। বৃটেনের জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা যেতে পারে—জিমনাস্টিক এখনও

জিমনাস্টিক

ডবল সেঞ্চুরি করতে পারেনি। ফোকিয়ান ক্লায়াস নামে সুইজারল্যাণ্ডের এক সামরিক অফিসার লণ্ডনে এসে প্রথমে জার্মানির প্রথায় জিমনাস্টিক শিক্ষা দিতে সুরু করলেন। অবশ্য তিনি বৃটেনের শুধু সামরিক বাহিনীর লোকদেরই এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর অন্যান্য কয়েকজন জিমনাস্টিক বিশারদও পরবর্তীকালে এসে বৃটেনের জিমনাস্টিক কর্মসূচীকে সমৃদ্ধ করলেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁদের কয়েকজনের নাম হলো বেটন, এরেনহফ্ এবং কার্ল অগাস্ট। এঁরা সকলেই সুইজারল্যাণ্ডের জিমনাস্টিক প্রথায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঐ সময় অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডের প্রথাই ছিল আধুনিক ও

বিজ্ঞানসম্মত হিসাবে সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত প্রথা। তবে শারীর শিক্ষায় জিমনাস্টিকের প্রচারে ব্রটেন আর্চিবল্ড ম্যাকলারেনের কাছেই বেশী ঋণী। যদিও স্কটল্যাণ্ডেরই লোক কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে ইনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে চিকিৎসাবিদ্যা, অসি চালনা ও জিমনাস্টিকে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শারীর বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় ম্যাকলারেন জিমনাস্টিকের উপকারিতা কী এ বিষয়ে অধিক অবহিত ছিলেন। অক্সফোর্ডে তিনি নিজস্ব একটি জিমনাসিয়াম স্থাপন করে তার নামকরণ করেন "জিমনাসিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়"। তিনি সকলের জন্য একই রকমের ব্যায়াম করার বিরোধী ছিলেন। তীক্ষ্ন বাস্তব জ্ঞানী ম্যাকলারেন সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানির দুইরকম জিমনাস্টিক প্রথার মিশ্রণ করে এমন একটি প্রথা বা পদ্ধতি তৈরি করলেন যেটা ব্রটেনের পক্ষে নানাভাবে উপযোগী। জিমনাস্টিক ব্যায়াম সম্পর্কে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, যদিও জিমনাস্টিক ব্রটেনে যথেষ্ট প্রচলিত হলো কিন্তু বিভিন্ন খেলার সমান মর্যাদা লাভ তার কোনও দিনই ঘটেনি। খেলার আকর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিমনাস্টিক বরাবরই পিছনে পড়ে গেছে। পাবলিক স্কুলগুলিতেও একই মনোভাব বিরাজ করেছে ছাত্রদের মধ্যে।

ব্রটেনের বিভিন্ন খেলাধুলা

ব্রটেনের খেলাধুলার মধ্যে নিম্নলিখিত খেলাগুলি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়ঃ—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, গলফ্, ব্যাডমিণ্টন, বোলিং খেলা, পোলো, এ্যাথলেটিকস্, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, বিভিন্ন জলক্রীড়া, সাইকেল চালানো, পর্বতারোহণ, ঘোড়-দৌড়, মোটর রেস, রাইফেল সুটিং, বিভিন্ন ইন্‌ডোর খেলা।

ফুটবল

ফুটবল খেলা মধ্যযুগে শহরের পথে পথে খেয়াল খুশির নিয়মে চলতো। আবার, পাশাপাশি দুই গ্রামের গ্রামসুদ্ধ লোকের মধ্যেও চলতো ফুটবল খেলা। উল্লাসের আতিশয্যপূর্ণ এই ফুটবল খেলাই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের সুসংবদ্ধ চেহারা লাভ করেছে।

আঠারো এবং উনিশ শতকে ফুটবল খেলা ইংলণ্ডে একটা বাস্তব সম্মত রূপ ধারণ করে। এর জন্যে সেখানকার পাবলিক স্কুলগুলির প্রচেষ্টা প্রণিধানযোগ্য। ড্রিবলিং এবং কি কিং-এর মাধ্যমে ফুটবল খেলা এখানেই

আরম্ভ হয়েছিল। এর পূর্বে ফুটবল খেলায় দৈহিক শক্তি প্রয়োগই ছিল প্রধান বস্তু। লাথি মারা ও সজোরে ধাক্কা দেওয়াই ছিল খেলার প্রধান কৌশল বা প্রথা। এইজন্যে এই খেলাকে তখন অনেকে নিছক মারামারি বলে অভিহিত করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে ফুটবলকে এক মহৎ খেলায় পরিণত করার জন্য প্রয়োগ করা হলো বুদ্ধি, সূক্ষ্ম কৌশল, বল নিয়ে এগিয়ে যাবার সময়ে বিপরীত পক্ষের খেলোয়াড়কে পায়ের মোচড়ে বোকা বানিয়ে তাকে অতিক্রম করা, নিজের দলের খেলোয়াড়কে বল ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি কৌশল। এইভাবে ফুটবলকে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর দলবদ্ধ খেলায় পরিণত করা হলো। বর্তমানের ফুটবল খেলার প্রথা প্রকরণ প্রায় সবই বৃটেনের দান।

১৮৬৩ সালে ইংলণ্ডের ফুটবল এ্যাসোসিয়শন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এ্যাসোসিয়শনের প্রধান কর্তব্য হলো সর্বত্র ফুটবল খেলার উন্নতি সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। ইংলণ্ডের ফুটবল ক্লাবগুলিকে এই এ্যাসোসিয়শনের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। ফুটবল এ্যাসো-সিয়শনকে সংক্ষেপে এফ, এ বলা হয়। এর নানা ব্যয় মেটাবার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্যের একটা বড়ো অংশ এফ, এর ভাণ্ডারে জমা পড়ে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শকের প্রবেশ মূল্য থেকে রীতিমত মোটা অঙ্কের অর্থই সংগৃহীত হয়।

ফুটবলের পরেই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় প্রধান জনপ্রিয় খেলা অবশ্যই ক্রিকেট। ফুটবলের মতো আধুনিক ক্রিকেটের জন্ম ইংলণ্ডেরই মাঠে। দ্বাদশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার নজির আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, সন্ন্যাসীরা ১৩৪৪ সালে ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। তবে তখনকার ক্রিকেট খেলার সঙ্গে আধুনিক ক্রিকেটের পার্থক্য বিস্তর। ইংলণ্ডে তারপরেও ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল। তবে ক্রিকেট খেলার মোটামুটি নিয়ম কানুন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সুরু হয়। ঐ সময় ব্যাট এবং স্টাম্পের আকৃতিও ছিল কিঞ্চিৎ পৃথক। হ্যাম্পশায়ারে হ্যাম্বলডন নামে একটি ক্রিকেট ক্লাব গঠিত হয়েছিল ১৭50 খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় মাঝে মাঝে যে ম্যাচ খেলার বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে, ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকতেন এক দলে। মাত্র দুটি করে স্টাম্প থাকতো ব্যাটসম্যানের পিছনে। কিছু কাল পরে অবশ্য তৃতীয় বা মাঝখানের স্টাম্প পোঁতা হয়।

ক্রিকেট

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় ক্রিকেট পাগল যুবকের চেষ্টায় গঠিত হয় মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব। হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাব তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার পরেই এইরকম একটি ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আর্ল অফ উইংকেস্টার এবং ডিউক রিচমণ্ড এবং তাঁদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ক্রিকেট প্রেমী বন্ধুরা সমবেত হয়ে একটি ক্রিকেট ক্লাব স্থাপন করলেন। এই ক্লাবই প্রথমে অন্য নামে পরে এম, সি, সি নাম গ্রহণ করে। এই সময় ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার জন্য অনেকেই ছুটে আসতেন। এই খেলার ধরণ অন্যতর। এর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন আস্বাদন আছে যা অন্য খেলাগুলির থেকে একেবারেই পৃথক।

এম, সি, সি

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবই ইংলন্ডের তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম ক্রিকেট ক্লাব। ক্লাবের নিজস্ব লর্ডস মাঠে এম, সি, সি প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ১৮১৪ সালে। বিরুদ্ধ পক্ষ ছিল হার্টফোর্টশায়ার।

লর্ডস মাঠের সম্মুখেই খুব স্পষ্ট করে লিখিত আছে—"প্লে দি গেম," অর্থাৎ খেলোয়াড়দের প্রতি আবেদন রইলো তারা যেন সর্বদাই খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়েই মাঠে নামে। খেলার পবিত্রতা যেন কদাচ নষ্ট না হয়।

এম, সি, সি, বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান। ক্রিকেট খেলার নতুন নিয়মকানুন তৈরি করা কিংবা পরিবর্তন করা এরই কাজ। অবশ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার দ্বারা সেগুলি অনুমোদিত করতেই হয়।

পূর্বে যখন ইংলণ্ডের জাতীয় ক্রিকেটদল অন্য দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলতো তখন এম, সি, সি নামেই খেলতো অর্থাৎ এম, সি, সি মানেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট।

ক্রিকেট খেলা ইংলন্ডের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্রই হয়। অন্যান্য যে দেশগুলিতে ক্রিকেট খেলা হয় তার সঙ্গে ইংলণ্ডের তফাৎ এই যে, এখানে শুধু শুকনো মাঠেই খেলা হয়, তা নয়। সাধারণত, মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষার মধ্যেও ক্রিকেট চলে। অল্প বৃষ্টি-ভেজা মাঠে তো বটেই, এমন কি সামান্য ঝির ঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও খেলা চলে। অবশ্য, এখানকার মাটি ঐ রকম বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত হয় না। সেখানে ব্যাটিং করা অসুবিধা হলেও অসম্ভব নয়। সেঞ্চুরিও করেন ব্যাটসম্যানরা ঐ পিচে।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট এবং টেস্ট খেলা

বস্তুত, এখানকার ভিজে আবহাওয়ায় ওপেনিং বোলারদের খুবই সুবিধা হয়। সুইং বোলিং অর্থাৎ শূন্যে হাওয়ার সাহায্যে বলের গতি পরিবর্তন করা বেশ সুবিধা হয়। ব্যাটসম্যানকে বিপাকে ফেলা সহজতর হয়। এই আবহাওয়ায় বোলাররা বিলম্বিত ইন এবং আউট সুইং এবং সুইংকে ইচ্ছা মত কমানো বাড়ানো—ইত্যাদি কৌশলগুলি প্রয়োগ করতে কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়া, বৃষ্টি-ভেজা পীচ যখন শুকনো হতে থাকে সেই সময় আবার স্পিনারদের পোয়া বারো আর ব্যাটসম্যানদের বেগতিক অবস্থা। এই জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংলণ্ডেই হয় ব্যাটসম্যানের অগ্নি পরীক্ষা। তাদের কষ্টিপাথরে যাচাইও বলা যেতে পারে।

টেস্ট খেলাই ক্রিকেট খেলার সর্বোচ্চ খেলা। টেস্ট খেলা প্রথম সুরু হয় ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে। দিল্লীর "সান" পত্রিকার-১৯৮১ সালের ১৪ই নভেম্বরের প্রকাশনা থেকে জানা যায় যে, ইংলণ্ডের বুকে প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৮৮০ সালে। ওভাল নামে মাঠের তিন দিনের এই টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডই জয়ী হয়েছিল। ইংলণ্ড তার পূর্ণ শক্তি নিয়েই মাঠে নেমেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অষ্ট্রেলিয়ার দ্রুততম "দানব" বোলার স্পফোর্থ সেই খেলায় হাতের ব্যথার জন্য খেলতে পারেন নি। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৪২০ রান সংগ্রহ করে। তার মধ্যে ইংলণ্ডের ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ ডব্লিউ জি গ্রেস ১৫২ রান করেন।

প্রথম টেস্ট খেলা

40,000 হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই খেলার শেষে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের দর্শকদের অনুরোধে বক্তৃতাও দিতে হয়েছিল।

দুই দলের অধিনায়ক ছিলেন লর্ড হ্যারিস ও ডব্লিউ এল মারডক্। প্রথম জন ইংলণ্ডের, দ্বিতীয় জন অষ্ট্রেলিয়ার। এই ঐতিহাসিক ম্যাচে ইংলণ্ড দলে ছিলেন—লর্ড, হ্যারিস, ডব্লিউ জি গ্রেস, জি, এফ, গ্রেস, ই, এম, গ্রেস ; এ, শহ্, এ, লিটেলটন, ডব্লিউ বার্নেস, এফ, মীল, এফ, পেন, এ, পি, লুকাস এবং এ, জি, স্টিল।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলাকে যাঁরা নিজেদের অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যে উজ্জ্বল করে গেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম হলো, ডব্লিউ জি গ্রেস, সি, বি, ফ্রাই, চ্যাপম্যান, রোডস্, স্যান্ডহ্যাম, আর্থার গিলিগান, ডগ্লাস জার্ডিন, লারউড্, জ্যাক হবস, হারবার্ট সাটক্লিফ্, ফ্র্যাংক্ উলি, ওয়ালি হ্যামন্ড, মরিস টেট, লেসলি এমস্, ভেরিটি, লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন প্রভৃতির নাম

কয়েকজন ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড়

উল্লেখযোগ্য।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৯৭টি সেঞ্চুরি অধিকারী জ্যাক হবস্‌কে ক্রিকেট খেলার অন্যতম নিখুঁত ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে গণ্য করা হয়। সাটক্লিফের সঙ্গে তাঁর প্রথম উইকেটের জুটি ছিল অসামান্য মজবুত। দু'জনের পরস্পরের মন বোঝাবুঝি এতে পরিষ্কার ছিল যে, প্রায়ই শুধু পরস্পরের চোখে চোখ রেখেই এ'রা ছোট রান চুরি করে নিতেন, যাকে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয় "টু স্টিল এ সিঙ্গল রান।"

অত্যন্ত দ্রুতগতি বোলার লারউড সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার রূপে পরিগণিত হন। তিনি অনেক বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদেরও রীতিমত ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। লারউডের "বডি লাইন" বোলিং এতই মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে, ক্রিকেট আইনে বারবার এই ধরণের বোলিং বে আইনী ঘোষণা করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ডন ব্র্যাডম্যান এমন অসাধারণ ব্যাটিং সুরু করেছিলেন যে, কোনও রকম বোলিংই তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। ব্র্যাডম্যানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্যই ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন লারউডকে ঐ বডি লাইন বাম্পার বোলিং করতে প্রণোদিত করেছিলেন।

ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ছিলেন ওয়ালি হ্যামণ্ড। ইনি বিশ্বের তৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম ছিলেন অবশ্যই ব্র্যাডম্যান। হ্যামণ্ড টেস্ট খেলায় ৭২৪৯ রানের অধিকারী। তার কালে এটাই ছিল টেস্ট খেলায় সর্বোচ্চ রান। ৮৫টা টেস্ট খেলে তিনি ১১০টা ক্যাচও ধরেছিলেন। হ্যামন্ডের শ্রেষ্ঠ মার ছিল কাভার ড্রাইভ।

ডেনিস কম্পটন ইংলণ্ডের এক অসাধারণ প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আগুনের ফুলকির মত রান বেরুত তাঁর ব্যাট থেকে। উইকেটের চতুর্দিকে সব রকমের ড্রাইভ, কাট, হুক, পুল, গ্ল্যান্স এই সটগুলি মেরে ফিল্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। বিপরীত দলের অধিনায়ক তখন ভাবতেন, আহা, যদি ১১ জনেরও বেশি ফিল্ডার নেবার নিয়ম থাকতো। ডেনিস কম্পটন ফুটবলেও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি ভারতে কয়েক বছর অবস্থান কালে তাঁর ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি রঞ্জি প্রতি-যোগিতাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ইংলণ্ডের সর্বযুগের অন্যতম সেরা প্রথম জুটির খেলোয়াড় লেন

হাটন ডন ব্র্যাডমানের টেস্ট ম্যাচে ৩৩৪ রান অতিক্রম করে ৩৬৪ রান করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। নিখুঁত ব্যাটিং এর জৌলুসে লেন হাটন ইংলণ্ডের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সর্বশেষে বলি সর্বপ্রথমের কথা। পেশায় চিকিৎসক গ্রেসকে বলা হয় আধুনিক ক্রিকেট খেলার জনক। তাঁর পুরানো ব্যাটিং এর ছবি দেখলেই বোঝা যায়, একেবারে আধুনিক পদ্ধতির ভঙ্গী। অনেক রানের অধিকারী এবং কত চমকপ্রদ ইনিংসের অংশীদার ডাঃ গ্রেস পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসের মোহময় কিংবদন্তীর নায়ক।

ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর একবার লর্ডসের মাঠে একটি প্রদর্শণী খেলায় ডাঃ গ্রেস অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই খেলাটি একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কানায় কানায় পূর্ণ দর্শকের আসন সম্বলিত লর্ডস্ মাঠে যখন গ্রেস ব্যাট হাতে ধীরে ধীরে উইকেটের দিকে অগ্রসর হলেন সেই বিশাল জনসমাবেশের সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে করতালি ধ্বনি সহকারে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তারপর এক অভাবনীয় কাণ্ড। নিখুঁত ভঙ্গীতে দাঁড়ানো গ্রেসের বিরুদ্ধে বোলারের প্রথম বলটিই তাঁর ব্যাটের এক দিকের প্রান্তভাগ স্পর্শ করে সোজা উই-কেটকীপারের গ্লাভ্সে জমা হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বোলারের আবেদনে আম্পায়ার তর্জনি তুলে আউটের সংকেত জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্যাভিলিয়নের পানে রওনা হওয়ার বদলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডাঃ গ্রেস উচ্চকণ্ঠে ঐ আম্পায়ারকে আদেশ করলেন—নামাও তোমার আঙ্গুল। লর্ডসের এতো দর্শক কি তোমার ঐ আঙ্গুল তোলা দেখার জন্য এখানে এসেছেন? ওঁরা আমার খেলা দেখার আগ্রহেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করে গ্রেস তৎক্ষণাৎ আবার প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন পরের বলটি খেলার জন্য। বলা বাহুল্য, এতে সকলেই পরম প্রীত হয়েছিলেন, হয়তো সেই আম্পায়ারও। তারপর ডব্লিউ, জি, গ্রেস তাঁর রাজকীয় ব্যাটিং এ ক্রিকেট খেলার সব রকম স্ট্রোক বা মারের যেন এক প্রদর্শনী মেলা বসিয়ে দিলেন। দর্শকেরা প্রাণ ভরে সেই ব্যাটিং-সুধা পান করে ধন্য হয়েছিলেন।

হকি খেলার উৎপত্তির ইতিহাসের অনেকটাই অন্ধকারে আবৃত। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে আধুনিক হকি খেলা বলতে আমরা যা বুঝি তার উৎপত্তি নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের ভূমিতে এবং সেটা ঊনিশ শতকে। ১৮৮৩-তে উইম্বল্ডন হকি ক্লাবের সহায়তায় হকি

হকি খেলার মোটামুটি নিয়ম কানুন তৈরি করা হয়। এগুলিই আধুনিক হকির নিয়মের ভিত্তি। এর তিন বছর বাদে গঠিত হয় হকির কেন্দ্রীয় সংগঠন, এই সংগঠনের নাম হলো বৃটিশ হকি এ্যাসোসিয়শন। তৎকালীন ইংলণ্ডের যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ড ছিলেন তার সভাপতি। ইংলণ্ডের প্রায় সব হকি ক্লাবই এই সংগঠনের অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল।

হকি

ইতিহাসের পাতা খুললে জানা যায় যে, ফ্রান্সেই প্রথম টেনিস খেলা সুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তখন ফ্রান্সে এর নাম টেনেঝ্। ক্রীড়া প্রিয় ইংরেজ জাতিও এই খেলা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখেনি বেশি দিন। ১৪ শতকে ইংলণ্ডের অভিজাত এবং রাজপরিবারের লোকেরা টেনিস খেলতেন মনের সাধ মিটিয়ে। তখন এর নাম ছিল রয়্যাল টেনিস বা কোর্ট টেনিস। ১৬ আর ১৭ শতকে টেনিসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলো অভাবনীয় রূপে। ১৫০৯ খৃীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরির টেনিস খেলাকে খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি একটি টেনিস কোর্ট তৈরি করেদিলেন রাজপরিবার ও ঐ শ্রেণীর লোকদের খেলার সুবিধার জন্য। এটাই ইংলন্ডের প্রথম টেনিস কোর্ট। এই কোর্ট কিন্তু ঘাসের উপর খেলার জন্য নয়। ঘাসের উপর টেনিস খেলা প্রথম সুরু হয় ১৮৭৩ অথবা ১৮৭৪ সালে যখন একজন ইংরেজ সামরিক অফিসার অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঘাসের কোর্টে টেনিস খেলা প্রবর্তন করেন। তখন এর নামকরণ হলো লন টেনিস। আধুনিক লন টেনিসের এই জন্মদাতার নাম মেজর উইংফিল্ড। শুধু ঘাসের উপর খেলাই নয়, কোর্টের মাপ, লাইনেরও তিনি সংস্কার করেন।

টেনিস

টেনিস প্রেমিকদের অনুরোধে ১৮৭৫ সালে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব একটি কমিটির মাধ্যমে টেনিস খেলার আইন কানুন প্রণয়ন করে-দিলেন। খেলার নিয়মগুলি প্রস্তুত হয়ে যাবার পর থেকে টেনিস খেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলো। পূর্বের থেকে অনেক বেশি মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে খেলোয়াড়রা গ্রহণ করলো এই খেলাকে। এরপর ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে গঠিত হয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়শন।

উইম্বলডন এবং ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতাই বিশ্বের বৃহত্তম দুইটি আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা। এই দুটি প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডেই অনুষ্ঠিত হয় এবং এদুটির জন্মকাল যথাক্রমে ১৮৭৭ এবং ১৯০০ সাল।

উইম্বলডন ও ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা

এই দুইটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের

সম্মান পেয়ে থাকেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গলফ্ খেলা স্কটল্যাণ্ডে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যদিও হল্যাণ্ডে এই খেলার জন্ম কিন্তু অন্যান্য অনেক খেলার মত গলফ্‌ও বৃটেনেই প্রথমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইংলণ্ডে এই খেলার প্রসার তবে ব্যয়বহুলতার দরুণ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই বেশি প্রচলিত। প্রায় দু'শো বছর ভারতে রাজত্ব করার ফলে সেখানেও ইংরেজরা গলফ্ খেলার প্রচলন করে দিয়ে গেছেন।

গলফ খেলা

ইংরেজরা ভারতে থাকাকালীন এখানকার ব্যাডমিণ্টন খেলা দেখে নিজেদের দেশে প্রচলন করলেন। তখন এর নাম "পুনা" খেলা। "পুনা" খেলায় ভারতে অবস্থানরত ইংরেজ সামরিক বাহিনীর লোকেরা বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের অবসর বিনোদনের এক উত্তম উপায় হিসাবে খেলাটি তাঁদের খুব ভাল লেগেছিল। ইংলণ্ডে ডিউক অভ্ বিউফোর্ট এর উদ্যোগে গ্লসেস্টারশায়ারের ব্যাডমিণ্টন নামে এক স্থানে প্রথম এই খেলার আয়োজন করা হয়। ঐ স্থানের নাম থেকেই খেলাটিরও নাম রাখা হলো ব্যাডমিণ্টন।

ব্যাডমিন্টন

১৮৯৩ সালে ইংলণ্ডে ব্যাডমিণ্টন এ্যাসোসিয়শন গঠিত হয়। বর্তমানে ইংলণ্ডে ব্যাডমিণ্টন খেলার মান অতি উচ্চে। বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা এখানে অনুষ্ঠিত হয় যথা, অল্ ইংলণ্ড প্রতিযোগিতা, টমাস কাপ প্রভৃতি। টমাস কাপে শুধু পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করতে পরেন।

খেলাধূলার দেশ ইংলণ্ডে খেলার বৈচিত্রেরও অভাব নেই। ঘোড়ার পিঠে চড়ে পোলো খেলাও এখানে বেশ জনপ্রিয়। তবে গলফের মতো, ব্যয়বহুলতার জন্য অভিজাতদের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ পোলো খেলাও। আর ব্যাডমিণ্টনের মতো ভারতের বুকেই ইংরেজরা প্রথম পোলো খেলেছিল। তারপর ১৮৬৯ সালে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর কোনও একটি রেজিমেণ্ট পোলো খেলাটি ইংলণ্ডে প্রচলিত করে। বর্তমানে ইংলন্ডে কয়েকটি পোলো ক্লাব আছে।

পোলো

ইংলণ্ডে বক্সিং-এর পদার্পণ হয় চার পাঁচশত বছর পূর্বে। বক্সিং যদি খেলা হয়, তবে মারামারি কাকে বলে, এই প্রশ্নটি সম্ভবত জেগেছিল ইংলণ্ডের জ্যাক ব্রাউটন নামে এক ভদ্রলোকের মনে আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বে। ইনি লণ্ডনে বক্সিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় প্রায়ই নিযুক্ত থাকতেন। তাই, নিজের

বক্সিং

পদাধিকার বলে তিনি বক্সিং-এ কয়েকটি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে নিলেন। সেই নিয়মানুসারে, এক প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিতে পতন হলে অপর জনের তাকে আঘাত করা অনিয়ম ব'লে ঘোষিত হলো। আর, আধ মিনিটের মধ্যে সে আবার উঠে দাঁড়াতে না পারলে তাকে পরাজিত সৈনিক হিসাবে গণ্য করা হবে। এ সত্ত্বেও কিন্তু দূরীভূত হলো না বক্সিংএর নির্দয়তা। অবশেষে, মার্কুইস্ অভ্ কুইনস্‌বেরি মুষ্টিযুদ্ধকে মুষ্টি ক্রীড়ায় পরিণত করার জন্য অনেকগুলি নিয়ম সংস্কার করে দিলেন। বিংশ শতাব্দীর মুষ্টিযুদ্ধ মোটামুটি সেই নিয়মগুলি পালন করেই চলছে।

মুষ্টি ক্রীড়া বা বক্সিংকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯২৯ সালে গঠিত হলো ব্রিটিশ বক্সিং বোর্ড অভ্ কন্ট্রোল। এই বোর্ডের প্রধান কাজ হলো পেশাদারী বক্সিংকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা। অসম প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা হলো কঠোর ভাবে। এই নিয়মানুসারে মোটামুটি সমান ওজনের দুজন খেলোয়াড়ই পরস্পরের সঙ্গে লড়বার অধিকার পেলো। এর ব্যতিক্রমে মারাত্মক ফল দেখা দেওয়াতেই এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল।

ইংলণ্ডে অনেকগুলি বক্সিং ক্লাব আছে। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বক্সিং প্রচলিত আছে।

রোয়িং

জলের দেশ ইংলণ্ডে নৌকা বাওয়া বা রোয়িং প্রতিযোগিতা রীতিমত জনপ্রিয়। প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বেও ইংলণ্ডে রোয়িং প্রতিযোগিতা না হলেও অনুশীলন বা একটা সখের খেলা হিসাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইংলণ্ডে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য শত শত রোয়িং ক্লাব গঠিত হয়েছে। তবে ১৮৩৬ সাল থেকে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে বাৎসরিক রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তার গুরুত্ব আজও অম্লান। টেমস্ নদীর বুকে সাড়ে চার মাইল দূরত্ব জুড়ে যখন এই দুই বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং প্রতিযোগিতা সুরু হয় তখন নদীর দুই তীরে কয়েক সহস্র সমর্থকদের সমাগম হয়। প্রচুর উল্লাস ও উত্তেজনার মধ্যে সমাপ্ত হয় প্রতিযোগিতাটি।

পর্বতারোহণ

এ ঘটনায় আশ্চর্য হবার কোনও কারণ নেই যে ইংলণ্ডের মত পর্বত স্বল্পতার দেশের লোকেরা কেমন করে পর্বতারোহণে আকৃষ্ট হলো, কারণ এদেশের লোকের কাছে কোনও খেলা বা শরীর চর্চার বিষয়ই অপ্রিয় নয়। আর, পর্বতারোহণের রোমাঞ্চ ও বিপদের ঝুঁকির

আকর্ষণও তো কম নয়। বিশ্বের সর্বপ্রথম পর্বতারোহণের ক্লাব ইংলণ্ডের রাজধানী খাস লণ্ডনেই স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। ক্লাবটির নাম অ্যালপাইন ক্লাব।

পর্বতারোহণের ধীরতা নয়, মোটর চালানো প্রতিযোগিতায় আছে গতির উন্মাদনা। আর বিপদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই। ইংলণ্ডের গতি-প্রিয়দের কাছে তাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে চরম তৃপ্তির স্বাদ আছে। ১৮৯৭ সালে স্থাপিত রয়্যাল অটোমোবাইল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংলণ্ডে প্রায় এক সহস্র মোটর চালনার ক্লাব আছে। পূর্বোক্ত ক্লাবটি একটি আন্তর্জাতিক মোটর রেসিং প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে।

মোটর রেসিং

এ্যাথলেটিকসের কয়েকটি বিষয় বা ইভেণ্ট বৃটেনেই জন্মলাভ করেছে। পোল ভল্ট এবং হ্যামার থ্রো এমনি দুইটি বিষয়। জলের দেশ ইংলণ্ডের পল্লীঅঞ্চলের লোকেরা ছোট ছোট খাল পার হবার জন্যে লম্বা বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করতো। ঘরেও রেখে দিত বাঁশের খুঁটিগুলি প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্যে। এই খুঁটি থেকেই পোল ভল্টের উদ্ভব।

এ্যাথলেটিকস্

হ্যামার থ্রোর জন্মস্থান স্কটল্যাণ্ডে। অদ্যাপি স্কটল্যাণ্ডে এই থ্রোর প্রচলন আছে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে।

ইংলণ্ড বিভিন্ন খেলাধুলায় মেতে থাকলেও এ্যাথলেটিকস্ তার বিমাতা ভাই নয়। আধুনিক অলিম্পিক সুরু হবার ১৬ বছর পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৮০ সালে ইংলণ্ডের অপেশাদার এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়শন গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন এ্যাথলেটিকস্ ক্লাবকে অনুমোদন দেয় এই সংস্থা।

ইংলণ্ডের শিক্ষা মন্ত্রক থেকে নিযুক্ত প্রশিক্ষকেরা সম্ভবনাময় অ্যাথলীটদের নিয়মিত ট্রেনিং দেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। নইলে, অলিম্পিকের সিটিয়াস, অলটিয়াস, ফোরটিয়াস অর্থাৎ দ্রুততর দৌড়, উচ্চতর লাফ এবং আরও শক্তিমান হবার সাধনা কেমন করে সার্থক হবে? বর্তমানে ইংলণ্ডে কয়েক হাজার শিক্ষণ প্রাপ্ত কোচেরা ছেলেমেয়েদের অ্যাথলেটিকস্ প্রশিক্ষণে রত। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণের কাজ চলেছে পূর্ণোদ্যমে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতাগুলি এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

শারীর শিক্ষার ক্লাশ ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে ভালভাবেই প্রচলিত আছে। তবে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নয়। সম্ভবত, এখানকার স্কুল-কর্তৃপক্ষের ধারণা যে, শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলায় ছাত্রছাত্রীরা সহজাত ক্রীড়াপ্রিয়তা থেকেই এগিয়ে এসে অংশ গ্রহণ করবে। সেই কারণে আবশ্যিকতা অনাবশ্যক।

স্কুলে শারীর শিক্ষার ক্লাশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই শারীর শিক্ষার ক্লাশ হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে চারটি শারীর শিক্ষার ক্লাশ ধার্য আছে। তবে তার মধ্যে দুটি নির্দিষ্ট থাকে খেলার জন্য। মাধ্যমিক স্কুলের বিভিন্ন ক্লাশের মধ্যে আন্তঃ হাউস ফুটবল, রাগবি হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট-বল, এ্যাথলেটিকস্, সাঁতার প্রভৃতি প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। এছাড়া, শনিবারে সকালগুলিতে, বয়সভিত্তিক আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা হয় বিভিন্ন খেলার।

মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ট্রেনিং প্রাপ্ত শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের তত্ত্বা-বধানে শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার ক্লাশ হয়। শারীর শিক্ষার ক্লাশের সময় প্রতি পিরিয়ডে ৪৫ মিনিট তবে খেলার ক্লাশের সময় তার দ্বিগুণ। কো-এডুকেশন স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীদের ক্লাশ পৃথকভাবেই হয় এবং স্বভাবতই তাদের শারীর ক্রিয়া ও খেলাধুলাতেও পার্থক্য আছে।

ইটন, হ্যারো ও উইঞ্চেস্টারের মতন পাবলিক স্কুলগুলিতে শারীর শিক্ষার কর্মসূচী খানিকটা পৃথক। সেখানে জিমনাস্টিক ও শারীর শিক্ষাকে খেলাধুলার পরিপূরক হিসাবে গৃহীত হয়।

ইংলণ্ডের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি করে জিমনাসিয়াম আছে। খেলার মাঠেরও ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট যত্নবান। তারা অবগত আছে যে, মজবুত স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয়ে "ব্লু"দের সমাদর সর্বত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের ক্রীড়াজগতে বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্লু"-এর উৎপত্তি হয়েছে ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রতিনিধিত্ব করতো যে কোনও খেলায় তাদেরই বলা হতো বিশ্ববিদ্যালয়-"ব্লু"। এর পর থেকে বিশ্বের সর্বত্র খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করে তারাই "ব্লু" আখ্যা পায়।

বয় স্কাউট কর্মসূচীরও আবির্ভাব ইংলণ্ডে। এই বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগে ১৯০৭ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল নামে এক

ইংরেজ সামরিক অফিসার বয় স্কাউটের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। বয় স্কাউটের প্রথম ক্যাম্পটি তিনি বসান ব্রাউন্‌সী দ্বীপে। অতঃপর মাত্র দুই বছরের মধ্যে স্কাউটিং-এ বিপুলভাবে সাড়া পাওয়া গেল। লণ্ডনের

বয় স্কাউট

ক্রিস্টাল্ প্রাসাদে ১৯০৯-এ আয়োজিত এক জমায়েতে ১১,০০০ হাজার স্কাউট উপস্থিত হয়েছিল।

স্কাউট-কর্মসূচীর মধ্যে ক্যাম্পে বাস করা, নানারকম শারীর ক্রিয়া, স্বহস্তে কয়েক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা, প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, এমন কয়েকটি বিষয় শিক্ষা যেগুলি মানুষের জীবন যাপনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, অনুধাবন শক্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এই কর্মসূচীর অন্তর্গত।

স্কাউট কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে সুনাগরিক তৈরি করার জন্য বালকদের শিক্ষাদান। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সংহতি বোধ, নিয়মের প্রতি আনুগত্য, বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অপরের প্রতি সহানুভূতি বোধ, স্ব-নির্ভরতা বা নিজের কাজ নিজে করে নেওয়া ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, "সেলফ্ হেলপ্" ইত্যাদি শিক্ষাদান করা হয়। স্কাউটের একটি বড়ো নির্দেশ—সর্বদা প্রস্তুত থাকো।

ইংলণ্ডের এই বয় স্কাউটের কর্মসূচী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে সম্ভবত এক কোটি বয় স্কাউট আছে সমগ্র পৃথিবীতে।

ছেলেদের মধ্যে স্কাউটিং-এর অসামান্য জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ব্যাডেন

গার্ল গাইড

পাওয়েল মেয়েদের জন্যেও কিঞ্চিৎ পৃথক কর্মসূচী তৈরি করে তার নাম দিলেন গার্ল্ গাইড কর্মসূচী। বয় স্কাউটের মত গার্ল গাইডের কর্মসূচীও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সমাদর পেলো।

বয় স্কাউট ও গার্ল গাইডের স্রষ্টা ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯৪১ সালে পরলোক গমন করেন। শারীর শিক্ষার এই নতুন বিভাগের প্রবর্তকের পুরো নাম হলো রবার্ট স্টিফেনসন স্মাইথ ব্যাডেন পাওয়েল। বয় স্কাউট এবং গার্ল গাইড তাঁর নাম অমর করে রেখেছে।

আমেরিকা

আমেরিকা

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারত আবিষ্কারের বাসনায় বেরিয়ে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলার পরে সেখানে বৃটেন সহ ইউ-রোপের কয়েকটি দেশের কিছু বাসিন্দা বসবাস করতে লাগলেন। এই নতুন মহাদেশ হলো তাঁদের উপনিবেশ। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিদেশীরা স্বভাবতই নিজেদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবই এখানে বহন করে এনেছিলেন। তার মধ্যে শারীর শিক্ষাও ছিল।

কালক্রমে, যখন ঔপনিবেশিকেরা জঙ্গল কেটে, রাস্তাঘাট তৈরি করে, বাড়ীঘর নির্মাণ করে ভালোভাবে বাস করতে লাগলেন তখন ধীরে ধীরে মানুষের অবসর অতিবাহনের শ্রেষ্ট উপায় খেলাধুলো আবার দেখা দিল এই নতুন সমাজে। নিজেদের দেশের ফেলে আসা দিনের খেলাগুলিতে আবার অংশ গ্রহণ করে তারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ডাচ্‌রা তাদের দেশের জনপ্রিয় ক্রীড়া গলফ্‌, হ্যান্‌ডবল, বোলিং, মৎস্য শিকার আর ইংরেজরা এ্যাথলেটিকস্‌, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়া রেস ইত্যাদিতে মেতে উঠলো। যে ক্রিকেট, ফুটবলের তখন প্রায় প্রাথমিক অবস্থা ইংলণ্ডে তাও বাদ গেল না খেলার তালিকা থেকে।

আমেরিকায় ঔপনিবেশিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম যুগে অন্যান্য দেশের মতো এখানেও শারীর শিক্ষার কোনও স্থান ছিল না। লিখন, পঠন আর গণিতের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষার বৃত্ত।

এক প্রবল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললো। একতাবদ্ধ এক নতুন জাতি জন্ম হলো যারা শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতার সঠিক পথে চলার জন্য বদ্ধপরিকর। শারীর শিক্ষা যে, যে কোনও সভ্যজাতির অপরিহার্য অঙ্গ, এ বিষয়ে তারা অনবহিত ছিল না। অতএব, নতুন আমেরিকা সেদিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

আমেরিকায় জার্মান শারীর শিক্ষাবিদ

জার্মানিতে লুডউইগ জানের নেতৃত্বে টার্ন্‌প্ল্যাজ নামে যে বিরাট জিমন্যাস্টিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দুর্ভাগ্যবশত সেটি জার্মানির রাজ-নীতির কোপদৃষ্টিতে পড়ে যায় এবং তার ফলে টার্নপ্ল্যাজ সম্পূর্ণ বে আইনী ঘোষিত হয়ে গেল। তখন টার্ন-প্ল্যাজের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন জার্মান জিম-ন্যাস্টিক পারদর্শী আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম হলো চার্লস বেক্‌, চার্লস ফোলেন ও

ফ্র্যান্সিস্ লিবার। এঁরা তিনজনেই জার্মানিতে জানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। এই তিন লব্ধ প্রতিষ্ঠ জিমনাস্ট আমেরিকাতে জিমনাস্টিকের গোড়াপত্তন করেন।

চার্লস বেক নিজেই একটি অনাচ্ছাদিত জিমনাসিয়াম তৈরি করে সেখানে জিমনাস্টিকের নানা ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া সুরু করলেন। এদিকে নর্দাম্টন শহরে রাউণ্ড হিল নামে ১৮২৩ সালে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে জিমনাস্টিক একটি বিষয় হিসাবে স্থান পেলো। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরাই প্রথম এই নতুন মহাদেশে বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানে জিমনাস্টিককে সংযুক্ত করলেন। চার্লস বেককে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে জিমনাস্টিকের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা হলো।

চার্লস বেক ও রাউণ্ড হিল স্কুল

কালক্রমে এই রাউণ্ড হিল স্কুলে শারীর শিক্ষার অন্যান্য আরও কতকগুলি বিষয় যুক্ত হলো। এখানকার ছাত্ররা এ্যাথলেটিকসের কয়েকটি বিষয়, সাঁতার, বরফের উপরে স্কেটিং, ফুটবল, বেসবল, কুস্তি, অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও নৃত্য ইত্যাদি ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করলো। এছাড়া, পদভ্রমণ আর ক্যাম্পিংও শারীর শিক্ষার অঙ্গীভূত হলো। ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে ছাত্ররা কিছু শিকারও করতো আর পথের পাশেই সেগুলো রান্না করে আলুভাজার সঙ্গে বেশ তৃপ্তিসহকারে আহার করতো।

জিমনাস্টিক বিশারদ চার্লস ফোলেন ছিলেন জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৮২৫ সালে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখানে থাকাকালীন তিনি একটি জিমনাসিয়াম স্থাপন করলেন। আমেরিকায় এটিই প্রথম কলেজে প্রতিষ্ঠিত জিমনাসিয়াম। ছাত্ররা সেখানে দৌড়, লাফানো, দড়ি বেয়ে ওঠা, দোলা প্রভৃতি শারীর ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতো। কিছুদিন পরে বোস্টন শহরে যে জিমনাসিয়ামটি ১৮২৬ সালে স্থাপিত হলো চার্লস ফোলেন সেখানকার প্রশিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানে জিমনাস্টিক শিক্ষা-দানেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করলেন। এই জিমনাসিয়ামের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানে সমাজের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করতেন। বোস্টনের অনেক আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং ধর্মযাজকরাও এখানকার শিক্ষার্থী ছিলেন। ফোলেন বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যায়াম-সূচী তেরী করে নিজেই তাদের শিক্ষা-দান করতেন।

চার্লস ফোলেন

এক বছর পরেই ফোলেন এই জিমনাস্টিকের পদ ছেড়ে চলে যান। তবে যাবার সময় তাঁর আর এক জার্মান সহচর ডঃ ফ্র্যান্সিস্ লিবারকে তাঁর পদের দায়িত্বভার দিয়ে যান। ডঃ লিবার এই জিমনাসিয়ামের সঙ্গে

ফ্র্যান্সিস বেক

একটি সাঁতার শিক্ষাদানের স্কুল খোলেন। সমগ্র আমেরিকায় এটিই ছিল প্রথম সাঁতারের স্কুল। এই সাঁতারের স্কুলের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গেল যে, অধিকাংশ সদস্যই জিমনাসিয়াম থেকে নাম প্রত্যাহার করে এখানেই শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করলেন। এর ফলে একদিন জিমনাসিয়ামটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

আমেরিকায় যাঁরা জিমনাস্টিককে জনপ্রিয় করতে সহায়তা করেছেন,

ডঃ ডিও লিউইস

তাঁদের মধ্যে ডঃ ডিও লিউইসের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আমেরিকান ইন্স্টিটিউট অফ্ ইনসট্রাকশনের ১৯৬০ সালের বার্ষিক সমাবেশে ডিও লিউইস তাঁর জিমনাস্টিকের একটি প্রদর্শনী দেখান। সেই প্রদর্শনী এবং শারীর শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা সমবেত সদস্যদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তখন সেই বার্ষিক সম্মেলন আমেরিকার স্কুলগুলিতে ডিও লিউইসের প্রবর্তিত "নব জিমনাস্টিক" প্রচলিত করার জন্য অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ডিও লিউইসের "নব জিমনাস্টিক" এর ব্যায়ামগুলির সঙ্গে ড্রাম, বেহালা, পিয়ানো, অর্গান প্রভৃতি বাজনা থাকার ফলে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক উভয়েই আনন্দ পেতেন। ডাম্বেল, গদা এবং ছোট ছোট লাঠি হাতে নিয়ে নানা রকমের ব্যায়ামও তিনি প্রচলিত করেছিলেন।

শরীরের সচলতা ও মনোযোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করাই ছিল তাঁর ব্যায়ামগুলির মুখ্য লক্ষ্য। সবল যুবক, দুর্বল শিশু ও নারী সকলের জন্যে তাঁর ব্যায়াম নির্দিষ্ট ছিল।

শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন রাশ স্কুলের ছাত্রদের শারীর শিক্ষা এবং খেলাধুলার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভবিষ্যতে কর্মজীবনের বিভিন্ন পেশায় এগুলি নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবে কেন না শারীর শিক্ষা দেহ ও মনকে সর্বতোভাবে উন্নতি করে। শারীর শিক্ষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিষয়ে রাশ রীতিমত সচেতন ছিলেন। এই জন্য এর মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি মানুষের কোমলবৃত্তিকে ধ্বংস করে তিনি তার প্রবল বিরোধী ছিলেন। শিকার এবং বন্দুক চালনা মানুষের অন্তরকে অন্তহীন ভাবে নির্দয় করে

তোলে। সুতরাং, এগুলি তাঁর মতে কখনও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। মানুষকে আরও মানুষ হতে তো সাহায্য করে না এই বিদ্যা। অথচ শিক্ষার মূল কথাই হলো—মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে বিকশিত হতে সাহায্য করা, তার কুপ্রবৃত্তিকে নয়, নির্দয়তাকে নয়।

আমেরিকার ডাক্তার এডওয়ার্ড হিচকক্ ছিলেন একজন বিদগ্ধ শারীর শিক্ষাবিদ্। আমহার্স্টের কলেজে ১৮৬১ সালে ডাক্তার হিচককের তত্ত্বাবধানে শারীর শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়িত হওয়া সুরু হয়। হিচকক্

ডাঃ হিচকক্ ও আমহার্স্ট জিমনাসিয়ম

কলেজের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শারীর শিক্ষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর শিক্ষকতা করেন।

আমহার্স্ট জিমনাসিয়ামে হরাইজণ্টল বার, ভল্টিং হর্স, নানারকম মই, বেয়ে বেয়ে ওঠার দড়ি, রিং, ভারোত্তলনের বোর্ড ইত্যাদি ছিল। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এখানে ভারতীয় গদা ছিল। হিচককের তত্ত্বাবধানে মোট ২০ মিনিটের শারীর শিক্ষার ক্লাশে ডাম্বেল ও ছোট ছোট লাঠি নিয়ে ১০ মিনিটের হাল্কা জিমনাস্টিকের ব্যায়ামগুলি পিয়ানোর বাজনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। বাকি ১০ মিনিট ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছা মতন কেউ নৃত্য, কেউ ডিগবাজি বা ভারি সরঞ্জামের ব্যায়াম করতো। বৎসরান্তে শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম-দক্ষ ক্লাশকে ১০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হতো।

ইংরেজদের প্রভাবে ক্রিকেটের আকর্ষণে অনেকেই প্রথম প্রথম প্রলুব্ধ

খেলাধূলা

হয়েছিল কিন্তু বেসবলের আবির্ভাবে ক্রিকেট ভেসে গেল যদিও উভয় খেলার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

বেসবল খেলার জন্ম কিন্তু আমেরিকায় নয়। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে এই খেলা প্রথম প্রচলিত হয়। তখন এর নাম ছিল রাউণ্ডার খেলা। আমেরিকায় এসে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে বেসবল নামে পরিচিত হলো। নিউ ইয়র্কের নিকার বোকার ক্লাবই প্রথম বেসবল খেলার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করে। তার কিছুকাল পরে বেসবল খেলা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করলো যে, দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করাও সম্ভবপর হলো। বস্তুত, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর থেকেই সেখানে বেসবল খেলার প্রচলন দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকার শারীর শিক্ষার ইতিহাসে ডঃ ডাড্লি সার্জেণ্টের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনি চারটি ভাগে

বিভক্ত করে এ বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তার পরিচয় দেন। বিভাগগুলি ছিল এইরকম—(ক) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, (খ) শিক্ষামূলক, (গ) প্রমোদমূলক ও (ঘ) আরোগ্যমূলক। প্রসঙ্গত, এর সঙ্গে সুইডেনের হেনরিক লিং এর জিমনাস্টিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

ডঃ ডাড্‌লি সার্জেন্ট

ডঃ সার্জেণ্ট শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখকালে লিখেছেন যে, শুধু শরীরের উন্নতি নয়, মানুষের মন থেকে বিষন্নতার অন্ধকার দূর করে তার মুখে প্রফুল্লতার আলো এনে দেওয়াও শারীর শিক্ষার কাজ। তিনি আরও বলেছেন যে, শারীর শিক্ষা মানুষকে তার আচরণে সহজ ও বিনয়ী করবে এবং চরিত্রকে মহত্ব দান করবে। এক কথায় তার দেহের আকৃতি আর জীবনের কর্মধারাকে উন্নতি করবে শারীর শিক্ষা। যে কোনও মানুষের শারীরিক "ফিটনেস্" তার সমগ্র জীবনের সর্ব কাজের মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সার্জেণ্ট বোডয়েন কলেজের জিমনাসিয়ামের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৫ এ এয়েল কলেজের জিমনাসিয়ামের প্রশিক্ষক হন। এখানে থাকাকালীন তিনি এম, ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং কিছু কাল বাদে নিউইয়র্কের একটি জিমনাসিয়ামে কাজ করা সুরু করলেন। এখানে তিনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তি ও পেশী বৃদ্ধির জন্য চল্লিশটি নতুন সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। এই যন্ত্র বা সরঞ্জামগুলি আজও আমেরিকার জিমনাসিয়ামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ডঃ সার্জেণ্ট কেম্ব্রিজে একটি জিমনাসিয়াম স্থাপন করে সেখানে এক বছরের শিক্ষণ পাঠক্রম চালু করলেন। তারপর তিনি দু বছরেরও একটি পাঠক্রম খুললেন। সেখানে শারীর শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুরকম শিক্ষাই দেওয়া হতো। এই কলেজটিতে প্রধানত মহিলা শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হতেন। আমেরিকার বিভিন্ন শারীর শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো সেগুলির ত্রুটি সম্পর্কে সার্জেণ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যন্ত্র বা সরঞ্জামগুলির প্রস্তুতকারকেরা শারীর শিক্ষা জ্ঞানে নিতান্ত অজ্ঞ থাকার দরুণ তাঁদের নির্মিত সরঞ্জামগুলি প্রায়ই অব্যবহার্য থাকতো অথবা স্বল্প ব্যবহারেই অযোগ্য হয়ে পড়তো।

ডঃ সার্জেণ্ট তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেশী বৃদ্ধির চেয়ে দেহের আভ্যন্তরিণ যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কার্যের মূল্য অনেক বেশি, একথা উল্লেখ

করেছেন এবং যে সব ব্যায়াম ও খেলাধুলা এ ব্যাপারে অধিকতর সাহায্য করতে পারবে সেগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দানের পরামর্শ দিয়েছেন।

দেহের শক্তি ও কয়েকটি দেহযন্ত্রের ক্ষমতার পরিমাপের জন্য ডঃ সার্জেণ্ট যে প্রণালী প্রস্তুত করেছিলেন শারীর শিক্ষার উন্নতির জন্য আমেরিকার এ্যাসোসিয়শন সেটি স্কুল ও কলেজের জন্য অনুমোদন করেন। শক্তি পরীক্ষা ও পরিমাপের এই প্রণালী দ্বারা হাতের মুঠোর শক্তি, বাহুর শক্তি, পায়ের এবং পিঠের জোর আর ফুসফুসের ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল। একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দেহের কী পরিমাপ হবে তাও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন।

আমেরিকায় সুইডিশ বা লিং-এর জিমনাস্টিক

১৮৮৯ সালে বোস্টন শহরে শ্রীমতী মেরি হেমেনওয়ের প্রচেষ্টায় লিং-এর সুইডিশ জিমনাস্টিক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এদিকে তার পূর্ব থেকেই ব্যারন নীলস্ পোস্ নামে সুইডেনের এক ব্যক্তি বোস্টনে মেডিক্যাল জিমনাস্টিককে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করে বসবাস করছিলেন। তাঁর কাছে এসে জিমনাস্টিকের সাহায্যে বহু লোক উপকৃত হন। নীলস্ পোসের মতই হার্টভিগ নিসেন নামে অপর এক সুইডেন বাসী আমেরিকার ওয়াশিংটনে লিং-এর মেডিক্যাল জিমনাস্টের বৃত্তি গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। ওয়াশিংটনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে তিনি জিমনাস্টিক এবং মালিশের সাহায্যে রোগ মুক্ত করেন। তাঁরই পরামর্শে ওয়াশিংটনের স্কুলগুলিতে সুইডিশ জিমনাস্টিক প্রচলিত হয়।

বাস্কেটবল খেলা

খেলাধুলার জগতে পৃথিবীকে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বাস্কেট-বল খেলা। জেমস্ নাইস্মিথ্ নামে স্প্রিং ফিল্ড শারীর শিক্ষা কলেজের জনৈক শিক্ষক এই খেলাটি আবিষ্কার করেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং বাস্কেটবল খেলাকে একটি আধুনিক যুগের খেলা বলতে অসুবিধা নেই। শীত ঋতুতে ইন্ডোর-এ খেলার জন্যই এর আবিষ্কার। জিমনাসিয়ামের দুধারের দেওয়ালে দুটো ঝুড়ি আটকে রেখে একটি ফুটবল দিয়ে প্রথমে খেলা সুরু হয়। যে দল ঝুড়ির মধ্যে যতবার বল ফেলতে পারবে ততবার একটি করে পয়েণ্ট পাবে। তখন নিয়ম ছিল যে, খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে বলটি তলার থেকে উঁচুতে ঝুড়ির মধ্যে ছুঁড়বে। এখনকার মত হাত উঁচু করে নয়। তখনকার খেলায় ঝুড়ির মধ্যে কোনও ফাঁক না থাকায় বলটি তার মধ্যে আটকে গেলেই একটি

মই-এর সাহায্যে সেটিকে উদ্ধার করা হতো। একদিন ওয়াই, এম, সি,-এর ডিরেক্টরদের নাইস্মিথ এবং এ্যামস এ্যালোনজো স্ট্যাগের দুটি দলের মধ্যে একটি খেলার আয়োজন করে দেখানো হলো। যদিও সেই প্রাথমিক পর্যায়ের বাস্কেটবল খেলায় বল নিয়ে কাড়াকাড়িতে বাড়াবাড়ি ছিল তথাপি ঐ ডিরেক্টররা খেলাটির উপযোগিতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বাস্কেটবল খেলা আমেরিকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। খেলাটির উত্তেজনা ও গতি খেলোয়াড়দের খুবই আকর্ষণ করলো তবে খেলার মধ্যে গায়ের জোরের ব্যবহার হতে লাগল খুব বেশি। কনুই-য়ের গুঁতো আর মুষ্টির আঘাত খেলার কৌশলের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। অতএব, নিয়ম কানুনের বেড়া জালে খেলাটিকে আবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯০৮ সালে নিয়ম করা হলো যে কোনও খেলোয়াড় ৫টি ফাউল করলে সেই গেমে আর অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। বল হাতে থাকুক বা না থাকুক, যে কোনও অবস্থাতেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিলেই সেটি ফাউল হিসাবে গণ্য হবে—এই নিয়মটি চালু হলো ১৯১০ সালে। তারপর ১৯১৫ সালে বাস্কেটবল খেলার কোর্টের আয়তন বর্ধিত করা হলো।

বাস্কেটবল খেলা ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে স্থান পেয়ে নাই-স্মিথের স্বপ্নকে সফল করেছিল। সুখের কথা, আমেরিকার ব্যাস্কেটবল কোচদের জাতীয় এ্যাসোসিয়শনের পক্ষ থেকে সস্ত্রীক নাইস্মিথকে বার্লিনে পাঠানো হয়েছিল বাস্কেটবল খেলা দেখার জন্য। নাইস্মিথ তখন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ। তৃপ্তি ভরা দু'চোখ দিয়ে স্রষ্টা দেখলেন তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মান—বিশ্ব অলিম্পিকের আসরে বাস্কেটবল। এর তিন বছর পরে নাইস্মিথ পরলোক গমন করেন।

বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে ভলিবলকেও আমেরিকাই প্রথম উপস্থিত করেন। হলিওকের ওয়াই, এম, সি, এ-র ডিরেক্টর উইলিয়ম মরগ্যান ১৮৯৫ সালে ভলিবল খেলা আবিষ্কার করেন। টেনিস এবং হ্যান্ডবল খেলার সমন্বয়ে খেলাটি প্রথম পরিকল্পিত হয়। জিমনাসিয়ামের মধ্যে খেলার জন্যই খেলাটির উৎপত্তি। বাস্কেটবলের মত অতটা শ্রম সাপেক্ষ নয় ভলিবল। তখন মেঝে থেকে মাত্র সাড়ে ছয় ফুট উঁচুতে ছিল নেট। খেলার নিয়মগুলিও বর্তমানের মত ছিল না। একজন খেলো-য়াড়ের সার্ভিস্ নিজের দলের অন্য খেলোয়াড়ের সাহায্যেও নেটের ওপারে পেঁছে দেওয়া চলতো। দুই দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট না

ভলিবল

থাকায় যতজন খুশি এক সঙ্গে খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। নেটের চার ফুটের মধ্যে খেলোয়াড়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে ঐ সময় ভলিবল খেলার নিয়ম কানুন কী রকম ছিল। এই নিয়মগুলি অবশ্য সবই উইলিয়ম মরগ্যানই প্রণয়ন করেছিলেন। এর অনেক বছর বাদে ১৯১৭ সালে ভলিবল খেলার নিয়মগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়। বস্তুত, ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালে খেলাটি আমেরিকাতে খুবই জনপ্রিয় হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক ক্যাম্পগুলিতে সেনাবাহিনীর লোকেরা ভলিবল খেলে তাদের অবসর সময় কাটাতো।

ভলিবলের প্রচারে ওয়াই, এম, সি, এ-র অবদান অবশ্যই বিশেষ উল্লেখের অবকাশ রাখে।

শারীর শিক্ষায় ওয়াই, এম, সি, এ-র অবদান

ওয়াই, এম, সি, এ-র উৎপত্তি আমেরিকায় হয়নি। তবে আমেরিকায় ওয়াই, এম, সি, এ গঠিত হয় ১৮৫১ সালে বোস্টন শহরে। এর ঠিক দশ বছর পূর্বে লণ্ডনে জর্জ উইলিয়ম নামে এক আদর্শবান যুবক খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল পাঠ এবং ধর্মালোচনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তখন আধ্যাত্মিক ও উন্নতি সাধনই ছিল এর একমাত্র আদর্শ। লণ্ডনে ১৮৪৪ সালের মধ্যে দেখা গেল যে, অসংখ্য যুবক এই সংস্থায় নাম লিখিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ২০০ শত ওয়াই, এম, সি, এ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বেশি দিন কিন্তু ওয়াই, এম, সি, এ-তার ঐ সীমাবদ্ধ আদর্শের মধ্যে বন্দী থাকলো না। এর সংগঠকেরা উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ তো শুধু কতগুলি আত্মিক গুণের সমষ্টি নয়। শুধু ধর্মালোচনায় তো মানুষের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। দেহকে বাদ দিয়ে মানুষকে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ দেহের উন্নতি সাধন না করতে পারলে আত্মিক উপলব্ধিও বৃথায় যাবে। এই চিন্তাধারার থেকেই সিদ্ধান্ত হলো যে, ওয়াই, এম, সি এর কার্যসূচীর মধ্যে শারীর শিক্ষা প্রবিষ্ট হবে। এ বিষয়ে নেতৃত্ব দান করলো আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্কের ওয়াই, এম, সি, এ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কে জিমনাসিয়াম স্থাপিত হবার পরেই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ১৬৮ টি জিমনাসিয়াম তৈরি হলো। বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন আমেরিকা অচিরেই বুঝতে পারলো যে, শুধু জিমনাসিয়াম তৈরি করে বসে থাকলেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। চাই উপযুক্ত শারীর শিক্ষক যাঁরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জিমনাস্টিক ও অন্যান্য ক্রীড়া চর্চা দ্বারা যুবকদের স্বাস্থ্য গঠন করতে পারবেন। এই জন্য ১৮৮৭ সালে

ওয়াই, এম, সি, এ স্প্রিংফিল্ডে একটি শারীর শিক্ষার ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করলো। সেখানে শারীর শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করা হলো। শিকাগো শহরেও ১৮৯০-তে প্রতিষ্ঠিত হলো জর্জ উইলিয়ম কলেজ। অবিলম্বে এই দুটি কলেজ তাদের অসামান্য আন্তরিকতা ও নিপুণ ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। বস্তুত, সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের শারীর শিক্ষা সেখানকার ওয়াই, এম, সি, এ-র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কালক্রমে সমগ্র বিশ্বে ওয়াই, এম, সি, এর-র শাখা ছাড়িয়ে পড়ে।

ওয়াই, এম, সি, এ-র আর একটি বিশিষ্ট অবদান হলো শারীর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা। তন্মধ্যে সব খেলার নিয়মাবলীর গ্রন্থটি সব ক্রীড়াবিদেরই অবশ্য প্রয়োজন।

ওয়াই, এম, সি, এ খৃীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও সর্ব ধর্মের জন্যই এর দ্বার মুক্ত।

ওয়াই, এম, সি, এ-র মাধ্যমে আমেরিকায় শারীর শিক্ষার প্রসারে ও উন্নয়নে যাঁরা সর্বাধিক সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজন শারীর শিক্ষাবিদের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন, এল, এইচ, গালিক, আর, জে, রবার্টস্ ও জে, কে, ম্যাকার্ডি।

স্প্রিংফিল্ড কলেজে গালিক ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত শারীর শিক্ষা বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করেন। তিনি শারীর শিক্ষার সমস্ত কর্মসূচীকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে পুনর্গঠন করেন।

লুথার এইচ্ গালি ক

শারীর শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মূল্য বিষয়ে তিনি সবিশেষ সচেতন থাকায় পাঠক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি করলেন এবং স্প্রিংফিল্ড কলেজের ট্রেনিং-এর মধ্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও ছাত্রদের মেডিক্যাল পরীক্ষা এই বিষয় দুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শারীর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যও তিনি প্রবর্তন করলেন।

রবার্টস বাল্যকাল থেকেই জিমনাস্টিকে পারদর্শী ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই রবার্টস্ বোস্টনের ট্রেমাউণ্ট জিমনাসিয়ামে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালে যখন ওয়াই, এম, সি, এ এই জিমনাসিয়ামটি ক্রয় করে নিল

জে, রবার্টস্

তখন রবার্টসের বয়স মাত্র ২৩। তার তিন বছর পরেই তাকে সেখানকার সুপারিনটেনডেণ্ট পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৮৮৭ সালে তিনি স্প্রিংফিল্ডে ট্রেনার হিসাবে যোগ দেন। ওয়াই,

এম, সি, এ-র শারীর শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

শুধু একনাগারে পেশীবৃদ্ধির চেয়ে দেহের আভ্যন্তরিণ যন্ত্রাবলীর উন্নতির জন্য লুথার অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। এই জন্যই রবার্টস্ দেহকাণ্ডের ব্যায়ামের প্রতি বেশি গুরুত্ব দান করতেন। তিনি ডাম্বেল এবং কয়েকটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা সরঞ্জামের ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটি ব্যায়াম সূচী তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

রবার্টস্ বিশ্বাস করতেন যে, শারীর শিক্ষার কর্মসূচী এমনভাবে প্রস্তুত হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তার থেকে যেমন শারীরিক ভাবে উপকৃত হবে তেমনি আনন্দও লাভ করবে। নীরস কর্মসূচী কখনো দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

ডঃ গালিকের পরে স্প্রিংফিল্ডের শারীর শিক্ষা বিভাগের প্রধান হিসাবে ম্যাকার্ডি যোগদান করেন। গালিক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, বেঁচে থাকলে শরীর শিক্ষা জগতে ম্যাকার্ডি একজন ন্যাশনাল ফিগার হবেন। প্রকৃতপক্ষে ম্যাকার্ডি পরবর্তীকালে শুধু নিজের দেশে নয় শারীর শিক্ষার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন। স্প্রিংফিল্ড কলেজে সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর কাজ করে তিনি কলেজটিকে তার বর্তমান গৌরবময় স্থানে উন্নীত করেছেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে সেখানে শারীর শিক্ষায় ১৯০৫ সালে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া সুরু হয়। সম্মিলিতভাবে এই দুটি ডিগ্রির কার্যকাল করা হলো পাঁচ বছর।

ম্যাকার্ডি

আমেরিকার শারীর শিক্ষার ইতিহাসে বোস্টন শহরের নাম খুবই উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত। শারীর শিক্ষার অনেক বিষয়েরই প্রথম জন্ম এখানেই। আমেরিকার খেলার মাঠের আন্দোলন এখানেই প্রথম সুরু হয়। এর পূর্বে অবশ্য ১৮৮২ সালে জার্মানিতে খেলার মাঠের আন্দোলনের প্রথম উদয়। জার্মানির পরে ডেনমার্ক, তারপর আমেরিকায়।

খেলার মাঠের আন্দোলন

খেলার মাঠের আন্দোলনের সুরু জার্মানিতে হলেও একথা সত্যি যে, ইংলণ্ডের মাঠে মাঠে দলগত খেলার আসর দেখেই জার্মানি অনুপ্রাণিত হয়েছিল খেলার মাঠ তৈরি করার জন্য। এটাই হলো আন্দোলনের মূল উৎস।

বোস্টনের মেরি জাকের জিউস্কা নামে এক মহিলা একদা বার্লিনে

ভ্রমণকালে একটি বালির বাগানে ছোট শিশুদের লাট্টু আর নানারকম খেলনা দিয়ে খেলা করতে দেখে আপন মনে মুগ্ধ হয়ে যান। উনি বোস্টনে ফিরে এসে ঐরকম বালির বাগান বা পার্ক তৈরি করে দেবার জন্য একটি ধনী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এর পূর্বেও শিশুদের জন্য হিতকারী কয়েকটি সুন্দর কাজ করেছিলেন। শিশু-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি বোস্টনের এই শিশু দরদী মহিলার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে পারেনি। প্যারামিটার স্ট্রিট চ্যাপেলের প্রাঙ্গণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা তৈরি করে দিলেন আমেরিকার প্রথম বালির পার্ক। তখন শুধু একটি বালির স্তুপ রাখা হয়েছিল এবং বছরের মধ্যে কেবল জুলাই আর আগস্ট এই দুই মাস শিশুরা সেখানে খেলা করতো—নিজেদের তৈরি মনের মতো কত খেলা। শিশুরা কখনো স্তুপের উপরে উঠে পাহাড়ে ওঠার মজা পেতো, আবার তার মধ্যে গর্ত বানিয়ে সুরঙ্গ তৈরি করে খেলতো। একজন তত্ত্বাবধায়ক সর্বদাই ছায়ার মত তাদের সঙ্গে থাকতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই শিশুদের এই মধুর খেলা দেখে বোস্টনের বিভিন্ন জায়গায় আরও সাতটি পার্ক তৈরি হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে বালির স্তুপ ছাড়াও খেলার কয়েকটি অন্যান্য সামগ্রীও দেওয়া হলো। লাট্টু, বিন ভর্তি ব্যাগ, স্কিপিং এর দড়ি, আর কিছু খেলনাও পেলো শিশুরা।

বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শিশুদের খেলার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দানের জন্যই পার্কগুলি তৈরি করে দিয়েছিল। বোস্টনে খেলার মাঠ আর শিশু-খেলোয়াড়ের সংখ্যা যুগপৎ বাড়তে লাগলো। কয়েকদিনের মধ্যেই এগারটি মাঠ তৈরি হলো। আর প্রায় হাজার শিশুর কলরবে পার্কগুলি মুখরিত হতে থাকলো। বলা বাহুল্য, শিশুদের খেলার আরও কত সামগ্রী দেওয়া হলো।

শহরের জনবহুল স্থানে যেখানে শুধু বাড়ীর পাশে বাড়ীর সারি সেখানেই কিছু কিছু ফাঁকা জায়গায় এই পার্কগুলি তৈরি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, শিশুদের মুক্ত বায়ুতে খেলার আনন্দ দান করা। শিশুদের খেলাধুলা তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রত্যেক পার্কে একজন মেট্রন থাকতেন।

পরবর্তী কালে বড় ছেলে মেয়েদের জন্যও খেলার মাঠ তৈরি করা হলো। ১৯০৬ সালে ডঃ গালিককে সভাপতি করে আমেরিকায় প্লে গ্রাউণ্ড এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই এ্যাসোসিয়েশন শুধু শহরে নয়, পল্লী অঞ্চলেও খেলাধুলা প্রসারে আগ্রহী ছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ডঃ গালিকের পরামর্শ অনুসারে খেলার মাঠে জিমনাসিয়াম ও সাঁতারের পুল নির্মিত হলো। তখন আর শুধু ছেলে মানুষেরা নয়, জনসাধারণের মধ্য থেকেও উৎসাহী লোকেরা সেখানে নানা ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করার মানসে দলে দলে আসতে লাগলেন। যুবক, বৃদ্ধ, নরনারীর স্বাস্থ্য চর্চা ও খেলাধূলার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো খেলার মাঠগুলি। এই সময় প্রত্যেক মাঠে একজন শারীর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিল, যিনি সকলকেই খেলায় উৎসাহ দেবেন, খেলাবেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এবং নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া চর্চা সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। এই লক্ষ্য মনে রেখে আমেরিকার শারীর শিক্ষা কলেজগুলিতে তদনুসারে কিছু কিছু নতুন বিষয় পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হলো। এই ব্যবস্থার আর একটি সুফল হলো যে, এই ট্রেনিং প্রাপ্তদের কর্ম সংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পেলো।

সব বয়সের, সর্বশ্রেণীর লোকদের মনের আনন্দ ও স্বাস্থ্যকর খেলাধূলায় সুযোগ এনে দেবার জন্য খেলার মাঠের আন্দোলন শারীর শিক্ষার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এই আন্দোলন কালক্রমে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও পেঁছেছিল। আমরা জানি, কলকাতা শহরেও এই জাতীয় অনেকগুলি পার্ক বা খেলার মাঠ তৈরি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। সেখানে একজন করে শারীর শিক্ষায় ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকরাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিয়োগ কর্তা ছিল কলকাতা কর্পোরেশন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে অনেক দিন চলার পরেও কর্পোরেশনের এই সুন্দর পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পার্কগুলি এখনও আছে কিন্তু সেই শিক্ষকও নেই, আর সেখানে পরিকল্পিত খেলার কর্মসূচীও নেই।

খেলার মাঠের আন্দোলনের পূর্বে আমেরিকায় খেলার মাঠ ছিলনা এবং তার জন্যে বিভিন্ন খেলাধূলার কোনও ব্যবস্থাও ছিল না একথা মনে করলে ভুল হবে, কেন না ১৮৬৮ সালে নিউ ইয়র্কে আমেরিকার বিখ্যাত এ্যাথলেটিকস ও টেনিস এ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাবই আমেরিকার প্রথম সিন্ডার ট্র্যাক্ নির্মাণ করে।

আঠারো শতক পূর্ণ হবার পূর্বেই ইউরোপ থেকে আমেরিকায় টেনিস ও গলফ্ খেলার আমদানি হয়।

মেরি আউটারব্রিজ নামে এক মহিলা ইংলণ্ড থেকে টেনিস খেলা দেখে এসে স্টেটেন আইল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাবে ১৮৭৪ সালের বসন্তকালে সর্বপ্রথম

আমেরিকার টেনিস কোর্টের লাইন টানার ব্যবস্থা করেন। তবে ঐ টেনিস কোর্টের আকৃতির সঙ্গে বর্তমান কোর্টের অনেক তফাৎ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে আরও টেনিস কোর্ট তৈরি হলো এবং খেলাটির জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে গেল। দেখা গেল ক্রমশ টেনিসের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। মেয়েরাও দলে দলে টেনিস র‍্যাকেট হাতে কোর্টে নেমে পড়লেন। ১৮৮১ সালে গঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশন। আমেরিকার টেনিস খেলাকে সঠিকভাবে সংগঠন করার জন্য প্রথমেই এই সংস্থা টেনিসের প্রচলিত নিয়মকানুনগুলি পর্যালোচনা করে কয়েকটি নিয়ম সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করে সেগুলি সব ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিলেন। সঠিক নিয়ম লিপিবদ্ধ না থাকলে কোনও খেলারই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব নয়।

টেনিস খেলার প্রাথমিক ধীরগতির বদলে দেখা দিল গতির বেগ। আণ্ডার হ্যাণ্ড বা র‍্যাকেট নীচু থেকে উপর দিকে তুলে সার্ভিসের পরিবর্তে ওভার হ্যাণ্ড সার্ভিস শুরু হলো। ডাবল্স খেলাও এই সময় সুরু হয়।

পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমেরিকার শারীর শিক্ষার উন্নতি এবং আধুনিককরণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল। এই সময় যে নতুন জিমনাসিয়াম তৈরি ও অন্যান্য খেলার ব্যবস্থা করা হয় তাতে সব কিছুই ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত। শারীর শিক্ষার শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেলো কারণ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন ট্রেনিং কলেজের উদ্ভব হয়েছিল। সেগুলিতে শিক্ষাদানের মান ছিল উন্নততর এবং অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। শারীর শিক্ষায় ডক্টরেট উপাধি দেবারও ব্যবস্থা হলো যার জন্যে শিক্ষার্থীরা নানা গবেষণা কার্যে যুক্ত হলেন। এর ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শারীর শিক্ষা বিষয়টি যথোচিত মর্যাদা লাভ করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের শারীর শিক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। স্কুল কলেজগুলির মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থাকবে তবে তার মধ্যে যাতে সর্বদাই সম্প্রীতির হাওয়া প্রবাহিত হয় তার জন্য নানারকম পোস্টার ও সার্কুলারের সাহায্য নেওয়া হয়। নানা রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থারাও এগিয়ে এলো এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ

করে। খেলোয়াড়দের আদর্শ আচরণ ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হলো। সেই সঙ্গে বাঁধত হলো খেলা-ধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ। "ক্রীড়া-দিবস" এবং ছাত্রদের আন্তঃ বিভাগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার ফলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বিপুলভাবে বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আমেরিকার স্কুলের ছাত্রদের ফিজি-ক্যাল ফিটনেস বা শারীর পটুতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলো। জাতীয় কর্তব্য হিসাবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শারীর পটুতা

প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি এক প্রবন্ধে ঘোষণা করলেন যে, ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং শারীর পটুতার মান উন্নত করা তিনি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আমেরিকার সমস্ত স্কুলগুলিতে শারীর পটুতার উন্নতির জন্য নির্দেশ দান করে পত্র পাঠান।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত হলো এক মুখপত্র—যুব শারীর পটুতা বা ইউথ ফিজিকাল ফিটনেস। তার মধ্যে স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী শারীর পটুতার নানারকম ব্যায়াম ও শারীর ক্রিয়ার কর্মসূচী লিপিবদ্ধ করা ছিল। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত আমেরিকান এ্যাসোসিয়শন ফর হেল্‌থ, ফিজিকাল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশনের শারীর পটুতার সম্মেলনে এ বিষয়ে সকলে একমত হন যে, শারীর পটুতার কম বেশির উপর প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যক্ষমতা নির্ভরশীল এবং তার সামাজিক কার্যকলাপ, মানসিক গঠন এবং আবেগজনিত ব্যাপারগুলিও শারীর পটুতার দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় নিঃসন্দেহে।

আমেরিকার শারীর শিক্ষার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর এই ৫০ এবং ৬০ দশক আর একটি কারণে বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই প্রথম, যুদ্ধের দামামা না বাজলেও শারীর পটুতার উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হলো, প্রয়োজন অনুভূত হলো শারীর শিক্ষার এত ব্যাপক প্রসারের।

আধুনিক যুগের মানুষ জেনেছে, বুঝেছে শারীর শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও পথে উন্নতির জন্য শারীর শিক্ষা সর্বদাই তার হিতৈষী বন্ধু হিসাবে কাজ করে।

আধুনিক কালে বিভিন্ন ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় কয়েকটি নতুন চিন্তাধারার সংযোজন দেখা যায়, যার ফলে অল্প কিছুকাল পূর্বেরও

অর্থাৎ ১৯৫০ সালের পূর্ববর্তী কিছু ধারণার অসারতা চোখে পড়ে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় পরিবর্তন

ওয়েট ট্রেনিং বা ভার উত্তোলনের সাহায্য পেশী ও পেশীর শক্তি সঞ্চয় করা বিভিন্ন প্রশিক্ষকরা প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। বরং এগুলির ক্ষতিকারক বলেই ঘোষণা করতেন। দ্রুত দৌড়বীরের শরীর যেন হাল্কা হয়, পেশীর সঞ্চারে তার দেহ অযথা ভারি হলে তার গতিবেগ হ্রাস পাবে, এই রকম ধারণাই প্রচলিত ছিল। সাঁতারুর মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি এবং জিমনাস্টিক করা নিষেধ ছিল। আধুনিক কালে যখন দেখা গেল যে, ভারোত্তলনকারীরা এ্যাথলেটিকসে, সাঁতারে রেকর্ড স্থাপন করছে তখন পুরাতন ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে লাগলো। ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, ইত্যাদি প্রায় সব রকম খেলাতেই আধুনিক প্রশিক্ষকেরা ওয়েট ট্রেনিং এবং জিমনাস্টিক প্রত্যেক খেলার প্রয়োজন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রয়োগ করেন।

এই সময়েই ১৯৫৩ সালে দুই জার্মান বৈজ্ঞানিক মুলার ও হেটিংগারের গবেষণালধ্ব আইসোমেট্রিক ব্যায়ামগুলির প্রবর্তন দেখা গেল আমেরিকার ক্রীড়াঙ্গনে, ব্যায়ামাগারে। এই ব্যায়ামে সঞ্চালন ছাড়াই পেশীর প্রসারণ সম্ভবপর হয়। আইসোমেট্রিক ব্যায়ামে পেশীর শুধু শক্তিবৃদ্ধিই হয় না, আহত পেশীকেও নানাভাবে কার্যকরি করতে সাহায্য করে। নতুন যুগের প্রশিক্ষকেরা এই নতুন পদ্ধতির ব্যায়াম করিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশাতীত ফল লাভ করলেন।

ইনটারভ্যাল ট্রেনিং নামে আর একটি বিশেষ ফলপ্রদ ট্রেনিং-এরও প্রাদুর্ভাব হলো। এই ট্রেনিং-এর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো কম সময়ের মধ্যে খাটানো। আমেরিকার সাঁতার এবং এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগীরা এই ইনটারভ্যাল ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে প্রাধান্য পেল।

প্রশিক্ষকরা আর একটি নতুন পদ্ধতি হাতের সামনে পেলো। তার নামে ফার্টলেক পদ্ধতি। দূর পাল্লার দৌড় অনুশীলনের ফাঁকে ফাঁকে ধীর গতির দৌড় এবং স্বল্প দূরত্বের দ্রুত দৌড়। এই জাতীয় দৌড়ে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, তবে ক্লান্তি সহজে আসে না। ফার্টলেক ট্রেনিং ঢালু জমি কিংবা বালির উপরে হয়।

ইনটারভ্যাল এবং ফার্টলেক ট্রেনিং এর সমন্বয়ে অনুশীলন করে অনেক প্রতিযোগী বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করেছে এ্যাথলেটিকস ও সাঁতারে।

আধুনিক যুগের প্রশিক্ষক টেলিভিশনের সাহায্যও পেয়েছেন তাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসাবে।

বর্তমানে আমেরিকার শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর আকৃতি বিশাল। এর পিছনে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান কম নয়। বিদগ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য এবং রক্তের কোলেস্টেরল নিম্নগামী করে রাখতে শারীর শিক্ষার নানা কর্মসূচী বিশেষ সহায়ক বলে জানাবার ফলে যাঁদের খেলাধূলা বা অন্যান্য শরীর চর্চায় কোনও উৎসাহ ছিল না, তাঁরাও দলে দলে যোগ দিচ্ছেন শারীর শিক্ষার পতাকাতলে।

আজকের আমেরিকা শারীর শিক্ষার প্রসারে ও উন্নতির ফলে বিশ্ব অলিম্পিকে প্রতিবার মুঠো মুঠো স্বর্ণপদক লাভ করে দেশের সম্মান-পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে।

জার্মানি

শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যুন্নত জার্মানি আধুনিক শারীর শিক্ষার জগতেও এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। জাতীয় সংহতি রক্ষায় শারীর শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে জার্মানির যথেষ্ট

জার্মানি

সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। শারীর শিক্ষাবিদ লুডউইক জান থেকে আরম্ভ করে হিটলার পর্যন্ত সকলেই এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সুরু হয় জার্মানিতে আধুনিক শারীর শিক্ষার প্রথম অধ্যায়। এই সময় জে, বি, বেস্‌ডাও জার্মানিতে শারীর শিক্ষা প্রসারে খুব উদ্যোগ দেখান। ১৭৭৪ সনে তিনি ডেসহ্‌ নামে এক স্থানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তার নাম দিলেন ফিলান্‌ থ্রোপি-নাম। তাঁর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে অসিচালনা ও অশ্বারোহণও ছিল। তবে শারীর শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সাইমন কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন যে, বিদ্যা চর্চার বিদ্যালয়ে অশ্বারোহণ, অসিচালনা, জাতীয় শারীর ক্রিয়া উপযুক্ত নয়। অতএব, তিনি তার বদলে এ্যাথলেটিকস্‌ ও কুস্তির প্রচলন করলেন। এছাড়া, লম্বা বীমের উপরে দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখা এবং কিছু বল খেলা শিক্ষার আয়োজন করলেন। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় খেলা অবিলম্বে ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে গেল। জার্মানির আধুনিক শারীর শিক্ষার প্রথম শিক্ষক সাইমনকেই বলা হয়। সাইমনের পরে ঐ বিদ্যালয়ে প্রচলিত হলো শারীর শিক্ষার আরও কয়েকটি আকর্ষণীয় বিষয়—সাঁতার, স্কেটিং, মার্চিং, মই ধরে ঝোলা এবং ভারি বালির বোঝা বহন করে হাঁটা।

সালঝ্‌ম্যান নামে এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেসডাও-এর ফিলানথ্রোপি-নাম বিদ্যালয়েই আদর্শে শ্নেপফেনথাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন ১৭৮৫ সালে। এখানে প্রচলিত বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ছাত্রদের শারীর শিক্ষার নানারকম বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। দৌড় ঝাঁপের সঙ্গে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে বীমের উপর দিয়ে হাঁটা, টার্গেটের মধ্যে নিক্ষেপের দ্বারা লক্ষ্য স্থির করা, পোল ভল্ট্‌ ইত্যাদি শারীর ক্রিয়া ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গে অনুশীলন করতো। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে বিদ্যালয়ের হল ঘরে

নিয়ে নানারকমভাবে কোমর বাঁকানোর ব্যায়াম এবং ডাইনে বামে উপরে নীচে হাত ওঠানো নামানোর ক্রিয়া অভ্যাস করানো হতো। নিঃসন্দেহে আধুনিক শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত খালি হাতে নানারকম ব্যায়ামের এগুলিই ছিল আদি রূপ। যিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলি শিক্ষা দিতেন তাঁর নাম কার্ল আন্দ্রে। তিনি এক বছর কাল এখানে শিক্ষকের কাজ করেছিলেন।

শ্নেপফেনথাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী শারীর শিক্ষাদাতার নাম ফ্রেডারিক গুটস্ মুথ্স্। শারীর শিক্ষা জগতের এই বিরাট পুরুষকে জার্মানির জিমনাস্টিকের পিতামহ বলা হয়। তিনি এখানে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৫৩ বছর কাজ করেছিলেন যার ফলে জার্মানির শারীর শিক্ষা ইউরোপের গর্বের বস্তু হিসাবে পরিগণিত হলো।

গুটস্ মুথ্সের অবদান

কার্ল আন্দ্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন আরও কয়েকটি বিষয়—হাতের জোর বৃদ্ধির জন্য দড়ির মই বেয়ে ওঠার খেলা, সাঁতার ও কুস্তি। সাঁতারে হবে ছাত্রদের দম বৃদ্ধি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সচলতা আর কুস্তিতে দেহের শক্তিবৃদ্ধি ও ক্ষীপ্রতা ও মনের সাহস সঞ্চয়।

জিমনাস্টিক বিশারদ গুটস্ জিমনাস্টিক ও খেলাধুলা সম্পর্কে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাচর্চা এবং সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও পারদর্শিতা থাকায় গুটস্ মুথসের পক্ষে গ্রন্থ রচনায় কোনও অসুবিধা হয়নি। "জিমনাস্টিকস্ ফর দি ইয়াং" এবং "গেমস" নামে তাঁর বই দুখানি শারীর শিক্ষা জগতের পক্ষে অতুলনীয়। জিমনাস্টিক সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। "গেমস" বইটিতে ১০০-র অধিক ছোটদের প্রমোদ মূলক খেলার বিবরণ পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে জার্মানিতে একটা জাতীয়তা বোধের আবহাওয়া দেখা দেয়। নেপোলিয়নের শক্তির কাছে পরাজয়ের পর দেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, খণ্ড খণ্ড জার্মানিকে একতাবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

লুডউইগ জানের অবদান

জার্মান দার্শনিক ফিখ্টে ঘোষণা করলেন যে, জার্মানিকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলে দেশবাসীকে শারীর শিক্ষায় নিয়োজিত করতে হবে। জাতীয় সংহতির জন্য শারীর শিক্ষার সবচেয়ে প্রধান প্রবক্তা ছিলেন লুডউইগ জান। জান উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। ফরাসিদের শাসন ছিন্ন করে জার্মানিকে আবার স্বাধীন হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রয়োজন প্রবল দেশপ্রেম ও

জাতীয়তাবোধ। দেশপ্রেমিক জান বক্তৃতা আর লেখার মাধ্যমে জার্মানিকে একতাবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানালেন। যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা। সেই সঙ্গে জোরালো ভাষায় শারীর শিক্ষার প্রতি সকলকে মনোযোগী হবার জন্য নির্দেশ দিলেন। শরীরকে সচল, পটু ও সবল করার জন্য জান রীতিমত এক আন্দোলন সুরু করে দিলেন। জান লিখলেন—মানুষের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সমানভাবে করার জন্য জিমনাস্টিক ব্যায়ামের অশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শরীর ধারণ করে মানুষের সবার চেয়ে বড়ো কর্তব্য হলো শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ও তাকে শক্তিতে পূর্ণ করা। বলা বাহুল্য, জানের মূল ইচ্ছা ছিল জিমনাস্টিকের মাধ্যমে রাজনৈতিক সৎ উদ্দেশ্য সাধন করা, অর্থাৎ জার্মান জাতিকে এক সূত্রে গাঁথা। শারীর শিক্ষার দ্বারা শরীর চর্চায়, শক্তি সঞ্চয়ে দেশকে যুক্ত করে নিজেও ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন করা, এই ছিল জানের আদর্শ। জানের বাণী ছিল, সাহসী হও, স্বাধীনতা অর্জন করো, জীবনকে আনন্দ পূর্ণ করো, এবং ধর্মকে ধরে থাকো।

শারীর শিক্ষার সব কাজের মধ্যে জানের প্রখর দৃষ্টি ছিল যেন তার মধ্যে সর্বদাই জাতীয়তা বোধের পরিবেশ বজায় থাকে ও একতাবোধ জাগ্রত হয়। তিনি মাঝে মাঝে বালকদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন শহর থেকে দূরে। পায়ে হেঁটে এই যাত্রায় পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য তাদের শোনাতেন জার্মান ইতিহাসের কথা। দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলতো ছেলের দল। তারপর গন্তব্যস্থলে পেঁাছে গিয়ে দৌড়-ঝাঁপ, বর্শা নিক্ষেপ, সাঁতার, কুস্তি, গাছ বেয়ে ওঠা ইত্যাদি শারীর ক্রিয়ায় ছেলেরা মেতে উঠতো। যে খোলা জায়গায় জান ছেলেদের এইসব খেলার জন্য নিয়ে যেতেন তার নাম ছিল হ্যাসেনহীড।

বার্লিনের উপকণ্ঠে ১৮১১ সনের জুনে জান তাঁর বন্ধু ফেডরিচ্ ফ্রিজেনের সহায়তায় খুললেন তাঁর স্বপ্নের টার্নপ্ল্যাজ্। টার্নপ্ল্যাজ বলতে বোঝায় ক্রীড়াচর্চার এক ধরণের জায়গা। গ্রীসের প্যালেস্ট্রার সঙ্গে এর সাদৃশ্য ছিল। লম্বা চতুষ্কোণ আকৃতির এই টার্নপ্ল্যাজে ছিল হস্তনির্মিত ব্যালান্সবীম, হরাইজণ্টলবার, বেয়ে ওঠার মই, উচ্চে লাফানোর স্ট্যাণ্ড, উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা বেয়ে ওঠার দাড়, দীর্ঘ লাফের জন্য মাটি কোপানো জায়গা এবং ছোট ছোট খাল, দূর পাল্লার দৌড়ের জন্য ট্র্যাক, ট্র্যাকের এক প্রান্তে কুস্তির ঘেরা জায়গা বা রিং। টার্নপ্ল্যাজের জনপ্রিয়তা

ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে জান সেখানে যোগ করলেন আরও সুযোগ, আরও ব্যবস্থা। নতুন রানিং ট্র্যাক্ প্যারালাল বার, ভল্টিং বাক্স্ও তৈরি হলো। এ সবই শিক্ষার্থীরা পরম উৎসাহে স্বহস্তে তৈরি করেছিল জানের উদ্দীপনা, উপদেশ ও পরামর্শে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জানের টার্নপ্ল্যাজের এই হাতে তৈরি যন্ত্রগুলিকে ভিত্তি করেই আধুনিক যুগের এই জাতীয় ক্রীড়া সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যখন সুরু হয় জার্মানির মুক্তি যুদ্ধ তখন জান যোগদান করলেন সশস্ত্র বাহিনীতে। জানের নির্দেশে এবং অনুসরণে টার্নপ্ল্যাজের অনেক সদস্য যুদ্ধে নাম লেখালেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু বন্ধ হয়নি টার্নপ্ল্যাজ। জানের সহযোগীরা শিক্ষাদান কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় দেশপ্রেমের এক ঝড়ো হাওয়ায় জানের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। শুধু তাই নয়, বলতে গেলে সমগ্র জার্মান জাতি তখন জিমনাস্টিক সম্পর্কে পরম উৎসাহ দেখাতে লাগলো। দলে দলে লোকেরা টার্নাপ্ল্যাজে যোগ দিতে সুরু করলো। সদস্য সংখ্যা সহস্রে পেঁছে গেল স্রোতের গতিতে।

টার্নপ্ল্যাজের এই অগ্রগতিতে হঠাৎ এক বিরাট অঘটন ঘটে গেল। টার্নপ্ল্যাজের এক সদস্য একটি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে এই সংস্থা এক বিপ্লবীর আড্ডা হিসাবে প্রতিভাত হলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসিয়ার রাজা টার্নপ্ল্যাজ্‌কে বে আইনী করে দিলেন এবং জানকে বন্দী করা হলো। সমস্ত ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটেছিল এবং সকলেই এমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল যে, মনে হলো রাশিকৃত জল ঢেলে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে নিমেষে নিভিয়ে দিল। কিন্তু আগুন তো উস্কানি পেলে আবার জ্বলে ওঠে। পরবর্তী কুড়ি বছর টার্নপ্ল্যাজের জিমনাস্টিক ক্রিয়ায় মন্দা দেখা দিলেও লুপ্ত হয়নি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নতুন প্রাসিয়ান রাজা ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম এসে আবার টার্নপ্ল্যাজকে উৎসাহ দান করলেন। ফলে, আবার জোয়ার দেখা দিল জিমনাস্টিকের খেলায়। জানকে "লৌহ ক্রস" অর্পণ করে সম্মানিত করা হলো। এই বৃদ্ধ বয়সে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও জানের পক্ষে আর এই জিমনাস্টিক আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভবপর হলো না। ১৮৫২ সালে জানের দেহাবসান হয়।

জার্মানির শারীর শিক্ষায় জিমনাস্টিকের জন্ম দেওয়ায় এবং তার

প্রসারে জানের অবদান অসামান্য। তবে যেহেতু এর পিছনে জানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক একতা আনয়ন সেই কারণে বিদ্যালয়ে জিমনাস্টিক প্রবর্তনে তাঁর কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি।

এ্যাডলফ্ স্পিসের অবদান

এ্যাডলফ্ স্পিসই জার্মানিতে স্কুল জিমনাস্টিকের প্রবর্তক হিসাবে চিহ্নিত। জাতীয়তাবাদের মনোভাব নয়, প্রকৃত শিক্ষাবিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্পিস্ জার্মানিতে বিদ্যালয়-পর্যায়ে জিমনাস্টিক প্রচলনে মনোনিবেশ করলেন। তাঁকে হেস্-এ সব বিদ্যালয়গুলির জিমনাস্টিকের সংগঠকের পদে নিযুক্ত করা হয়।

বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও জিমনাস্টিক-অন্ত প্রাণ এ্যাডলফ্ স্পিস্ শহরের একটি বাড়ী খুঁজে নিয়ে সেখানে একটি জিমনাসিয়াম তৈরি করে ফেললেন এবং বেশ কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করে খুলে দিলেন জিমনাস্টিক চর্চার এক নতুন কেন্দ্র। জার্মানিতে যেহেতু বিদ্যালয়ে জিমনাস্টিক শিক্ষা দেবার মত উপযুক্ত শিক্ষকের বেশ অভাব ছিল সেই কারণে স্পিস্ শিক্ষক তৈরি করার জন্য চার সপ্তাহ পাঠক্রমের এক ক্লাস বসালেন। সৌভাগ্যবশত, স্পিসের এই উদ্যম ব্যর্থ হয়নি।

শারীর শিক্ষার ক্লাশ নেবার পদ্ধতি সম্পর্কেও স্পিসের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। শিক্ষার্থীদের বৃত্তাকারে অথবা সারিবদ্ধভাবে একজনের পিছনে আরেক জনকে দাঁড় করিয়ে 'কমান্ড্' বা আদেশ-ধ্বনির দ্বারা ব্যায়াম করাতে হবে। শারীর শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধের। অতএব, স্পিস্ মার্চিং নামক শারীর ক্রিয়াটি প্রথমে শিক্ষাদানের প্রতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এতদ্ব্যতীত, স্পিস জানান যে শারীর শিক্ষা ছেলেদের জন্য শুধু নয়, ছাত্রীদের জন্যও সমভাবেই প্রয়োজন। অবশ্যই মেয়েদের ব্যায়ামের বিষয় বিভিন্ন হবে। ছেলেদের বেলাতেও বয়সের তারতম্য অনুসারে ব্যায়ামের পার্থক্য রাখতে হবে।

স্পিসের জীবিতকালেই ১৮৪২ সালে জার্মানীতে বালকদের সব বিদ্যালয়ে জিমনাস্টিক সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হয়। তবে, কার্যত ১৮৬২ সালেই তাঁর বাস্তব রূপায়ণ সঠিক ভাবে সম্ভব হয়। স্পিসের প্রবর্তিত জিমনাস্টিকই জার্মানির বিদ্যালয়ে চালু হয়।

স্পিসের ব্যায়াম পদ্ধতি বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট থাকায় শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষাদানের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কোন ব্যায়ামের পর কোন

ব্যায়াম করাতে হবে সেটাও নির্দ্ধারিত ছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যায়ামের পারম্পর্যতা রক্ষা করে স্পিস্ তাঁর ব্যায়ামের চার্ট প্রস্তুত করে ছিলেন। এছাড়া, নানারকম ব্যায়াম প্রথমে শিক্ষকের সংখ্যা গণনার সঙ্গে এবং পরে ড্রাম বা কোনও বাজনার তালে তালে করার পদ্ধতি ছিল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পরে জার্মানিতে শারীর শিক্ষা জগতে এক নতুন প্রবাহ দেখা যায়। উনিশ আর বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে ইংলণ্ডের কয়েকটি খেলার আমদানি হলো জার্মানির খেলার মাঠে, জলের বুকে।

শারীর শিক্ষায় জোয়ার

জার্মান ছেলেরা ফুটবল এবং রাগ্‌বি খেললো, জলে নৌকো ভাসিয়ে বোয়িং করলো, টেনিস খেললো।

এই সময় জার্মানিতে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা পূর্বে-কার সব রেকর্ডকে অতিক্রম করে। মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে এবং একসঙ্গে দৌড়, সাঁতার, পদযাত্রা, স্কিইং প্রভৃতি ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করা সুরু করলো।

কার্ল ডিয়েম্ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের শারীর শিক্ষার জগতে ইনি অন্যতম চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। জার্মানিকে শারীর শিক্ষার বিভিন্ন দিকে এগিয়ে দিতে কার্ল ডিয়েম্ চেষ্টার ত্রুটি রাখেন

কার্ল ডিয়েমের অবদান

নি এবং সফলতার ঝুলি অনেকখানি পূর্ণ করেছিলেন। ১৯১৩ সালে একবার আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে জার্মানির শারীর শিক্ষার কার্যক্রমে আরও খানিকটা উন্নতি বিধানের প্রয়াস পান। ডিয়েম্ একটি কমিশনের দলপতি হিসাবে সেখানে গিয়েছিলেন। সেই কমিশন কয়েকটি সুপরিকল্পিত প্রস্তাব দিয়ে-ছিলেন যথা, আরও খেলার মাঠ তৈরি করা, এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দৈহিক শক্তিমূলক বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা, খেলাধুলার মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূল্যদান করা, অংশ গ্রহণকারীর প্রবণতা অনুসারে তাকে সেই খেলায় গ্রহণ করা ইত্যাদি। জার্মানির এ্যাথলিটদের কোচ কবার জন্য তাঁরা একজন কোচকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

কার্ল ডিয়েমই জার্মানিতে সর্বপ্রথম "জার্মান স্পোর্ট ব্যাজ" দেওয়া সুরু করেন ১৯১৩ সালে। শারীর পটুতা এবং সক্ষমতার এই ব্যাজ প্রতি বছরই একটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ্যাথলিটদের দেওয়া হতো। ডিয়েম নিজের জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ জার্মান এ্যাথলিটদের এই ব্যাজ দিয়ে গেছেন।

১৯৩৬ সালে বার্লিনে যে বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসেছিল কার্ল

ডিয়েম ছিলেন তার সফল সংগঠক-সম্পাদক। বাল্যকাল থেকেই তাঁর অলিম্পিক খেলার প্রতি একটা রোমাঞ্চ ও শিহরণ মিশ্রিত মনোভাব ছিল। গ্রীসের অলিম্পিয়া শহরে দীর্ঘকাল ব্যাপি খনন কার্য চালিয়ে প্রাচীন অলিম্পিক্ সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা তার ঐ মনোভাবেরই সুন্দর ফসল। শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াজগতের সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও পরিচালক কার্ল ডিয়েমের নাম শারীর শিক্ষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

জার্মানিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দেশ পরিচালনার ভার হাতে পেয়ে নিজেদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে উচ্চতর স্থান দিলেন এবং সেই নীতির বৃত্তের মধ্যে শারীর শিক্ষাকেও রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। হিটলার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব দেশের ছাত্রদের সবল স্বাস্থ্য তৈরি করা, কেননা রুগ্ন শিশু হলো সমাজের আবর্জনা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে বলা হলো—খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষা কারো ব্যক্তিগত আমাদের ব্যাপার নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দেশকে সাহায্য করাই এর উদ্দেশ্য।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পরিচালনায় শারীর শিক্ষা

শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণায় হিটলারের উক্তিতে কোনও অস্বচ্ছতার আবরণ ছিল না। জার্মানির সামরিক বাহিনীতে যোগদানেরই সিঁড়ি হলো শারীর শিক্ষা, একথা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন।

বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া হলো এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় যে কোনও ছাত্রকে অন্তত কয়েকটি প্রাথমিক শারীর পটুতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। ভর্তি হবার পরে শারীর শিক্ষায় ফাঁকি দিলে এবং যথোচিত ক্রম সাফল্য প্রদর্শন না দেখাতে পারলে বৎসরান্তে উচ্চতর শ্রেণীতে ওঠা বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হলো। এই অপরাধে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও করা হলো।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক "স্পোর্টস ডে" কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত করা হলো। বিশেষ পারদর্শী ক্রীড়াবিদদের সম্মান জনক পদক দেওয়া হলো। আর, যারা অসাধারণ শারীরিক দক্ষতা দেখাবে ও সেই সঙ্গে নেতৃত্ব করার যোগ্যতা দেখাবে তাদের জন্য খোলা থাকলো সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পর্যায়ের পদ পাওয়ার জন্য ট্রেনিং স্কুলের দরজা।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শারীর শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হলো। সরকারের একটি বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল দেশের যুব শক্তির মধ্যে নেতৃত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করানো।

বিশিষ্ট ভারতীয় শারীর শিক্ষক এরাজ আহমেদ খাঁ রচিত শারীর শিক্ষার ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে জানা যায় জার্মানির বিদ্যালয়গুলিতে কী ধরণের শরীর চর্চার প্রচলন ছিল। তিনি লিখেছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিদিন ৪৫ মিনিটের একটি করে পিরিয়ড প্রতি ক্লাশের জন্য ধার্য ছিল আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সপ্তাহে তিনদিন ধার্য। ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জিমনাস্টিক ক্লাশগুলির সুরুতে এবং সমাপ্তিতে ছাত্রদের গান গাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম

সাধারণত জিমনাস্টিকের ক্লাশে নিম্নলিখিত শারীর ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হতো :—

(১) খালি হাতে ব্যায়াম বা প্রস্তুতি পর্ব (ওয়ার্মিং আপ্)।

জিমনাসিয়ামের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁটা ও ধীরে ধীরে দৌড়ের পরে ডেনমার্কের নীলস্ বাখ্ প্রবর্তিত প্রাথমিক জিমনাস্টিকের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি খালি হাতের ব্যায়াম। তারপর সুইজারল্যাণ্ড-এর পদ্ধতি অনুসরণে কয়েকটি ভারসাম্য রক্ষার ব্যায়াম। মাঝে মাঝে দড়ি বেয়ে ওঠার অভ্যাসও করানো হত।

(২) ব্যায়ামের সরঞ্জামের সাহায্যে শারীর ক্রিয়া। দেহকে পেশী যুক্ত ও বিশাল করে তুলবার জন্য হরাইজন্টল বার এবং প্যারালাল বারের কয়েকটি ব্যায়াম।

(৩) লাফানো এবং শরীরকে তৎপর করার ব্যায়াম। নানারকম ভঙ্গীতে লাফানোর জন্য কাঠের ঘোড়া, কাঠের আড়াআড়ি লম্বা উঁচু বাক্সের মত জিনিস এবং ম্যাট্রেস (বিছানার গদির মত)। ছাত্রদের এই সরঞ্জাম গুলির উপর দিয়ে নানারকম ভঙ্গীতে লাফিয়ে পার হয়ে ঐ ম্যাট্রেসের উপর আছড়ে পড়া। এই প্রক্রিয়াটিতে অনেকগুলি ভঙ্গীর লাফ আছে যেগুলি আয়ত্ত করার জন্য খুব বেশি রকম শারীর পটুতা অর্জন প্রয়োজন। ম্যাট্রোসের উপর হেড স্প্রিং, হ্যাণ্ড স্প্রিং, ফ্লাইং স্প্রিং, ব্যাক স্প্রিং ইত্যাদি জিমনাস্টিকের ক্রিয়াগুলি ছাত্রদের অভ্যাস করানো হতো।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই অন্যান্য পাঠক্রমের মত শারীর শিক্ষাও আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে শারীর শিক্ষার আলাদা বিভাগ রাখতেই হলো প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা

এছাড়া, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার জন্য এক বছরের পাঠক্রম সমেত একটি কলেজ খোলা হলো। শারীর তত্ত্ব, মানব-শরীরের গঠন, শারীর শিক্ষার তত্ত্ব, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইত্যাদি ছিল পাঠ্য বিষয় আর ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যে রাখা হলো সাঁতার, নৌকাচালানো, নানারকম খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ এবং অবশ্যই জিমনাস্টিক। মেয়েদের জন্য ছিল নৃত্য।

জার্মান যুবকদের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চেতনার পুনর্জাগরণের অভিপ্রায়ে ১৯২২ সালে গঠিত

হিটলার যুব সংঘ

হয়েছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক যুব-লীগ। পরবর্তী কালে এর নামকরণ হয় হিটলার যুব সংঘ।

এর উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে জার্মানির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বাস্থ্যগঠনের সমান্তরাল রেখায় আত্মবিশ্বাসে, আত্মনির্ভরতায়, কষ্ট সহিষ্ণুতায় ইস্পাতের সমতুল করে তুলতে হবে। এই সংঘের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লাফ, বল ও বর্শা নিক্ষেশ, লৌহবল নিক্ষেপ, সাঁতার, দূর পথ অতিক্রম করা, চিনিং দি বার, সাইকেল চালানো, সম্মুখ এবং পিছন দিকে ডিগবাজি খেয়ে এগিয়ে এবং পিছিয়ে যাওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া এবং বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, আগুন জেবলে নিজে রান্না করা, ম্যাপ দেখে পথের নিশানা স্থির করা, জার্মানির সব রকমের গাছ চিনতে পারা, তাঁবু খাটানো, ক্যাম্প-জীবন যাপন করা।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জার্মানির শারীর শিক্ষার জগতে দুইটি

শারীর শিক্ষার জাতীয় এ্যাকাদেমি ও জাতীয় খেলার মাঠ

প্রধান অবদান শারীর শিক্ষার জাতীয় এ্যাকাদেমি গঠন ও জাতীয় খেলার মাঠ তৈরি। এ দুটিই প্রস্তুত হয়েছিল বিপুল অর্থব্যয়ে।

শারীর শিক্ষার এ্যাকাদেমিতে ছয়টি বিভাগ আছে শিক্ষাদান, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, ক্রীড়া বিষয়ে ব্যবহারিক শাখা, কারিগরী এবং শাসন ব্যবস্থা।

এখানে একটি খুব উচ্চমানের সুইমিং পুল আছে চার দেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত। এর বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটির জলের তলা থেকে সাঁতারুকে লক্ষ্য করার ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে একটি লাউড স্পিকার লাগানো

আছে। সেখান থেকে প্রশিক্ষক সাঁতারুকে ঐ লাউড স্পিকারের মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

খোলা জায়গাতেও সুইমিং পুল আছে। সেটা বেশি ব্যবহৃত হয় গ্রীষ্মকালে। বিস্তৃত খেলার মাঠও আছে, সাতটি জিমনাসিয়াম আছে, আর আছে বিশ্বের বৃহত্তম শারীরশিক্ষার গ্রন্থাগার।

শারীর শিক্ষার শিক্ষণ কেন্দ্রও আছে এই এ্যাকাদেমিতে। এর শিক্ষা ক্রমে ক্রীড়া-সাংবাদিকতা ও ক্রীড়া বিষয়ক ফোটোগ্রাফি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের দ্বিতীয় বৃহৎ কৃতিত্ব হলো বিপুল অর্থ ব্যয়ে বার্লিন থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে ২৩০ একর জমির উপর জাতীয় খেলার মাঠ তৈরি করা। উপরোক্ত শারীর শিক্ষার জাতীয় এ্যাকদেমিও এই মাঠেরই মধ্যে অবস্থিত। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল। এই মাঠের অলিম্পিক স্টেডিয়ামটিতে একলক্ষ দর্শকের আসন আছে। সুইমিং স্টেডিয়ামে দুইটি পুল আছে। একটি সাঁতারের, অপরটি ডাইভিং এর জন্য। সুইমিং স্টেডিয়ামে ১৭০০০ দর্শকের আসন আছে। এছাড়া, হকি, টেনিস, উন্মুক্ত থিয়েটার হল ও অশ্বারোহণের কোর্সে যথাক্রমে ২০,০০০ ৩,০০০, ২০,০০০ এবং ১০,০০০ হাজার দর্শকের আসন আছে।

লুডউইগ জানের শারীর শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করার নীতি হিটলার কর্তৃক বাস্তব ভাবে রূপায়িত হয়। একটি সমগ্র জাতিকে শারীর শিক্ষার মাধ্যমে কী ভাবে শারীর পটুতায়, সচলতায়, শক্তিতে, সাহসে পরিপূর্ণ করা যায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সেটা বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করেছে। একটি স্বাস্থ্যেজ্জ্বল, ঝলমলে যুবক ভরা জাতিকে দেখে কার না অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়? কিন্তু যখন মনে হয় এই তাজা যুবকদল তৈরি করার পিছনে আছে জাতি গঠনের নামে, জাতীয় একতা গড়ার নামে হিংসায় আকীর্ণ এক আদিম বর্বর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, তখন মানবতার চরম ধ্বংসের চেহারা দেখে শরীর শিহরিত হয়। দেশের সর্বাধিনায়কের মুখে যখন উচ্চারিত হয়—সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করার জন্যই জার্মান জাতির জন্ম তখন সাম্রাজ্যবাদের ক্লেদযুক্ত উলঙ্গ আস্ফালন ও দম্ভই প্রতিধ্বনিত হয়। তখন মনে প্রশ্ন জাগে, এরই জন্য শারীর শিক্ষার এতো আয়োজন, এতো প্রচার, প্রসার?

যথার্থ শারীর শিক্ষা তো মানুষকে হিংসায় দীক্ষিত করে না। শারীর

শিক্ষা ও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। খেলার মাঠে দুই পক্ষের আক্রমণ প্রতি আক্রমণে মানুষের যুদ্ধের আদিম প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চরিতার্থ হয়ে যায়। হিংসার খোলস খ'সে পড়ে। খেলাধুলা বড় পবিত্র বস্তু, খেলার মাঠ এক শুভ্র তীর্থ।

দম্ভের পতন অবশম্ভাবী। তাই হিটলারের ও পতন হলো। নিজের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় নিজেই ভস্মীভূত হলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জার্মানি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি। প্রথমটি থাকলো রাশিয়ার ব্লকে এবং দ্বিতীয়টি পশ্চিম ব্লকের সঙ্গে।

বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরে দেশের সর্বত্র যখন বেসামাল অবস্থা, ক্লান্তি আর অসহায়তায় ভারাক্রান্ত দেশের সমগ্র পরিবেশ তখন সম্ভব নয় অচিরে সব কিছু পুনরুদ্ধার। সুতরাং, শারীর শিক্ষাও অবহেলিত হয়ে পড়ে রইলো কিছুকাল।

ফেডারেল রিপাব্লিক্

তবে প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ জার্মানি আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো। চেষ্টা আর পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নেই, তাই জার্মানি জাগলো আবার। ফেডারেল রিপাবলিকে অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানিতে ১৯৫৬ সালে শারীর শিক্ষাকে অন্যান্য শিক্ষার সম মর্যাদাই দেওয়া হলো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বত্র সপ্তাহে দুই ঘন্টার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিন ঘন্টার শারীর শিক্ষার ক্লাশ সুরু হয়ে গেল। আর বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রধানত স্বেচ্ছামূলক ভাবেই রইলো শারীর শিক্ষার কর্মসূচী।

১৯৫২ সালে আবার পূর্বের মত পাঁচ বিষয়ের শারীর ক্রিয়ার বিশেষ দক্ষ ক্রীড়াবিদদের জার্মান স্পোর্টস্ ব্যাজ দেওয়া সুরু হলো। সাঁতার, লাফানো, দৌড়, নিক্ষেপ এবং সহনশীলতা মূলক কোন শারীর ক্রিয়া, এই পাঁচ রকমের খেলার থেকে যে কোনও পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করলে এই স্পোর্টস্ ব্যাজ দেওয়া হয়।

পশ্চিম জার্মানিতে সাঁতার খুবই জনপ্রিয়। প্রায় তিন হাজার অনাবৃত এবং সাড়ে তিনশত আবৃত সুইমিং পুল আছে। আরও অনেকগুলি সুইমিং পুল আছে প্রশিক্ষণের জন্য।

ক্রীড়া জগতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নানারকম নিয়ম কানুন প্রবর্তন ও প্রচলিত রাখার জন্য ১৯৫০ সালে গঠিত হয় জার্মান স্পোর্ট্স এ্যাসো-

সিয়শন। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। পঞ্চাশ হাজার ক্রীড়া-সংঘ এই এ্যাসোসিয়শনের সঙ্গে সরকারিভাবে যুক্ত।

ফেডারেল রিপাবলিকের একটি চমৎকার পরিকল্পনা হলো বছরে দুবার ১০ থেকে ২০ বছর বয়সীদের জন্য অনেক রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে বছরে ৫০ লক্ষ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

ফেডারেল রিপাবলিকের শারীর শিক্ষার কর্মসূচী থেকে হিটলার যুগের সামরিক ভাবাপন্ন বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়। শারীর শিক্ষায় শিক্ষিত জনসাধারণকে দিয়ে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার কোনও রকম পরিকল্পনা রইলো না এই যুগে। সুস্থ, সুন্দর ব্যক্তি ও সমাজ গঠনই হলো এখনকার শারীর শিক্ষার আদর্শ। এ্যাথলেটিকস্ এবং জিমনাস্টিক ছাড়াও ভলিবল, বাস্কেটবল খেলাতেও নিয়মিত অংশ গ্রহণ করানোর ব্যবস্থা আছে। আর সবার প্রিয় ফুটবল তো আছেই।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে শারীর শিক্ষার ধ্বনি হলো—"সর্বস্থলে সর্বলোকের সপ্তাহে অন্তত একদিন ক্রীড়ায় যোগদান।" এর উদ্দেশ্য হলো দেশের মজুর, কৃষক, চাকুরে, ব্যবসায়ী এবং সব বয়সের নাগরিকদের শারীর শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করানো।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব-লিক বা জি, ডি, আর

শারীর শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের আরও বলশালী ও মজবুত করে তাদের কাছ থেকে অধিকতর পরিমাণে দেশের উৎপাদন আদায় করা জি, ডি, আর-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে প্রায় তিন হাজার প্রতিষ্ঠান আছে মজুরদের জন্য দৈনিক জিমনাস্টিকের আয়োজন করার জন্য। যাদের শরীরে কোনও রকম আকৃতিগত বিকৃতি আছে সঠিক জিমনাস্টিকের ব্যায়ামের সাহায্যে সেগুলি নিরাময় করারও ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান।

পূর্ব জার্মানির বৃহত্তম শারীর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি লিপ্‌জিগে অবস্থিত। বিশ্ববিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। শারীর শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রম চার বৎসরের এবং ডক্টরেট লাভের জন্য আরও তিন বছরের কার্যক্রম আছে। গবেষণাকার্যের জন্য এখানকার আয়োজন প্রথম শ্রেণীর। লিপ্‌জিগের স্টেডিয়ামে ১ লক্ষ দর্শকের আসন আছে।

লিপ্‌জিগে ১৯৬৯ সালের স্পোর্টস এবং জিমনাস্টিক উৎসব পাঁচদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে ফুটবল, হ্যাণ্ডবল, এ্যাথলেটিক্‌স,

সাঁতার, ভলিবল এবং নানারকম জিমনাস্টিক ও খালি হাতে ব্যায়াম ও ড্রিলের প্রতিযোগিতা ছিল।

১৯৬৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানি সর্বপ্রথম যোগ দেয় এবং প্রথম বারেই ২৫টি পদক পেয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেছে।

পূর্ব জার্মানির শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলা যেমন সমাজের সর্বস্তরেই প্রবেশ করে নিজের আসন পেতে নিয়েছে তেমনি খেলাধূলার মানও সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী।

ফ্রান্স

ফরাসী দেশে শারীর শিক্ষার প্রথম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় একাদশ শতাব্দীতে যখন সুরু হয় শিভালরির যুগ। শিভালরি যুগ বিস্তৃত হয়েছিল সপ্তদশ শতক পর্যন্ত। এই সময় অসি আর অশ্ব ছিল বীরের

ফ্রান্স্

সঙ্গী। তৎকালীন খ্যাতিমান ফরাসী সাহিত্যিকেরাও নানা উপন্যাসে অসিধারী অশ্বারোহীদের অনেক রকম বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে উচ্চবিত্তরাই ছিলেন এই যুগের প্রতিভূ এবং স্বভাবতই তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল শারীর শিক্ষার এই একমাত্র সাক্ষীর দল যাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। জনসাধারণের মধ্যে শারীর শিক্ষার প্রচলনের কোনও খবর পাওয়া যায়না। এ ছাড়া, শারীর শিক্ষার চর্চা ছিল ফরাসী সামরিক বাহিনীর মধ্যে। সর্বকালে সর্বদেশেই সামরিক বাহিনীর লোকেরা সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন রকম শারীর পটুতার ব্যায়ামে অভ্যস্ত হয়। সুতরাং, সে বিষয়ে আর পৃথকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ বা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্যের কথা এই যে, নেপোলিয়নের আবির্ভাবে ফরাসী সৈন্যের বাহু শক্তির পরিচয় পেয়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশে, যথা জার্মানি এবং সুইডেনে শরীর চর্চার অনুশীলন সুরু হয়। জার্মানির জান আর সুইডেনের হেনরিক লিং জিমনাস্টিকের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলন করলেন। দেশে দেশে পেঁছে গেল সেই জিমনাস্টিকের ধারা। ইউরোপের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অথচ, ফ্রান্সে জিমনাস্টিক শুধু সামরিক বাহিনীতেই সীমাবদ্ধ থাকলো। পরে, ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের মতো ফ্রান্সেও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই আরম্ভ হয় শারীর শিক্ষা। সুতরাং, রাজনীতির কাছে ইউরোপের শারীর শিক্ষার ঋণের সীমা নেই। ফ্রান্সেও ওয়াটারলু যুদ্ধের পরাজয়ে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে দেশের সর্বত্র শরীর চর্চার মূল্য প্রচারিত হলো। এই সময় জার্মানি আর সুইডেনে যে জিমনাস্টিকের জন্ম হয়েছিল ফরাসি আক্রমণের ভয়ে সেই জিমনাস্টিকই প্রচলিত হলো ফরাসি দেশে।

স্পেনের দক্ষ শারীর শিক্ষক ও জিমনাস্টিকে পারদর্শী ফ্রান্সিস অ্যামোরস এক ভাগ্য বিপর্যয়ের স্বীকার হয়ে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হন।

তখন ৪৭ বছর বয়সে তিনি ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য তিনি সেখানে একটি ছোট স্কুলের মধ্যে একটি নিজস্ব জিমনাসিয়াম খুলে বসলেন। অ্যামোরসের কর্মতৎপরতায় এবং শিক্ষাদানের নৈপুণ্যে অল্প-দিনের মধ্যেই শিক্ষার্থী সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলো।

ফ্র্যান্সিস অ্যামোরস

অ্যামোরস খালি হাতে যে ব্যায়ামগুলি করাতেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সচলতা এনে দেওয়া। ব্যায়ামগুলিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তিনি প্রায়ই তার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার ব্যবস্থা করতেন। খালি হাতে নানা রকম ব্যায়ামের পরে সুরু হতো সরঞ্জাম সহ ব্যায়াম। ডাম্বেল-ব্যায়াম, ভারসাম্যের ব্যায়াম, কাঠের ঘোড়ার উপরে কয়েক রকমের লাফ, দড়ি বেয়ে উচুঁতে ওঠা, ঝুলন্ত দড়ি ধরে দোলা ও কসরৎ, রিং-এর ব্যায়াম—এ সবই ছিল অ্যামোরসের ব্যায়ামের কর্মসূচীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের সমর-মন্ত্রীর কোনও এক সূত্রে অ্যামোরসের শারীর শিক্ষার পদ্ধতি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ব্যায়ামগুলির কার্যকারিতা উপলব্ধি করে তাঁর সৈন্যবাহিনীর একাংশকে তিনি অ্যামোরসের কাছে শিক্ষা নেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

জিমনাস্টিক ও অন্যান্য ব্যায়ামের উপযোগিতা লক্ষ্য করে ফরাসি সরকার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক ও অসামরিক শারীর শিক্ষক তৈরী করার জন্য স্থাপন করলেন একটি সুবৃহৎ জিমনাস্টিক শিক্ষা-কেন্দ্র। অ্যামোরসকেই এখানকার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হলো।

নিজস্ব কর্মকুশলতা ও আন্তরিক শিক্ষকতার গুণে স্পেন থেকে আগত সেই আশ্রয় প্রার্থী ফ্র্যান্সিস অ্যামোরস ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশের জাতীয় জিমনাস্টিক ডিরেক্টর হলেন। কিন্তু জিমনাস্টিক-অন্ত প্রাণ অ্যামোরস শুধুমাত্র এই সরকারি চাকরিতে খুশি থাকতে পারলেন না। দেশের জনসাধারণকে জিমনাস্টিকের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার একটি নিজস্ব জিমনাসি-য়াম খুললেন।

ফ্র্যান্সিস অ্যামোরস

অ্যামোরসই সর্বপ্রথম ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী এবং স্কুলে সঠিক প্রথায় জিমনাস্টিক শিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত। শরীরের শক্তি পরীক্ষার একটি যন্ত্র আবিষ্কারও অ্যামোরসের কৃতিত্ব। এই যন্ত্রটির সাহায্যে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের শক্তি কতটা বৃদ্ধি হলো তার পরিমাপ করা হতো।

অ্যামোরসের মৃত্যু ফ্রান্সের শারীর শিক্ষা জগতে যে বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি করলো তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। সমগ্র দেশে তাঁর জুড়ি মেলা ভার দেখে ফরাসি সরকার ফোকিয়ান ক্লায়াসকে বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এলো সামরিক বাহিনী ও শহরের স্কুলগুলিতে শারীর শিক্ষা দানের জন্য। যদিও তিনি শারীর শিক্ষার অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিলেন তবে তখন তাঁর বয়স ছিল ষাটের কাছাকাছি। ফলে, মাত্র ৭ বছরের বেশি তাঁর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজে যুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। ক্লায়াস মোটামুটিভাবে অ্যামোরসকে অনুসরণ করে চলতেন। অবশ্য, জার্মানির গুট্স মুথ ও লুডউইগ জানের প্রবর্তিত জিমনাস্টিকও তিনি মিশ্রণ করেছিলেন তাঁর শিক্ষাধারায়। হরাইজণ্টল বীম, প্যারালাল বার, বড়ো বড়ো লাফের জন্য কাঠের ঘোড়া ইত্যাদি সরঞ্জাম তাঁর শারীর শিক্ষায় ব্যবহৃত হলো।

বিপ্লবোত্তর কাল

১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী অন্তত ২০ বছর কালকে শারীর শিক্ষার বন্ধ্যা-যুগ বলা যায়। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হলো, যার ফলে শারীর শিক্ষা সরকারের কাছ থেকে পেলো দুয়োরাণীর ব্যবহার। অনাদরে, অবহেলায় কাটলো তার দিন, যতদিন না পর্যন্ত বাধলো প্রাশিয়ার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ। তখন শারীর শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হলো সকলের চেয়ে বেশি। এই সময় থেকেই ফ্রান্সে দেখা দিল শারীর শিক্ষার জোয়ার। অনেকগুলি জিমনাস্টিক-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হলো দেশের বিভিন্নস্থানে।

ফ্রান্সে শারীর শিক্ষা শিক্ষা-মন্ত্রকের অধীনেই ছিল এবং শিক্ষা-মন্ত্রক বিদ্যালয় স্তরে শারীর শিক্ষা প্রসারের জন্য জিমনাস্টিককে পাঠক্রমের অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ পাঠালেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের জন্যই এই নির্দেশ প্রযোজ্য ছিল। বিদ্যালয়গুলির আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই নির্দেশ কার্যকরী করার পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দিল ট্রেনিং প্রাপ্ত যথেষ্ট শিক্ষকের অভাব। একমাত্র জয়েনভিলের সামরিক ইন্স্টিটিউটে তখন সুযোগ ছিল শারীর শিক্ষার ট্রেনিং-এর। এখান থেকে প্রতি বছর যে কয়জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে বেরোতেন তারচেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য। সুতরাং, মুখ্যত শিক্ষকের অভাবেই সম্ভব হল না বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক করার

এই মহৎ পরিকল্পনা। অবশ্য, অনেক স্কুলেই সবরকম সরঞ্জাম সমেত জিমনাসিয়ামও ছিল না।

এই সময় যেটুকু খেলাধুলা প্রচলিত ছিল তার উৎস ছাত্র ছাত্রীদের সহজাত ক্রীড়া-প্রীতি। ছুটির দিনে কিংবা অবসর কালে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের কেউ কেউ টেনিস হ্যান্ডবল খেলে আনন্দ লাভ করতো।

বলার কথা এই যে, তখন ছেলে মেয়েদের খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের ব্যাপারটা ছিল একেবারেই খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

শারীর শিক্ষায় ফ্রান্সের এই সময়কার নিম্নতম ভাঁটা কিংবা কৃষ্ণতম আকাশ সব কিছুই চাপা পড়ে যায় বর্তমান যুগের শারীর শিক্ষা জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, খেলাধুলার প্রাণ পুরুষ ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিনের আবির্ভাবে—যিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সূচনা করলেন আধুনিক অলিম্পিকের। পৃথিবীর সব দেশে শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা ছড়িয়ে দিতে, তার গুরুত্ব স্থাপন করতে—মানুষকে আরও জোরে দৌড়াতে, আরও উঁচুতে লাফাতে, আরও শক্তি সঞ্চয়ে আহ্বান জানাতে,—অলিম্পিকের দিনগুলিকে রাখীবন্ধনের দিনে পরিণত ক'রে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সোনার দরজা খুলে দিতে—আর ক্রীড়া-ক্ষেত্রকে স্বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার মহৎ মানসে কুবার্তিন প্রবর্তন করলেন আধুনিক অলিম্পিকের। সব দেশে খবর জানাতে পায়রার দল উড়ে চললো দিক থেকে দিগন্তে। কুবার্তিন এথেন্সের বুকে মশাল জ্বালিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্পণ করলেন অলিম্পিকের আদি জন্মভূমিকে।

ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিন

কুবার্তিনের এই কীর্তিতে ১৮৪৮-এর গৌরবময় বিপ্লবের দেশকে, নেপোলিয়নের দেশকে নতুন বিস্ময়ে বিশ্বের মানুষ আবার দু'চোখ ভরে তাকিয়ে দেখলো।

শারীর শিক্ষার জগতে ফ্রান্সের এটাই বৃহত্তম অবদান। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের বেদনাময় প্রভাবের হাত থেকে ফ্রান্স রেহাই পায়নি। জন-সাধারণের অন্যান্য বিপাকের সঙ্গী হয়ে দেখা দিল স্বাস্থ্যহীনতাও। এই মারাত্মক ক্ষতি রোধ করার জন্য প্রথমেই ফরাসি সরকার শারীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি সপ্তাহে দু'ঘণ্টার জন্য শারীর শিক্ষার ক্লাশ ধার্য করে দিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে এই সময়সীমা আরও বধিত করা হলো। ট্রেনিং প্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের কোনও একজন শিক্ষকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো শারীর শিক্ষার ক্লাশ নেবার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল

একমাত্র রাজধানী প্যারিসে শারীর শিক্ষার ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রইলো জিমনাস্টিক ও তৎসংক্রান্ত ক্লাশের ভার।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষাদানের চিত্র কিছুটা আশাপ্রদ। সেখানে যদিও সপ্তাহে দুই ঘণ্টাই থাকলো শারীর শিক্ষার ক্লাশ তবে সপ্তাহের একটা বিকেল পুরোপুরি খেলাধুলার জন্য সংরক্ষিত রাখা হলো। আর, শারীর শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত রইলেন তিন বছরের শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই খেলাধুলা ও শারীর শিক্ষা সুষ্ঠু-ভাবে চলার জন্য ক্রীড়া-সংস্থা গঠিত হলো।

উপরোক্ত ব্যবস্থা সফল করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রক শারীর শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে দুই প্রকার পাঠক্রম তৈরি করা হলো। একটি হলো শারীর শিক্ষার প্রাথমিক পাঠক্রম, অপরটি শারীর শিক্ষায় পারদর্শিতার সার্টি-ফিকেট পাঠক্রম। প্রথমটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য এবং দ্বিতীয়টি যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আগ্রহী তাঁদের জন্য।

শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য তিন বছরের পাঠক্রম চালু করা হয়। এই পাঠক্রমে নানারকম শরীর চর্চা ও খেলা-ধুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পাঠ্য বিষয়ও সংযুক্ত হলো।

জিমনাস্টিকে সাধারণত ফরাসিবাসীদের অনীহা দেখা গেলেও এ্যাথ-লেটিকসে বিশেষ উৎসাহ। এই জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া ইন্স্টিটিউট। সেখানে ফরাসী এ্যাথলিটদের মধ্যে যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাদের বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং-এর সাহায্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সর্বা-ধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। এছাড়া, স্কুল, কলেজ, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়।

ফরাসী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক শারীর শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেছে। যুব আন্দোলন, ক্রীড়া দপ্তর এবং শারীর শিক্ষা বিভাগ।

শারীর শিক্ষার তিন বিভাগ

নানা প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ করাবার অভিপ্রায় "যুব আন্দোলন" বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাঝে মাঝে শহর থেকে দল বেঁধে কখনও পদব্রজে কখনও সাইকেল চড়ে ভ্রমণ—তারপর যুব হোস্টেলে গিয়ে বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ উল্লাস, এসবই ব্যবস্থাপনার

যুব আন্দোলন

ভার এই বিভাগের উপর। আমোদ প্রমোদ ও ভ্রমণের মাধ্যমে যুবকদের শরীর ও মন উভয়ের উপকারের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার প্রসার করাই এই দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। ফ্রান্সে যে বেসরকারি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলি আছে-প্রয়োজন মতো সেখানে আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখাও এই দপ্তরের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুত সমগ্র দেশের ক্রীড়া ব্যবস্থায় কোনও রকম সমস্যার উদ্ভব হলে তার আশু সমাধান করার জন্যই এই দপ্তরের সৃষ্টি।

ক্রীড়া দপ্তর

যেখানে ক্রীড়া চর্চা বিদ্যা চর্চার সঙ্গে সহাবস্থান করে সেই বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের কার্যাবলী তদারক করার ভার শিক্ষা মন্ত্রকের এই বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয় ছাড়িয়ে মহাবিদ্যালয়েও প্রসারিত হয়েছে এর কর্তৃত্বের সীমা। সেখানকার শারীর শিক্ষা কর্মসূচীর রূপায়ণের কাজগুলি কতখানি সফলতার মুখ দেখলো এই বিভাগের সজাগ দৃষ্টি থাকে সেদিকে। প্রয়োজন অনুসারে সেখানে পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য দান করেন এই বিভাগ।

শারীর শিক্ষা বিভাগ

শারীর শিক্ষা বিভাগে নিজস্ব কর্ম তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় বার্ষিক জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতা এবং শারীর পটুতার পরীক্ষা গ্রহণ কালে। সহস্র সহস্র ফরাসীবাসী এগুলিতে অংশ গ্রহণ করে। বয়স ও মানের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় শারীর পটুতার এই পরীক্ষা। উত্তীর্ণ প্রতিযোগীরা পুরস্কার পান সম্মানসূচক ক্রীড়া-ব্যাজ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের থেকে ফ্রান্সে আধুনিক শারীর শিক্ষার সুরু হয়েছে বেশ বিলম্বে। তাই, ফ্রান্স সচেষ্ট হয়েছে দ্রুতগতিতে শারীর শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে। ঘোষিত হলো ১৯৫৬ সালে খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার সুযোগ তৈরী না করে কোনও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। খেলার মাঠ সমেত তৈরি হলো ১২০০ স্টেডিয়াম, ৬০০ জিমনাসিয়াম, ৬০০ সাঁতার-পুল এবং ৬০০টি যুবকেন্দ্র।

বর্তমানে ফ্রান্সে ফুটবল এবং রাগবির জনপ্রিয়তা সর্বব্যাপি। ফুটবলে উত্তর এবং রাগবিতে দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকেরা বেশি অংশগ্রহণ করে। ফুটবলে ফ্রান্সের মান কতখানি উঁচুতে উঠেছে তার স্বাক্ষর রেখেছে দেশের জাতীয় ফুটবল টিম ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে উঠে।

টেনিস খেলার উৎপত্তি এই ফরাসী দেশেই হয়েছিল আজ থেকে কয়েক

শত বছর পূর্বে চতুর্দশ শতকে। তারও একশো বছর আগে ফ্রান্সে এই খেলাটির আদিরূপ ছিল অন্যরকম। তিন ফুট উঁচু একটি ঢিপির দুপাশ থেকে দুজন খেলোয়াড় একজন অপরজনের কাছে বল পাঠিয়ে দিতো হাতের চেটো দিয়ে। এইভাবেই চলতো খেলা। খুঁটিনাটি নিয়ম কী ছিল তা আজও অজানা। পরবর্তী কালে হাতে দস্তানা পরলো খেলোয়াড়রা। অবশেষে দস্তানা খুলে রেখে হাতে নিলো র‍্যাকেট আর ঢিপির বদলে খাটালো জাল। বলেরও বদল হলো। নতুন বল তৈরি হলো ভিতরে হাওয়া ভ'রে। খেলার নামকরণ হলো "টেনেজ"। শব্দটির অর্থ হলো—খেলা সুরু করো। ইংরেজিতে শব্দটির পরবর্তী পরিবর্তিত রূপ দাঁড়ালো টেনিস।

চোদ্দ শতকে ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই খেলাটি সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর ষোলো এবং সতের শতকে ব্যাপ্ত হলো অন্যদের মধ্যেও। ইংলন্ডে ঐ সময় খেলাটির নাম হয়েছিল রয়্যাল টেনিস এবং কোর্ট টেনিস। আধুনিক যুগে ফ্রান্সে টেনিস খেলার মান পেঁছেছে বিশ্ব-পর্যায়ে এবং অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

ফ্রান্সের অন্যান্য জনপ্রিয় খেলার তালিকায় আছে বাস্কেটবল, ভলিবল, জুডো, হ্যান্ডবল, স্কীয়িং, সাঁতার প্রভৃতি।

বিভিন্ন খেলার ক্লাবের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করে গেছে আজ থেকে দশ বছর আগেই।

কল্পনা করতে ভালো লাগে—ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিন স্বর্গলোক থেকে তাঁর স্বদেশের বর্তমান ক্রীড়ার প্রসার দেখে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

সুইডেন

জার্মানির মত সুইডেনেও শারীর শিক্ষার গুরুত্বের উৎস বিদেশী শক্তির আক্রমণ। উনিশ শতকের গোড়ায় ১৮০৮ সালে রাশিয়া যখন ফিনল্যান্ড দখল করে সুইডেনের একাংশ ছিন্ন করে দিল তখন থেকেই সুইডেনে দেশপ্রেমের হাওয়া বইতে সুরু করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুইডেন জার্মানির মতন জিমনাস্টিক-কে যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে ব্যবহার করেনি। জিমনাস্টিককে মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্যই বেশি ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল সুইডেন। কিন্তু দেশপ্রেমের হাওয়ার বেগও তো কম নয়। সুতরাং, সবল শরীর গঠনের মাধ্যমে দেশ রক্ষা ও সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করাও অন্যতম উদ্দেশ্য হলো।

সুইডেন

সুইডেনের শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কার্যকরি করায় সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন হেনরিক লিং। ১৭৭৬ সালের ১৫ই নভেম্বর লিং সুইডেনেই জন্মগ্রহণ করেন। ডেনমার্কের কোপেনহ্যাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাঁচ বছর সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। সেখানে লিং সাহিত্যের সঙ্গে অসিচালনা চর্চাও করেছিলেন এবং ডেনমার্কের খ্যাতিমান শারীর শিক্ষাবিদ ন্যাটগলের জিমনাসিয়ামে নিয়মিত যাতায়াত করে জিমনাস্টিকেও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। লিং যে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই জিমনাস্টিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি প্রাচীন গ্রীসের জিমনাস্টিক এবং জার্মানির গুটস মুথের জিমনাস্টিক সম্পর্কে গবেষণা করে নিজেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। বলতে গেলে, লিং এর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ও চিন্তাধারা ডেনমার্কেই তৈরি হয়েছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লিং যখন সুইডেনে ফিরে এলেন তখন তিনি একজন উন্নত মানের সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য প্রাজ্ঞ এবং অসিচালনা, সাঁতার ও জিমনাস্টিকে দারুণ দক্ষ ব্যক্তি। সুতরাং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন মাত্রই লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অসিচালনার শিক্ষকতার পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ায় যাঁর তৃপ্তি তিনি কি শুধু তরবারি ঘুরিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেন? ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেশের

হেনরিক লিং-এর অবদান

লোকদের জিমনাস্টিকের নানা ব্যায়ামের ও সাঁতারের শিক্ষা দেওয়া সুরু করলেন। আবার সেই সঙ্গে চললো কবিতা, নাটক রচনা। জিমনাস্টিক সম্পর্কেও কয়েকটি বই লিখে ফেললেন। লিং-এর নিজস্ব একটি জিমনাসিয়ামও ছিল। সেখানে অসিচালনা ও জিমনাস্টিকের নানারকম সরঞ্জাম ছিল।

লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর কাজ করার পর লিং সেখান থেকে এসে শারীর শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮০৪ সালে কোপেনহ্যাগেন ত্যাগের কিছুকাল পরেই তিনি কার্লবার্গের সামরিক কলেজের জিমনাস্টিক ১৮১৪ সালে স্টকহল্মে প্রতিষ্ঠিত হলো রয়্যাল ইনস্টিটিউট অভ্ জিমনাস্টিক। বলা বাহুল্য, সুইডেনের শ্রেষ্ঠ জিমনাস্টিক বিশারদ হের্নারিক লিংকেই সেখানকার ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত করা হলো জীবনের অবশিষ্ট ২৫ বছর লিং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

জিমনাস্টিক সম্পর্কে লিং এর চিন্তাধারায় যথেষ্ট মৌলিকতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন জিমনাস্টিক শিক্ষকের মানুষের দেহের যন্ত্রগুলির কার্যাবলীর সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। লিং একথাও বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গঠন ও ক্ষমতা অনুসারে তার ব্যায়ামের কার্যসূচী প্রস্তুত করতে হবে।

লিং ঘোষণা করেছিলেন—জিমনাস্টিক শুধু দুর্বলকে সবল করার জন্য নয়, সবলকে সচল করার জন্যেও।

যদিও লিং জিমনাস্টিক শিক্ষক হিসাবে প্রথম দিকে সরঞ্জামের সাহায্যেই বেশি শিক্ষা দিতেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিনা সরঞ্জামে খালি হাতে ব্যায়ামেই বেশি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে ঐ সময়কার জার্মান সরঞ্জামগুলি ব্যায়ামের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল না। এই কারণে লিং নিজেও কিছু জিমনাস্টিকের সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। তিনি সেগুলিই ব্যবহার করতেন অধিক। খালি হাতে ব্যায়ামের স্বপক্ষে লিং বলেছিলেন যে, এগুলি বিনা খরচে ঘরে বাইরে সর্বত্র ব্যবহার করা চলে এবং শিক্ষকের আদেশ ধ্বনির তালেতালে অনেক ছাত্র একত্রে অভ্যাস করতে পারে। একত্রে একই ধ্বনির সঙ্গে ব্যায়াম করার ফলে ছাত্রদের শৃংখলা বোধ, তৎপরতা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, মনঃসংযোগ ইত্যাদি গুণগুলি জন্মায়।

লিং জিমনাস্টিক বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। তার ফসল আমরা দেখি জিমনাস্টিককে চারভাগে বিভক্ত করা। ভাগগুলি ছিল এই রকম— (ক) শিক্ষাগত (খ) সামরিক (গ) আরোগ্যমূলক ও (ঘ) সৌন্দর্যব্যঞ্জক।

শিক্ষাগত

শিক্ষাগত জিমনাস্টিকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের দেহবৃদ্ধিতে সহায়তা করা ও কোনও অজটিল শারীরিক বিকৃতিকে সঠিক আকৃতি দান করা। আকৃতির বিকৃতিকে রোধ করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জাতীয় জিমনাস্টিকের সাহায্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের কাণ্ডকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। শুধু দেহসর্বস্ব নয় শিক্ষাগত জিমনাস্টিক, সুচরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ব নির্মাণও এর কার্য।

সামরিক

শরীরে শক্তি সঞ্চার করে দেশের সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করা এবং শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করাই সামরিক জিমনাস্টিকের মূল উদ্দেশ্য।

আরোগ্যমূলক

শরীরের কোনওরকম বিকৃতি বা অন্যান্য ত্রুটি সংশোধন করা আরোগ্যমূলক জিমনাস্টিকের প্রধান উদ্দেশ্য। একজনকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করেও মাঝে মাঝে এই জিমনাস্টিক করা হয়।

সৌন্দর্যব্যঞ্জক

জিমনাস্টিকের যে ব্যায়ামগুলির প্রদর্শনীকালে দর্শকের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য প্রতিভাত হয় সেগুলিই সৌন্দর্যব্যঞ্জক জিমনাস্টিক। কোনও কোনও সময় এর মাধ্যমে মনের কোনও ভাবের প্রকাশও হয়। আসলে, সব রকম জিমনাস্টিকের মধ্যেই সৌন্দর্য জড়ানো আছে নিপুণ-ভাবে। লিং বলেছিলেন, যদি কোনও দিন জিমনাস্টিক থেকে সৌন্দর্যকে বিযুক্ত করা হয় তবে সেদিন জিমনাস্টিকের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠবে।

অন্যান্য শারীর ক্রিয়া সম্পর্কে লিং-এর মতামত

সরঞ্জামসহ এবং বিনা সরঞ্জামের ব্যায়াম এই দুইভাগে লিং কয়েকটি শারীর ক্রিয়াকে বিভক্ত করেছিলেন। বিনা সরঞ্জামের বা খালি হাতের ব্যায়ামকে আবার চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। বিভাগগুলি এইরকম—বাহু সঞ্চালন, পদ সঞ্চালন, মস্তক আন্দোলন, এবং দেহকাণ্ডের নানা ব্যায়াম।

এর মধ্যে বাহু সঞ্চালনের ব্যায়ামগুলি সর্বদাই বেশ দ্রুতগতিতে

করার নির্দেশ ছিল। পদ সঞ্চালনের ব্যায়াম কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গতিতে হবে, তবে দেহকাণ্ডের ব্যায়াম সর্বদাই বেশ ধীরে হবে।

সরঞ্জামসহ ব্যায়াম দেহের শক্তিবৃদ্ধি ও মনের সাহস সঞ্চারে সহায়তা করে লিং একথা অনেকবার উল্লেখ করেছেন। দাঁড় বেয়ে ওঠা, ভার-সাম্যের ব্যায়াম, পোল ভল্ট, উচ্চ লাফ এবং আরও অন্যান্য ব্যায়াম বিভিন্ন সরঞ্জামের সাহায্যে করা যায়।

লিং আরোগ্যমূলক জিমনাস্টিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ আরোপ করেছিলেন কারণ এর সুফল সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। একবার ডেনমার্কে থাকাকালীন অসিচালনা করে তাঁর বাহুর একটি পুরনো ব্যথা কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়েছিল। রয়্যাল সেন্ট্রাল জিমনাস্টিক ইন্‌স্টিটিউটে ডিরেক্টর হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল এই আরোগ্যমূলক জিমনাস্টিক নিয়ে কাজ করেছিলেন। বস্তুত, লিংই মেডি-ক্যাল বা আরোগ্যমূলক জিমনাস্টিকের ভিত্তি স্থাপন করেন।

তিনি জিমনাস্টিক সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম (ক) ম্যানুয়াল ফর জিমনাস্টিকস্ (খ) জেনারেল প্রিন্‌সিপ্‌লস্ অফ জিমনাস্টিকস্ (গ) সোলজার্স্ ম্যানুয়াল অফ জিমনাস্টিকস্ এ্যাণ্ড্ বেঅনেট ফেন্‌সিং।

১৮৩৯ সালে লিং পরলোক গমন করেন।

লিং-এর মৃত্যুর পর রয়্যাল সেণ্ট্রাল জিমনাস্টিক ইনস্টিটিউটে ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন ঐ প্রতিষ্ঠানেরই প্রাক্তন ছাত্র ব্র্যান্টিং।

লিং-এর পরবর্তীকালে রয়্যাল সেন্ট্রাল জিমনাস্টিক ইনস্টিটিউট

১৮৬২ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের পর ঐ পদে আসেন গুস্টভ্ নাইব্রেয়াস। তিনি শারীর শিক্ষার পাঠক্রম একবছরের বদলে দুই বছরে বর্ধিত করেন এবং মহিলা শিক্ষকদের জন্যও একটি পাঠক্রম প্রচলিত করে মহিলাদের শারীর শিক্ষাদানের পথ খুলে দিলেন।

এই সময়েই ইনস্টিটিউটকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, আরোগ্য বা মেডিক্যাল, সামরিক এবং শিক্ষামূলক। প্রাক্তন সামরিক অফিসার নাই-ব্রেয়াসকে দেওয়া হলো সামরিক বিভাগের ভার, চিকিৎসক জোহান হার্টেলিয়াসকে মেডিক্যাল এবং হেনরিক লিং এর পুত্র যাল্‌মার লিং-এর উপর দায়িত্ব রইলো শিক্ষামূলক জিমনাস্টিকের।

যাল্‌মার লিং তাঁর পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত জিমনাস্টিকের ব্যায়ামের সঙ্গে আরও কয়েকটি নতুন ব্যায়াম যোগ করলেন এবং এমন কয়েকটি

নতুন সরঞ্জাম আবিষ্কার করলেন যেগুলি দ্বারা একই সঙ্গে অনেক ছাত্র সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। যাল্মারের এই আবিষ্কার সুইডেনের জিমনাস্টিক জগতে এক যুগান্তর এনে দিল। এছাড়া, জিমনাসিয়ামের গঠন কিরকম হবে, সেখানে কি কি সরঞ্জাম রাখা উচিত ঐ সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ করলেন। যাল্মার বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের জন্য ব্যায়াম-গুলি পৃথকভাবে সাজিয়ে দিলেন। আবার তাদের ক্লাশ নেবার জন্য লেস্ন প্ল্যান বা পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে তাতে প্রতিটি ব্যায়ামের উদ্দেশ্য লেখার ব্যবস্থা করেদিলেন। যার ফলে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা শৃংখলাপূর্ণ প্রোগ্রামের মধ্যে এসে গেল। শিক্ষকদের পক্ষে শারীর শিক্ষার ক্লাশ নেওয়া ব্যাপারটাও অনেক সহজ হয়ে গেল। তিনি ২000 ব্যায়াম ও জিমনাস্টিকের ছবি এঁকে দিয়ে শিক্ষকদের আরও সুবিধা করে দিয়ে ছিলেন।

যাল্মার লিং-এর অবদান

জিমনাস্টিকের এই পরিকল্পনাটি তিনি এমন সরল ও নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে, সুইডেনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের জন্য সেগুলি সরকার কর্তৃক সহজেই অনুমোদন লাভ করলো।

আধুনিক সুইডেনের জিমনাস্টিক-কর্মসূচীর মধ্যে সনাতন প্রথার বীম্, বেঞ্চ, ভল্টিং বাক্, দেওয়াল-বার ইত্যাদি তো আছেই, তার সঙ্গে আছে হরাইজন্টল বার, ভারোত্তলনের সরঞ্জাম এবং রিং। শারীর শিক্ষায় সুইডেনে ডেনমার্কের প্রভাব বরাবরই ছিল। আধুনিক সুইডেনে ম্যাটের উপর ডেনমার্কের নানা ধরণের শারীর ক্রিয়াগুলি প্রচলিত করা হলো।

সুইডেনের বর্তমান জিমনাস্টিক ও শারীর শিক্ষা

আধুনিক যুগ বরাবরই অতীত অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধতর করার সুযোগ পায়। সুইডেনের জিমনাস্টিক কর্মসূচীতে যুক্ত হলো বল এবং স্কিপিং-দড়ির সাহায্যে নানা ব্যায়াম। আর, সঙ্গীতের তালে তালে কত নতুন আবিষ্কৃত খালি-হাতে এবং সরঞ্জাম সমেত সমবেত ব্যায়াম।

সুইডেনের আধুনিক জিমনাস্টিক মুখ্যত, অনেক রকম শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোলা, এদিক ওদিকে ঘোরানো ইত্যাদি শারীর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অবশ্য, এর প্রত্যেকটি ক্রিয়ার বিশেষত্ব হলো ব্যায়ামে সৌন্দর্যের তুলি বোলানো। এই ব্যায়ামগুলির অংশ গ্রহণকারী এবং

দর্শক সকলেই এক নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। বিভিন্ন অঙ্গের ছন্দোময় একত্র দোলা ও ভঙ্গীগুলি যেমন মনোহর তেমনি শান্তি সঞ্চারক।

ছন্দোবদ্ধ জিমনাস্টিক সুইডেনে মেয়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তালাভ করেছে। এর সৌন্দর্য প্রকাশ ও গাম্ভীর্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ববোধ জাগ্রত করে এবং তাঁদের চরিত্রে একতা, ও দৃঢ়তা আনয়ন করে।

বস্তুত, হেনরিক লিং-এর পরিকল্পিত জিমনাস্টিকের ব্যায়ামগুলির উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সুইডেনের জিমনাস্টিক গড়ে উঠেছে। লিং প্রবর্তিত জিমনাস্টিক এবং আরও অন্যান্য নতুন সংযোজনের উপর বর্তমানে অনেক রকম গবেষণা কার্য চলছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শরীরের পটুতা ও সচলতা রক্ষার জন্য সুইডেনে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের একটা রীতিমত জোয়ার এসেছে বলা যায়। পাঁচ হাজারের চেয়েও বেশি কোম্পানি তাদের কর্মী ও কর্মীদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন রকম খেলাধূলা ও প্রমোদমূলক কর্মসূচীর অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে সেখানে দশ লক্ষ কর্মী ফুটবল, বরফের উপর হকি খেলা ও অন্যান্য খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে "স্পোর্ট সিক্সটি" নামে একটি খেলাধূলার কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, দেশের জনসাধারণের মধ্যে খেলাধূলা ও শারীর পটুতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। স্কিইং, সাইকেল চালানো, সাঁতার, হাঁটা, জিমনাস্টিক প্রভৃতি ক্রীড়ায় একটি সাধারণ মানে পৌঁছতে পারলে তাকে দেওয়া হয় একটি প্রশংসাসূচক ব্যাজ। এরই মধ্যে আর একটি বিষয় হলো মানচিত্র ও কম্পাসের সাহায্যে দৌড়ে পথ খুঁজে বের করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো।

সুইডেনের ছোট ছোট শহরেও উন্নত ধরণের খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে। ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস, ভলিবল, এ্যাথলেটিক ট্র্যাক, জিমনাস্টিক প্রভৃতি ক্রীড়ার সুবন্দোবস্ত আছে। আর আছে হাইকিং এবং স্কিইং-এর উপযুক্ত স্থান। সেগুলিতে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বলে উঠে খুব চমৎকার দেখায়। একদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার জন্যে ভারি সুন্দর কয়েকটি কুটিরও নির্মিত হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রামের উত্তম বন্দোবস্ত আছে সেখানে।

শরৎ আর বসন্তকালের উজ্জ্বল দিনগুলিতে খেলাধূলো, এ্যাথলেটিক্স্ আর সাঁতারে সুইডেনের যুবক যুবতীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আনন্দে

অতিবাহন করে।

শরীর চর্চা শুধু স্বাস্থ্যগঠন আর আনন্দ উপভোগের জন্য নয়। সুইডেনের মানুষদের বাল্যকাল থেকেই শেখানো হয় কেমন করে বসতে হয়, দাঁড়াতে হয়, হাঁটতে হয়। তারই ফলে, সুন্দর ও নিখুঁত দেহ ভঙ্গী সহকারে এই ক্রিয়াগুলি করার সময় তাদের বেশ সতেজ দেখায় আর আয়াস বিহীন মনে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট।

মানুষের জানারও যেমন সমাপ্তি নেই, শিক্ষাদানেরও তেমনি ইতি নেই। স্বাস্থ্য রক্ষার অনেক নিয়ম, কোন্ ব্যায়ামের কী ফল, রাস্তা ঘাটে চলাচলের কোনটা নিরাপদ পন্থা ইত্যাদি বিষয়ও সুইডেনে শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

"গৃহিনীদের জন্য জিমনাস্টিক" ক্লাশের ঘোষণায় প্রথমে যোগদান করেছিল মাত্র ১৭ জন। আর, ঠিক তিন বছরে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ সহস্রে। কারখানার কর্মীদের মধ্যে বিশেষ কোনও ধরণের দেহভঙ্গীতে দীর্ঘ সময় যাদের অতিবাহিত করতে হয় তাদের দৈহিক বিকৃতিরোধের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যায়াম বিধি তৈরি করা হয়েছে। দপ্তর কেরানিদের সম্মুখ দিকে ঝুঁকে চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার জন্য দেহ কাণ্ডের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে, তাদের জন্যও ভাবনা চিন্তা করে বিশেষ ধরণের জিমনাস্টিক-ব্যায়ামের নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশকে অর্থাৎ দেশের মানুষকে ভালোবাসা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই জাতীয় আরোগ্যমূলক ব্যায়ামগুলি।

আজকের সুইডেনে প্রতি ছয় জনের মধ্যে একজন অন্তত একটি ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

সুইডেনে ক্রিকেট নেই কিন্তু গলফ্ আছে রাগবি নেই, বাস্কেটবল আছে, বেস্‌বল নেই তবে টেনিস আছে। ফুটবল ও তার নিত্যসঙ্গী উন্মাদনা আর দর্শকের অভাব নেই। ফুটবল খেলোয়াড়রা আধুনিক ফুটবলের শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট উন্নত মানে উন্নীত হয়েছে। বরফের উপরে হকি খেলায় এখানকার খেলোয়াড়রা ওস্তাদ। আইস হকি নামে এই উত্তেজনাপূর্ণ ও অসাধারণ নৈপুণ্যনির্ভর খেলাটি সুইডেনে জনপ্রিয়-তার শীর্ষে।

যে ক্রীড়ায় পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা যাচাই করা যায় তার প্রতি এখান-কার শক্তিমানদের আকর্ষণের অন্ত নেই। তাই দেখা যায় কুস্তির প্রাঙ্গণে, মুষ্টিযুদ্ধের রিং এ, ভারোত্তলনের বোর্ডে আর দাঁড় টানাটানিতে প্রতি-

দ্বন্দ্বীদের ভিড় লেগেই আছে।

বিশ্ব অলিম্পিকের আসরে সুইডেন পিছনের সারির দেশ নয়। এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ে সুইডেন অনেক স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছে। অলিম্পিকে বন্দুক ছোঁড়া, নৌকা চালানো, অসিচালনা, ক্যানোয়িং, সাইকেল চালানো, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সুইডেন বেশ পারদর্শিতা দেখায়।

শীত প্রধান সুইডেনে যখন হ্রস্ব গ্রীষ্মকাল রৌদ্রালোকের আশীর্বাদ নিয়ে আবির্ভূত হয় তখন এখানকার প্রায় সব মানুষই মেতে ওঠে অনাবিল উৎসবের আনন্দে। সূর্য কিরণে স্নান করেই তাদের তৃপ্তির সমাপ্তি হয় না, পাহাড়ের চূড়ায় বেয়ে ওঠে দু'চোখ ভরে সূর্যোদয় দেখার আকুল আগ্রহে।

এই ঋতুকালটি সুইডেনবাসীর ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার ডাক দেয়। সেই ডাকে সাড়া দেবার জন্যে অবশ্য তারা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকে। ডাক পাওয়া মাত্র দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চলতে থাকে পথে পথে পথ-চলার আনন্দে। দলে দলে তারা নৌকো চড়ে বেড়ায় হ্রদে, নদীতে, সমুদ্রে জলের বাতাস খেতে খেতে। অরণ্যের সর্পিল পথে হেঁটে বেড়ায় পথ খুঁজে খুঁজে। সমুদ্রের জলে প্রাণ ভরে সাঁতার কেটে তারপর তীরে বসে বসে নীল জলের ঢেউ দেখে। উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে সেখান থেকে নীচের মানুষগুলোর হাঁটা চলা দেখে তাদের পিঁপড়ের সারি আর বাড়ীগুলোকে দেশলাইয়ের বাক্স ভেবে মনে মনে ভারি মজা পায়। বাড়ী থেকে অনেক দূরের হোটেল বা ভাড়া নেওয়া ছোট কুটিরই তখন তাদের বাসা।

সুইডেনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার মানুষকে খেলা ধূলার জগতে অংশ নেবার জন্যে পরোক্ষভাবে দারুণ ভাবে সহযোগিতা করেছে।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কের শারীর শিক্ষার ইতিহাসের প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন ফ্রানজ্ ন্যাটগল। কোপেনহ্যাগেনে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাটগলের জন্ম হয়। অসিচালনা ও নানা রকম লাফ দেওয়ায় তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জার্মানির গুট্স মুথের জিমনাস্টিকের ব্যায়ামগুলি তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। তিনি ১৭৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটি শারীর শিক্ষার ক্লাব গঠন করে সেখানে গুটস্ মুথের প্রবর্তিত জিমনাস্টিকই অনুসরণ করলেন। এর পর ন্যাটগল নিজের জন্মস্থান কোপেনহ্যাগেনে একটা আচ্ছাদনবিহীন জিমনাসিয়াম তৈরি করেন। আধুনিক ইউরোপে এই জাতীয় জিমনাসিয়াম এটাই প্রথম। এর ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়তে বাড়তে পাঁচ বছরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা দেড়শো অতিক্রম করে গেল।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কে ন্যাটগলের জিমনাস্টিক ও তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি তখন তুঙ্গে। এই সময় ১৮০৪ সালে কোপেনহ্যাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাস্টিকের প্রফেসর পদে ন্যাটগল নিযুক্ত হন। শুধু চারদেওয়ালের গণ্ডির মধ্যেই নয়, তিনি উন্মুক্ত জায়গায় নিজে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশগুলিও নিতেন। ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত শারীর শিক্ষার শিক্ষক ট্রেনিং স্কুলে তিনি ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন।

ন্যাটগলের যোগ্য নেতৃত্বে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ডেনমার্কের স্কুলে শারীর শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ের সমমর্যাদা লাভ করলো।

এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু ঐ সময়কার নেপোলিয়ন ভীতির দরুণ রাজনৈতিক ও দেশ প্রেমের হাওয়া অন্যান্য কয়েকটি দেশের মত ডেনমার্ককেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তারই ফলে ন্যাটগলকেও শারীর শিক্ষার ব্যাপক ও উদার আদর্শকে সংকুচিত করে সামরিক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে সেই অনুসারে শরীর চর্চাকে ব্যবহার করতে হলো।

প্রথমে ন্যাটগল মোটামুটিভাবে জার্মানির গুট্স মুথকেই অনুসরণ করে ডেনমার্কে শারীর শিক্ষার একটা কর্মসূচী প্রস্তুত করেছিলেন। মই-এ ঝোলা, খুঁটি বেয়ে উঁচুতে ওঠা, নানারকম লাফ দেওয়া, সাঁতার, ভারসাম্যের খেলা, দড়ি টানাটানি, সামরিক প্যারেড ও ড্রিল, এই শারীর

ক্রিয়াগুলি ডেনমার্কের কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। এই জাতীয় শারীর ক্রিয়া সামরিক বাহিনীর লোকেদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরি।

তারপর কালক্রমে সেই ঝড়ো হাওয়া থেমে গিয়ে যখন বসন্তের হাওয়া বইলো তখন ডেনমার্ক শারীর শিক্ষার উদার ও ব্যাপক আদর্শ রূপায়ণে মনোনিবেশ করলো।

ন্যাটগল ডেনমার্কের পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের শারীর শিক্ষাদানে নানাভাবে সাহায্য করলেন। ডেনমার্কের রাজার অনুমতি লাভ করে তিনি "ম্যানুয়াল অভ্ জিমনাস্টিক" গ্রন্থটি সরকারি পর্যায়ে প্রত্যেক স্কুলে বিলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ন্যাটগল ডেনমার্কে মেয়েদেরও শারীর শিক্ষা দানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

ন্যাটগলের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ডেনমার্কে জিমনাস্টিক আন্দোলন এক নতুন পথে যাত্রা করলো। প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার মুখে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষকেরা শারীর শিক্ষায় নেতৃত্ব দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। প্রসঙ্গত, ডেনমার্ক একটি কৃষি-প্রধান দেশ হওয়ার দরুণ এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ১৮৬৪ সালে যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে দেশবাসীর হতাশা জর্জরিত মনে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনার মানসে এবং সেই সঙ্গে একত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কাজ করলে অমৃত ফল লাভ করা যায়—এই মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করার অভিপ্রায়ে এই শিক্ষকেরা জিমনাস্টিককে ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন।

ফোক্ স্কুল বা পল্লী অঞ্চল স্কুল

এই পল্লী উচ্চ বিদ্যালয়গুলির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। এগুলির কার্যধারার মৌলিকতা লক্ষ্যণীয়। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক যুবক। অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ করার ছাড়পত্র না থাকলে এখানে ভর্তির সুযোগ মেলে না। পাঠক্রমের মধ্যে আছে ভাষা, জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস, ঘর তৈরি করা, কৃষি বিদ্যা, সংগীত এবং জিমনাস্টিক। কয়েকটি বিদ্যালয় জিমনাস্টিক ও এ্যাথলেটিকসের ওপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। কালক্রমে লিং-প্রবর্তিত সুইডেনের জিমনাস্টিক এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত হয়েছিল।

শারীর শিক্ষার সুরু স্কুল পর্যায়ে হবে না তো আর কবে হবে? পরে তো শরীরের স্বাভাবিক সচলতা আর থাকবে না। তখন জিমনাস্টিক ও অন্যান্য শারীর ক্রিয়া সুরু করতে গেলে অনেকের কাছেই সেটা হবে বোঝা। শারীর শিক্ষাকে যে সব দেশ বাস্তবিকই মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক

ডেনমার্ক তাদের অন্যতম। সুতরাং, বাস্তব জ্ঞানে সমৃদ্ধ ডেনমার্ক অযথা বিলম্ব না করে স্কুলের ছাত্রদের জন্যই শারীর শিক্ষাকে অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রাথমিক ক্লাশগুলিতে সপ্তাহে ১০০ মিনিটের শারীর শিক্ষার ক্লাশ সুরু করা হলো। মাধ্যমিক পর্যায়ে আরও ৫০ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পরীক্ষার বিষয় অবশ্য হলো না শারীর শিক্ষা তবে বৎসরান্তে এর জন্যে পারদর্শিতা অনুযায়ী ছাত্রদের তিনটি গ্রেডের ব্যবস্থা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক না থাকলেও শারীর শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রদের এক তৃতীয়াংশের অংশগ্রহণ সর্বদাই থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শারীর শিক্ষা

১৯৪৬ সালে ডেনমার্ক-সরকার জিমনাসিয়াম বিহীন বিদ্যালয়গুলিতে অবিলম্বে দেওয়াল-বার, ভারসাম্যরক্ষার বীম, ডিগবাজি খাওয়ার জন্য লোহার বার, ছোট ভলিটং বাক্, হাইজাম্পের কাঠের স্ট্যান্ড, বেয়ে বেয়ে ওঠার জন্য ভারি মোটা দড়ি, স্কিপিং-দড়ি, বিভিন্ন শারীর ক্রিয়ার জন্য ম্যাট্রেস্ অর্থাৎ পুরু গদিযুক্ত মোটা কাপড় মোড়ানো মাদুর এবং একটি জাম্পিং পিট সমেত একটি করে জিমনাসিয়াম তৈরি করার জন্য অনুরোধ করলেন। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে দেখা গেল ডেনমার্কের প্রায় সব বিদ্যালয়েই জিমনাসিয়াম তৈরি হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে অবশ্য ব্যতিক্রম হলো। সেখানে অর্ধেকের বেশি বিদ্যালয় জিমনাসিয়াম করতে পারেনি।

ডেনমার্কের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এখনও জিমনাস্টিকের প্রাধান্য অপ্রতিহত। শরীরের সার্বিক উন্নতিতে জিমনাস্টিকের বিকল্প নেই, এই ধারণাই পোষণ করে ডেনমার্ক। সম্প্রতি, কয়েকরকম খেলাধূলার প্রসার ডেন-মার্কের সবুজ ঘাসের বুকে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। দলগত খেলার অসামান্য আকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বেশি দিন। তার ঢেউ আসবেই। তাই ফুটবল এসেছে, হ্যান্ডবল এসেছে। স্কুলের মেয়েরাও খেলে হ্যান্ডবল। কিন্তু তাই বলে জিমনাস্টিকের গুরুত্ব কখনোই কমেনি। বিদ্যালয়ের রুটিনে নিয়মিতভাবে জিমনাস্টিক ক্লাশ নেন শিক্ষকেরা।

এ্যাথলেটিকস্‌ও পিছিয়ে নেই। নানা দূরত্বের দৌড়, কয়েকরকম লাফানো, নিক্ষেপ এবং রিলে রেস ডেনমার্কের বিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রচলিত হয়েছে। এ্যাথলেটিকসের এই বিষয়গুলিতে বিদ্যালয়ের বিশেষ পারদর্শী ছাত্রদের "স্কুল এ্যাথলেটিকস ব্যাজ" দেওয়া হয়।

যদিও এখানে শীতের জন্য বছরের অল্প সময়েই সাঁতার কাটা সম্ভব

নয়। তবে ইচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব হয় না। ঐ সীমিত সময়ের মধ্যেই সন্তরণ চর্চা হয়। এমন কি, লাইফ-সেভিং ও সাঁতারের অন্যান্য বিষয়ে যারা দক্ষতা অর্জন করে তারা সম্মান সূচক সার্টিফিকেট পায়। আর যে ছেলেমেয়েরা সাঁতার জানেনা তাদের সাঁতার শেখাবারও বন্দোবস্ত আছে।

বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে শরীরতত্ত্ব, শরীরের সব যন্ত্রাবলীর কার্যাবলী এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ানো হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষার ক্লাশগুলি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জিমনাস্টিক পরিদর্শকরা প্রায়ই তাঁদের সহযোগীদের সাহায্যে তত্ত্বাবধান করেন। ডেনমার্কের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সকলকেই চার বছরের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে ট্রেনিং নেওয়া আবশ্যিক। তারমধ্যে শারীর শিক্ষা বিষয়ে ৫৬০টি "লেসন্" নিতে হয়। বড়ো বড়ো শহরের স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের পূর্ণ এক বছরের ট্রেনিং নেওয়া বাধ্যতামূলক। তাঁদের ট্রেনিং এর জন্য ডেনমার্কে দুইটি কলেজ আছে, "ড্যানিশ টিচার্স হাই স্কুল" এবং ডেনমার্কের শারীর শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ। ডেনমার্কের সিল্ক্বর্গে মহিলাদের এবং ফ্রেডেন্সবর্গে পুরুষদের জন্য শারীর শিক্ষার কলেজ আছে।

ডেনমার্কের স্কুলে ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের এই নাগরিকদের খুবই পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ভিটামিন, প্রোটিন সমৃদ্ধ সেই খাদ্য খেয়ে ছেলেমেয়েরা, স্বভাবতই, শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার ক্লাশে নব উদ্যমে অংশ গ্রহণ করে। সহজে ক্লান্তি আসেনা দেহে ও মনে।

সেখানকার দায়িত্বশীল সরকার ছাত্রদের অসুখ বিসুখের প্রতি প্রখর দৃষ্টি দেন। বয়স অনুপাতে তাদের উচ্চতা ও ওজন যথার্থ কিনা দেখার জন্য নিয়মিত পরিমাপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে।

পূর্ণ কিংবা অর্ধ ছুটির দিনে কোনও কোনও স্কুলে ছাত্রদের নিয়ে দূর দূরান্তে পদব্রজে ভ্রমণ, একদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং শারীর শিক্ষার নানারকম খেলার আসরের ব্যবস্থা করা হয়। আর আছে "ক্রীড়া দিবস।" সে দিন আলাদাভাবে কোনও ব্যক্তির খেলা নয়, যা হবে সবই দলগত খেলা। জিমনাস্টিক কিংবা মার্চিং অথবা যে কোনও খেলাই সবই হবে দলগত ভাবে, একত্রে। আর অংশ গ্রহণ করবে শুধু দক্ষরা নয়, যাদের ক্রীড়া মান নীচে তারাও যোগ দেবে সবার সঙ্গে। সেদিন খেলার

মেলায় সবার রঙে রঙ্ মেলাতে হবে।

ডেনমার্কের শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর এবং মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। দেশের ছেলেমেয়েদের সবল, মনোহর স্বাস্থ্য তৈরি করে তাদের শরীরকে চাবুকের মত চটপটে আর হরিণের মত গতি-শীল করে তোলা এবং সেই সঙ্গে শরীর চর্চা আর খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের আনন্দও যেন তারা পায়, এমনি ভাবেই তৈরি হয় কর্মসূচী। ছেলেমেয়েদের শুধু কয়েকটি শরীরগত কৌশল শিখে আর খেলার সাময়িক আনন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। স্কুল-জীবন যেন তাদের পরবর্তী জীবনকালকে অর্থময় করে তুলতে পারে এবং তাদের ব্যক্তিগত নানাগুণ-গুলি যেন বিকশিত হতে পারে পূর্ণজ্যোতিতে। শারীর শিক্ষার এই আদর্শই ডেনমার্কের মূল আদর্শ। ডেনমার্ক আরও বলে। বলে, জীবনকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসো, অঞ্জলি ভরে তার সুধা পান করো। দেশের সব মানুষ যেন তোমার আপনজন হয়।

নীলস্ বাক্ ডেনমার্কের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। জিমনাস্টিক-অন্ত প্রাণ এই ব্যক্তি জিমনাস্টিক ব্যায়ামের সাহায্যে মানুষের কর্মক্ষমতাকে দীর্ঘ স্থায়ীত্ব দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওলেরাপ নামক স্থানে একটি জিমনাস্টিক হাইস্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৯১৯ সালে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই স্কুলটি ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় জিমনাস্টিক-প্রদর্শনী দেখিয়েছিল। পল্লীর লোকদের সর্বাপেক্ষা শারীরিক প্রয়োজন হলো শক্তির সঙ্গে অঙ্গ সমূহের সচলতা। এই দুটি জিনিস না থাকলে তাদের কর্মজীবন সফলতা লাভ করবে না। এই জন্যই নীলস্ বাক্ তাঁর প্রবর্তিত ব্যায়ামগুলিতে এ দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন।

নীলস্ বাকের অবদান

এছাড়া, তৎকালীন সুইজারল্যাণ্ড-জিমনাস্টিকের সঙ্গে তাঁর একটি বিষয়ে বেশ পার্থক্য ছিল। এক স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় সুইজারল্যাণ্ড-এর জিমনাস্টিকে অনেকরকম ব্যায়াম করানো প্রচলিত ছিল। বাক্স্ কিন্তু জিমনাস্টিকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গতি সঞ্চালনের বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। একের পর এক ছন্দোবদ্ধ ব্যায়াম তাঁর এই উদ্দেশ্যের সহায়ক ছিল। বাক্স্ ডেনমার্কের জিমনাস্টিকে নতুনত্বের সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর সমগ্র কর্ম-সূচীতে ব্যায়ামগুলির মাঝে কোনও বিরতি না রেখে পর পর করার ব্যবস্থা ছিল। ব্যায়ামগুলি আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল, গলা, হাত, পা, পেট, কোমর, মার্চ, ডিগবাজি ইত্যাদি। বাক্ কয়েকটি ব্যায়ামকে

অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। বীম্ ও বেঞ্চের উপর ব্যায়াম-গুলি তাঁর কর্মসূচীতে স্থান দেননি। নানাপ্রকার জিমনাস্টিক ও ব্যায়াম অগ্রসর শিক্ষার্থীদের তিনি কয়েকটি দুরূহ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। সেগুলির নাম "এ্যাথলেটিক জিমনাস্টিক।" এছাড়া, আরও কতকগুলি ব্যায়ামের চার্ট ছিল যার মধ্যে প্রথমে মার্চিং, তারপর আনুমানিক আধ ঘণ্টা খালি হাতে নানারকম আঙ্গিকের ব্যায়াম। এর পরেই পাঁচ থেকে দশ মিনিট দেওয়াল বারের কয়েকরকম কঠোর ব্যায়াম এবং সর্বশেষে দশ মিনিট ঝড়ের গতিতে লাফালাফি করা, শরীর তৎপরতার ব্যায়াম ও জিম-নাসিয়ামের চতুর্দিকে বীরত্বব্যঞ্জক গান সহকারে পুনরায় মার্চিং। প্রসঙ্গত, ডেনমার্কের সর্বাধুনিক জিমনাস্টিক-কর্মসূচীতে বাকের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ওলেরাপ স্কুলের আয়তন ও বিভিন্ন ক্রীড়ার সুযোগ-সুবিধা কী তা থেকেই বেশ বোঝা যায় তার গুরুত্ব ও বিশালত্বের পরিমাণ। এখানে ২৫০ জন শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা ছিল। হয়তো পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। বিশাল জিমনাসিয়াম, আচ্ছাদিত সাঁতারের পুল, চারটে ফুটবল মাঠ, চারশো মিটার দৌড়ের ট্র্যাক। এ সবই এই স্কুলের অন্তর্গত। ওলেরাপ স্কুলে একটি বিশাল এ্যাম্ফি থিয়েটার আছে যেখানে ৫০,০০০ হাজার দর্শকের সংকুলান সম্ভব।

১৮৯১ সালে স্টকহলমের রয়্যাল সেন্ট্রাল জিমনাস্টিক ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসবার অনতিবিলম্বেই নুডসেন রাইস্লিঞ্জের বিখ্যাত পল্লী হাইস্কুলে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি জিমনাস্টিকের রাজ্য-পরিদর্শকের পদে দীর্ঘ তিরিশ বছর কাজ করেন। ডেনমার্কে সুইডেনের জিমনাস্টিক প্রবর্তনায় তাঁর অবদানই সর্বাধিক। তবে নুডসেনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক জিমনাস্টিকের প্রভাব দূর করা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শারীর শিক্ষার শিক্ষক পদে সামরিক অফিসারদের নিয়োগ একেবারেই বন্ধ করে দেন।

কে, এ, নুডসেনের অবদান

নুডসেন জিমনাস্টিক সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। তাঁর লিখিত "টেকস্ট বুক অফ্ জিমনাস্টিক" আজও পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জিমনাস্টিক-শিক্ষকদের কাছে বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ।

নুডসেন তাঁর শারীর শিক্ষার ব্যায়ামের কার্যসূচীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—প্রারম্ভিক, প্রধান এবং শেষ পর্যায়। প্রারম্ভিকে শুধু গলা, হাত এবং পায়ের কয়েকটি ব্যায়াম আছে। প্রধানের মধ্যে আছে

ভারসাম্য রক্ষার ব্যায়াম, দেহের নানা অঙ্গের ব্যায়াম, মার্চিং, দৌড়, লাফানো, নানারকম লাফ, এবং তৎপরতার ব্যায়াম। আর শেষ পর্যায়ের মধ্যে আছে প্রধানত নিঃশ্বাসের ব্যায়াম।

এই ব্যায়ামগুলির মধ্যে প্রতি বিভাগেই প্রথমে সহজ তারপরে কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যায়ামগুলি করতে হবে।

নুডসেনের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যেন বয়সের পার্থক্যে ব্যায়ামেরও পার্থক্য রাখা হয়। এ সম্পর্কে তাঁর কার্যসূচী ভাগ করা আছে। আর মেয়েদের জন্য তো আলাদা ব্যায়াম আছেই যেগুলি তাদের উপযুক্ত।

১৯৫১ সালে নুডসেনের মৃত্যু হয়।

জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কোপেনহ্যাগেনে একটি বিশাল স্পোর্টস পার্ক স্থাপিত হয়। ২২ একর জমির উপর নির্মিত এই পার্কের মধ্যে আছে একটি এ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, ফুটবল ও হকি খেলার আলাদা মাঠ, আচ্ছাদিত দুটি টেনিস কোর্ট, সাঁতার-পুল একটি, নানারকম ব্যায়াম ও ড্রিল করার জন্য ছয়টি বড়ো হল-ঘর এবং পঁয়ত্রিশটি স্বল্প দূরত্বের বন্দুক ছোঁড়ার গ্যালারি।

কোপেনহাগেন স্পোর্টস পার্ক

এই পার্কটি দেখাশুনা এবং নানা ব্যবস্থাপনার জন্য আছে একটি বোর্ড। শহরের পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক অনুদান, এখানকার দোকান, রেস্টুরেণ্ট ও সিনেমা হলের ভাড়া এবং জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রবেশ মূল্যের টাকা ব্যয়িত হয় পার্কের বিভিন্ন রকম খরচ বহন করার জন্য।

বলতে গেলে কোপেনহ্যাগেন স্পোর্টস পার্ক একটি নাতি বৃহৎ শহর কারণ শহরের অনেক রকম সুবিধাই এখানে আছে। এর অনুকরণে ডেনমার্কের অন্যান্য শহরগুলিতেও কয়েকটি স্পোর্টস পার্ক তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আকৃতিতে এত বড়ো নয় এবং এরকম ব্যাপক ক্রীড়াব্যবস্থাও সেখানে নেই।

ডেনমার্কের শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে কোপেনহ্যাগেনের এই স্পোর্টস পার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রী ছাত্রেরা এখানে এসে বিভিন্ন রকম শরীর চর্চায় অংশ গ্রহণ করে।

জাপান

জাপানের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দেশের সরকার অভিজাত সম্প্রদায় ও সামরিক নেতাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। অতএব, নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেরাও শারীর শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে ক্ষমতা অর্জন করতেন। অশ্বারোহণ, অসিচালনা, মল্লযুদ্ধ, ধনুর্বিদ্যা, শিকার, সাঁতার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা সকলেই বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠতেন। সেনাবাহিনীর লোকদেরও এগুলি শেখা ছিল আবশ্যিক। আর, অসামরিক সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মল্লক্রীড়া ও সাঁতার যথেষ্ট জনপ্রিয় ক্রীড়া হিসাবে প্রচলিত ছিল।

শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যদেশগুলির অন্যতম প্রতিবেশী চীনের কাছে জাপানের অন্তহীন ঋণ। শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। জাপানের বিখ্যাত জুডো কৌশলও চীনের যুযুৎসু দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য, এ দুটির মধ্যে প্রভেদও বিদ্যমান। যুযুৎসুতে প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিপক্ষের স্নায়ু কেন্দ্রে এবং রক্তবাহিত শিরায় চাপ সৃষ্টি ক'রে তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা। অথচ, জুডোর প্রধান কাজ হলো আত্মরক্ষা ও নিজের নিরাপত্তা।

জাপানের অধ্যাপক জিগোরো কানো হলেন জুডোর স্রষ্টা। ১৮৮০ সালে তিনি জুডো শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যুযুৎসু থেকে পাশবিক কৌশলগুলি বর্জন করে তিনি জুডো প্রথা প্রচলন করেন। জাপান সরকার পুলিশ, সামরিক বাহিনী থেকে আরম্ভ করে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র জুডো শেখাবার বন্দোবস্ত করেন। জুডোর প্রসারের জন্য জাপানী জুডো প্রশিক্ষকরা ইংলন্ড এবং আমেরিকায় গিয়ে জুডোর প্রদর্শনী দেখান।

জুডোয় যারা সর্বোত্তম তাদের "ব্ল্যাক বেল্ট" উপাধি দান করা হয়।

আধুনিক জাপানের শারীর শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ— (ক) মেইজি যুগ পর্যন্ত কাল অর্থাৎ ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। (খ) মেইজি যুগ থেকে সুরুর কাল অর্থাৎ ১৮৬৭ সালের পরবর্তী সময়।

উপরোক্ত দুই যুগের প্রথমটিতে কনফিউসিয়াস মতবাদের বিশেষ

প্রাধান্য ছিল। তখনকার মতাদর্শ অনুসারে দেশের সরকার ছিল "ব্যক্তির, পরিবারের, দেশের এবং বিশ্বের।" মানুষকে মানবিকতায় মণ্ডিত করা এবং শৌর্যে উদ্দীপ্ত করার জন্য প্রেম, শ্রদ্ধা, দান, ক্ষমা, সংযত, সহনশীলতা ও দুষ্টের দমন, এই গুণগুলির প্রচারে সোচ্চার ছিল কনফিউসিয়াস মতবাদ। সেই অনুসারে প্রয়োজনে যুদ্ধ ও বল প্রয়োগের জন্য শারীর শিক্ষার সাহায্য নেওয়া অনিবার্য হলো। ধনুর্বিদ্যা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ, বর্শা নিক্ষেপ ও জুডোর চর্চায় আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলো। তবে সৈনিকদের শুধু যুদ্ধ-বিদ্যা ও শরীর চর্চাই যথেষ্ট নয়। কেন না, তাহলে বর্বরদের সঙ্গে পার্থক্য থাকবে না। এইজন্য সমান্তরাল ভাবে নানা মানবিক গুণাবলীর শিক্ষা ও প্রচার ব্যবস্থা রাখা হলো। অযোদ্ধারাও অবহেলা করেনি শারীর শিক্ষায়। মল্লবিদ্যা ও সন্তরণে তারা জাপানের ঐতিহ্য বজায় রাখলো।

আধুনিক কাল

এই সময় ওলন্দাজদের প্রভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বৃহৎ ঢেউ জাপানের উপকূলে আছড়ে পড়ে। যার ফলে, শারীর শিক্ষার প্রতি জনমানসে আধুনিক মতবাদের ছায়া পড়ে। শারীর শিক্ষার অনেক আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য জাপানীরা জানতে পারে। মেইজি যুগের সূচনায় জাপানের বিদ্যালয়গুলিতে ক্যালিসথেনিক্স বা খালি হাতের অনেক রকম শারীর ক্রিয়া ও ছন্দোবদ্ধ ব্যায়াম প্রচলিত হয়ে যায়। ১৮৭৮ সালে জি, লেল্যাণ্ড ও ডায়ো নামে দুই মার্কিন শিক্ষাবিদের প্রভাবে জাপানে কিছু কিছু হাল্কা সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যায়াম চর্চাও সুরু হয় এবং ১৮৮৬ সালে স্কুলের জন্য শারীর শিক্ষার প্রবর্তিত কর্মসূচীতে রাখা হয় খালি হাতে ও সরঞ্জাম সহ উভয় প্রকারের বিভিন্ন ব্যায়াম। তার সঙ্গে অবশ্য সামরিক ড্রিলও অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই কার্যসূচী অব্যাহত ছিল। শারীর শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিল।

এর কিছুকাল পরেই ইউরোপ থেকে এলো বিশ্ব খ্যাত "সুইডিশ জিমনাস্টিক্।" অতএব, পুনরায় স্কুলের শারীর শিক্ষার পাঠক্রমের পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এবার তাতে থাকলো সুইডিস জিমনাস্টিক, বিভিন্ন প্রকার খেলা ও নৃত্য, ক্যালিসথেনিক্স, সামরিক ড্রিল, অসিচালনা, জুডো ইত্যাদি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাপান বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদান

ক'রে খেলাধুলার জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

জাপানের শারীর শিক্ষার ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে এক আমূল পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জিমনাস্টিক, ড্রিল, ক্যালিসথেনিক্সের চেয়ে নানারকম ক্রীড়ার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলো। অর্থাৎ আমোদের মাধ্যমে শরীর চর্চাই প্রাধান্য পেল বেশি। শুধু তাই নয়, দলবদ্ধ খেলায় স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংহতি বোধ, ব্যক্তিত্ব, শৃংখলা ইত্যাদি গুণেরও বিকাশ হয়। দেখা গেল, বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা খেলায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ পায় অনেক বেশি, এবং তার ফলে তাদের অংশগ্রহণও হয় স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব, নতুন প্রবর্তিত পাঠক্রমে পুরাতন বিষয়গুলির সঙ্গে বিভিন্ন ক্রীড়াকে সংযুক্ত করা হলো এবং তার জন্য পৃথক সময়ও নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা হলো।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের একেবারে শেষ ভাগে বেজে উঠলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। জাপানও তাতে জড়িয়ে পড়লো ঘনিষ্ঠ ভাবে। তখন সাময়িকভাবে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক বছরের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে গেল। শারীর শিক্ষার পরিপাটি কার্যসূচী বর্জন ক'রে দেশ জুড়ে প্রায় সকলকেই সমর-প্রস্তুতিতে যোগদান ক'রে তালে তালে পা ফেলে রাইফেল কাঁধে নিয়ে কঠোর সামরিক শিক্ষায় যুক্ত ক'রে দেওয়া হলো।

যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হবার পর জাপান আবার জাগ্রত হলো। পরিত্যক্ত হলো বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা থেকে সর্বরকম সামরিক শিক্ষা। অন্তর্ভুক্ত হলো অনেক রকম ক্রীড়া, নৃত্য, এ্যাথলেটিক্স আর মাঝে মাঝে শহরের উপকন্ঠে দলবদ্ধ ভ্রমণ—কখনও হেঁটে, কখনও সাইকেলে। এই-ভাবে কর্মসূচীর থলেতে আনন্দকেও পুরে দিয়ে তাকে আরও গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় ক'রে পূর্ণতা দান করা হলো। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও মহা-বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা তার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলো। অন্যান্য বিষয়ের মতো পরীক্ষায় শারীর শিক্ষাতেও সফল হওয়া আবশ্যিক করা হলো।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বেই সাঁতার শিখিয়ে দেওয়া হয়। অল্প জলের পুলে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রায় আপনা থেকেই তারা কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শিখে ফেলে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিশেষ যত্ন সহকারে

শিক্ষাদান করা হয়। পাশ্চাত্য দেশের শারীর শিক্ষার তত্ত্বগুলি ভিত্তি ক'রে জাপানে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও আছে। এছাড়া, শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজ ও নানারকম খেলার প্রশিক্ষক তৈরি করার জন্য প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে। শারীর শিক্ষার গবেষণা কার্য করার ব্যাপারেও জাপানে উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্তমানে জাপান সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত। এশিয়ান গেমে এবং অলিম্পিকে এ্যাথলেটিকস ও সাঁতারে জাপানের প্রতিযোগীরা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। টেবল টেনিসের বিশ্বপ্রতিযোগিতায় জাপান অনেকবার বিশ্বজয়ী আখ্যা পেয়েছে।

সমগ্র এশিয়ার মধ্যে জাপানকেই সর্বপ্রথম বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পিত হয় ১৯৬৪ সালে।

অলিম্পিক
প্রাচীন ও আধুনিক

অলিম্পিক মানব সভ্যতার এক পরম গর্বের বস্তু। শারীর শিক্ষার চরম ফলাফলের ক্ষেত্র হলো অলিম্পিকের প্রাঙ্গণ। সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্‌দের পরীক্ষা প্রতি চার বছর অন্তর এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এই

অলিম্পিক (প্রাচীন)

পরীক্ষায় যারা সর্বাধিক সফলতার অধিকারী তার পুরস্কৃত হয় কোনও যুগে অলিভ পাতার মুকুটে, আবার কোনও যুগে বিভিন্ন ধাতুর পদকে—স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ্। কিন্তু সব অংশগ্রহণকারীই সম্মানে সমান। অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে প্রতিভাত হয় এক একটি জাতির কর্মকুশলতা এবং শৌর্য, বীর্য, সুস্থতা ও সবলতার স্বাক্ষর।

সঠিক কোন তারিখে কিংবা কোন সালে অলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠানটি ঘটেছিল তা জানা সম্ভব নয় কারণ সে সবই অন্ধকারে আবৃত। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ থেকে দীর্ঘ বারো শত বৎসর একাদিক্রমে অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারি অতিক্রম করেছে অলিম্পিক। বাধা পেয়েছে প্রবল, কিন্তু প্রবলতর ছিল তার নিজস্ব শক্তি। যার ফলে স্তব্ধ হয়নি এই প্রাণ প্রাচুর্যের গতির ধারা। এই দীর্ঘ বারো শত বৎসর একাদিক্রমে পৃথিবীর কোনও শক্তিই অটুট থাকেনি। কোনও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকেনি কিন্তু অলিম্পিকের আসন অটল থেকেছে।

অলিম্পিকের জন্মকালের সঠিক হদিশ না মিললেও তার উৎসের সন্ধান পেতে অসুবিধা হয় না। যখন এই পৃথিবীর হিংস্র শ্বাপদসমাকীর্ণ পর্বত অরণ্যের যাযাবর অধিবাসীদের প্রতি পদক্ষেপ ছিল বিপদসংকুল তখন

উৎস সন্ধানে

শারীরিক শক্তিই ছিল জীবন ধারণের একমাত্র হাতিয়ার। সমাজে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই প্রচলিত ছিল দৌড়, লাফানো, প্রস্তর নিক্ষেপ। অপর প্রাণীদের সঙ্গে এই সব বিষয়ের অনিবার্য প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়—শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রত্যাশায় এবং সহজাত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণায়।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে আর্যজাতিদের মধ্যে পূজায়, পার্বণে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং নানাবিধ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিভিন্ন প্রকার

শারীর ক্রিয়ার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা সম্পাদিত হয়। এই প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াগুলি একমাত্র অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কখনও কখনও নারীকে তুষ্ট করার প্রয়াসেও শারীর ক্ষমতার পরিচয় দিত পুরুষেরা। প্রাচীন ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের এক চিত্রে দেখা যায় যে, এক ক্রীড়াবিদ একটি বলবান ও উঁচু ষাঁড়ের শিং ধরে পিঠের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে। এ ছবির বয়স চার হাজার বছর।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হস্তিনাপুরে মহাভারতের নানা প্রকার শারীর বিদ্যার প্রতিযোগিতা, যেখানে রাজপুত্রদের অংশ গ্রহণ দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল কয়েক সহস্র দর্শক।

এদিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রীসের গল্প গাথায় এবং চারণদের গানে অনেক রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংবাদ পাওয়া যায়।

এমনি ভাবেই কোনও একদিন কোনও এক আশ্চর্য মানুষের মনে জাগে বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্বপ্ন। অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে এই সব প্রতিযোগিতা সম্পর্কে।

প্রাচীন গ্রীসে কয়েকটি জাতীয় প্রতিযোগিতা ছিল যেগুলির নাম পাইথিয়ান গেমস্, ইস্থামিয়ান গেমস্, নিমিয়ান গেমস্ এবং অলিম্পিক গেমস্। এর মধ্যে অলিম্পিকের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

অলিম্পিকের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি রূপকথা জাতীয় কাহিনী প্রচলিত ছিল।

প্রথম কাহিনীটি হলো ক্রোনাসের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে দেবতা জিউসের জয়লাভকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে অলিম্পিকের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মহান অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়টি হলো দেবতা জিউসের টিটিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ বিজয়ের স্মরণি হিসাবে প্রচলিত। তৃতীয় উপকথাটি বলবান হারকিউলিস সম্পর্কে। কোনও এক অপরাধে দেবতা এ্যাপোলো হারকিউলিসকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। সেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব জিউস দুজনের মাঝখানে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন। অতঃপর স্থির হয় যে, অপরাধী হারকিউলিকে বারোটি দুরূহ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এই বারোটি কাজকে একত্রে বলা হতো—"এ্যাথ্‌লো।" এই শব্দটি থেকেই এসেছে এ্যাথলেটিক এবং এ্যাথলিট শব্দদ্বয়। এই বারোটি কাজের মধ্যে একটি ছিল রাজা এগিয়াসের সুবিশাল পশুশালা একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করা। এই

কাজটি নিতান্ত অসম্ভব জেনেই রাজা ঘোষণা করলেন যে, সফল হতে পারলে তিনি হারকিউলিসকে পশুশালার এক দশমাংশ দান করবেন। কিন্তু হারকিউলিসের অসাধ্য কাজ কিছুই ছিল না। তিনি পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত দুটি নদীর গতি পরিবর্তন করে ঐ পশুশালার মধ্য দিয়ে চালিত করে দিলেন। সুতরাং সহজেই এক দিনের মধ্যে সমগ্র পশুশালা পরিষ্কার হয়ে গেল। সম্ভবত, হারকিউলিস নদী থেকে খাল কেটে সেখানে জলের স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু তখন রাজা এগিয়াস তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হলেন। ক্ষুব্ধ হারকিউলিস এই সময় সৈন্য সংগ্রহ করে এক প্রবল যুদ্ধে এগিয়াসকে বধ করে তাঁর রাজ্য দখল করে নিলেন।

এই যুদ্ধজয়ের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং তৎসহ দেবতা জিউসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য প্রতি বৎসর হারকিউলিস একটি ক্রীড়া উৎসব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।

কথিত আছে, হারকিউলিস অলিম্পিয়ার মন্দির প্রাঙ্গণে একটি অলিভ বৃক্ষ রোপণ করেন। আমরা জানি, অলিম্পিকের বিজয়ীদের অলিভ পাতার মুকুট পরানো হত। সুতরাং, এই কাহিনীর হয়তো সত্যতা আছে।

অলিম্পিকের উৎপত্তির চতুর্থ কাহিনী হলো পেলোপ্‌স ও ওয়েনোমাসের এক রথপ্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে।

পিসা রাজ্যের রাজা ওয়েনোমাসের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে তাকে তো অপরের হাতে সমর্পণ করতেই হবে অথচ ওয়েনোমাস তাঁর অতিরিক্ত কন্যা-প্রীতির ফলে সম্ভবত তাকে বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই জন্য তিনি রাজকন্যার বিবাহের পাণি-প্রার্থীর জন্য এক অদ্ভুত শর্ত আরোপ করলেন। রথচালনা প্রতিযোগিতায় যে ব্যক্তি ওয়েনোমাসকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে তারই হাতে তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন। প্রতিযোগিতা সুরু হবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ওয়েনোমাস তাঁর রথ থেকে এক তীক্ষ্ম বর্শা নিক্ষেপ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করে ফেলতেন। এই ভাবে বারোজন হতভাগ্য পাণিপ্রার্থী প্রাণ হারান। ত্রয়োদশ পাণিপ্রার্থী ছিলেন পেলোপ্‌স। তিনি ওয়েনোমাসের রথের পরিদর্শককে উচ্চ অঙ্কের উৎকোচে বশীভূত করে প্রতিযোগিতার পূর্বে ওয়েনোমাসের রথের চাকার লৌহ কীলক অপসারণ করে তার পরিবর্তে মোমের কীলক বসাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। প্রতিযোগিতা সুরু হবার অল্পক্ষণ পরেই ওয়েনোমাসের রথের চাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং

ওয়েনোমাস রথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে যান। পতনের ফলে অবিলম্বে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর যা হবার তাই হলো। পেলোপ্‌স ওয়েনোমাসের রাজ্য সহ রাজকন্যা লাভ করলেন।

এই প্রতিযোগিতার বিজয়ের ঘটনাটিকে স্মরণীয় রাখার বাসনায় এবং এর পিছনে দেবাদিদেব জিউসের অপ্রত্যক্ষ আশীর্বাদের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের নিমিত্ত পেলোপ্‌স অলিম্পিয়ার বিশাল প্রান্তরে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুরু করেন।

অলিম্পিয়ার বিস্তৃত ভূমিতে খনন করে পাওয়া গেছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, স্টেডিয়াম, বিজয়ী এ্যাথলিটদের মূর্তি ইত্যাদি। ইতিহাসের প্রাচীন ঘটনা তো এই সব বস্তুর মধ্যে দিয়েই কথা বলে। সুতরাং, এই বিশাল প্রান্তরটিতে যে খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে এক উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হতো এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা কোথায় ? এছাড়া বিভিন্ন উপকথা ও বীরগাথায়ও প্রতিযোগিতার কথা গীত হতো।

অলিম্পিয়ার প্রান্তরে দৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত এক স্থানে নির্মিত হয়েছিল অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী দেবাদিদেব জিউসের বিশাল মন্দির। একবার পারসিক সৈন্যদল যখন ধ্বংস লীলায় মত্ত হয়েছিল তখন এই মন্দিরটিও রেহাই পায়নি। অনেক বছর পরে দ্বিতীয়বার নির্মিত হয় এই অত্যাশ্চর্য মন্দির ও তৎসহ দেবতা জিউসের ৬০ ফুট উঁচু বিগ্রহ। বিগ্রহটি ছিল স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত। একটি সুবর্ণ সিংহাসনে একটি স্থাপিত ছিল। ৩৮টি সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর শ্বেত মর্মরের এই অপরূপ মন্দিরটির নির্মাতা ছিলেন বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস।

তৎকালীন যুগে জিউসের মন্দিরটি পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম বস্তু হিসাবে খ্যাত ছিল। বিশ্বের নানা দেশ থেকে লোকেরা এই মন্দির দর্শন করতে আসতো।

দেবতা জিউসের বিগ্রহের সম্মুখে বিজয়ী এ্যাথলিটদের মালা রাখার জন্য একটি বেদী নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের বিভিন্ন দিকে খোদিত ছিল, নানা চিত্র। পেলোপ্‌স ও ওয়েনোমাসের রথ প্রতিযোগিতার দৃশ্য, হারকিউলিসের পৃথিবী কাঁধে তোলার ছবি, ক্রীটের এক উন্নত বৃষ সংহার দৃশ্য, জিউসের এ্যাটলাসকে পরাভূত করার দৃশ্য এবং অনেক শক্তিমান পুরুষদের নানা ভঙ্গিমার দৃশ্য এই মহা মন্দিরে শোভা পেয়েছে।

মন্দিরের বেদীর পূর্ব পার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল 'অলিম্পিয়োনিকো।'

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এ্যাথলিট ও শক্তিমানদের প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত মূর্তি সেখানে স্থাপন করার প্রথা ছিল।

হোমারের মহাকাব্য এবং অন্যান্য কবিগাথা থেকে বোঝা যায় যে, পৌরাণিক যুগের গ্রীকরা দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল। অলিম্পিক ও অন্যান্য সর্ব প্রতিযোগিতাই ছিল দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অঙ্গ।

অলিম্পিয়া প্রান্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—দৌড়, রথচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ডিসকাস ও বর্শা নিক্ষেপ, বর্শা হস্তে নানা প্রকার বাধা অতিক্রম করা ইত্যাদি শারীর ক্রিয়া। সংগীতও প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল।

অলিম্পিক আদিযুগের অনেক ঘটনা হয়তো সম্পূর্ণ ইতিহাসসিদ্ধ নয় এবং আলো অন্ধকারের মধ্যে থেকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ থেকে অলিম্পিকের ইতি কথা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে।

এই সময় সমগ্র গ্রীস কোনও একজন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। অনেকগুলি ছোট ছোট শহরে বিভক্ত গ্রীসের প্রতিটি শহরেই ছিল একজন নায়ক বা নেতা। স্বাধীন এই নায়করা কিন্তু প্রায়ই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। একতার বড়ো অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তা নায়ক হেরাক্‌ল্‌স জীবন পণ করলেন সমগ্র গ্রীসকে একতা বদ্ধ করার জন্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, একতাবদ্ধ গ্রীস শক্তিতে, শৌর্যে, জ্ঞানে, শিল্পে, ক্রীড়ায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ক্রীড়া প্রান্তরকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মিলন তীর্থ বিবেচনা করে আবার অলিম্পিকের খেলা প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হেরাক্‌ল্‌সের এই মহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করবার জন্য অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন।

আবার অলিম্পিক সুরু হলো এলিস শহরে, যার অপর নাম ছিল অলিম্পিয়া। এই সময় দর্শকদের বসবার জন্যে কোনও আসনের ব্যবস্থা হয়নি। উঁচু ঢিবির উপর বসেই দর্শকরা ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা দেখে আন্দোলিত হতো, উচ্চ ধ্বনি করে তাদের উৎসাহিত করতো।

প্রথম দিকে এই অলিম্পিকে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল শুধুমাত্র দৌড় এবং একদিনেই সমাপ্ত হতো অনুষ্ঠান। প্রথম বারের দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন কোরোবাস নামে এক দৌড় বীর। পরবর্তী-

কালে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হলো আরও কয়েকটি বিষয়। তখন পাঁচদিন ব্যাপি চললো অলিম্পিকের প্রতিযোগিতার আসর। এই পাঁচ দিন অনুষ্ঠান চলাকালীন গ্রীসের শহরগুলির পরস্পরের বিপদ বিসম্বাদ সংঘর্ষ সবই স্থগিত থাকতো এক চুক্তি অনুসারে এবং তারপর আরও দুই অথবা তিন মাস চলতো এই শান্তি পর্বের কাল। এই শান্তি পর্বের নাম ছিল সুবর্ণকাল।

নিয়ম ছিল যে, অলিম্পিকের প্রত্যেক প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতার ১১ মাস পূর্বে এলিসে উপস্থিত হতে হবে বিশেষজ্ঞদের কাছে নানারকম পরীক্ষা দিয়ে যোগদান করার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য। মনোনীত হবার পরের ব্যবস্থা ছিল জিমনাস্টিক প্রশিক্ষকদের কাছে ১০ মাস প্রয়োজনীয় ট্রেনিং। প্রসঙ্গত, ঐ সময় সর্ব-রকম ক্রীড়ার এক কথায় নাম ছিল জিমনাস্টিক। দৌড়, লাফানো, ডিস-কাস ও বর্শা নিক্ষেপ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ সবই ছিল এই ট্রেনিং-এর অন্ত-র্ভুক্ত বিষয়। প্রতিযোগীদের জন্য ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি ছিল না।

ক্রীড়াবিদদের প্রস্তুতি

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ক্রোনোস পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত হয়েছিল এক মনোরম স্টেডিয়াম। দর্শকদের জন্য তখন পাহাড় কেটে বসার জায়গা তৈরি হলো। সেখানে ৬০,০০০ দর্শক একত্রে বসে খেলা দেখার সুযোগ পেতো। এই আসনগুলির উপর শ্বেত পাথর বসানো ছিল।

স্টেডিয়াম

স্টেডিয়ামের মাঝখানে মূল ক্রীড়া ক্ষেত্রটির আয়তন ছিল মোটামুটি ৭০০ × ১০৫ ফুট। অবাক হতে হয়, খনন কার্যের দ্বারা উদ্ধার করা পাথরের "স্টার্টিং-ব্লক" দেখে।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন ক্রীড়া ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রতিযোগী, বিচারক, দৌড় সুরু করানোর কর্মচারি ও ঘোষক ব্যতীত অপর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। স্টেডিয়ামের প্রান্তরের বাইরে কুস্তি ও মল্লযুদ্ধের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

অনুশীলন কালে প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য বরাদ্দ ছিল ; যথা, পনীর, আঙ্গুরের রস, রুটি প্রভৃতি। দুপুর বেলায় কোনও রকম খাবার দেওয়া হতো না, তবে রাত্রে রীতিমত ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ট্রেনিং-ক্যাম্পে দেবতাদের উদ্দেশে বিভিন্ন স্তোত্র, নানারকম জ্ঞান গর্ভ আলোচনা, বীরদের কীর্তিকথা পাঠ, সমবেত সঙ্গীত

অনুশীলনে খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়

ইত্যাদি বিষয় প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবেই ছিল।

পাঁচদিন ব্যাপি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রতিযোগী, বিচারক ও সংগঠকরা সকলে মিলে দেবতা জিউসের মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। অতঃপর চলতো অগণিত পশু বলি। সেখানে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি হতো। প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত জ্বলতো সেই অগ্নিকুণ্ড।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় বিষয় ছিল প্রাথমিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই-পর্ব সম্পাদন। এর পরবর্তী ব্যাপারগুলি শ্রী শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত কর্তৃক রচিত "অলিম্পিকের ইতিকথা" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা হলো। "...অকৃতকার্য প্রতিযোগীদের বাদ দিয়া চূড়ান্ত প্রতিযোগী তালিকা রচিত হইত। সকল প্রতিযোগীগণ "অমরতোরণ" নামে খ্যাত একটি প্রবেশ পথের ভিতর দিয়া বেদীতে উপস্থিত হইত ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। "অমরতোরণ" অতিক্রম করিবার অধিকার পাইলে অমরত্ব লাভ করা যায় বলিয়া গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল। জিউসদেবের অসীম করুণায় "অমরতোরণ" অতিক্রমণের সুযোগ পাইয়া তাহারা জিউসদেবের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত ও অকুণ্ঠচিত্তে শপথ গ্রহণ করিত যে, প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য তাহারা গত দশ মাস নিতান্ত আন্তরিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করিয়াছে এবং জয়লাভের জন্য কোনও অসৎ উপায় গ্রহণ করিবে না। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রত্যেক হেলেনিস্ তাহার ভাই, প্রত্যেক প্রতিযোগীর সহিতই তাহারা ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করিবে। গ্রীস দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহার জন্ম হইয়াছে এবং জীবনে কোনও দিন দেশ অথবা জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করে নাই। দেবতাদের বিরুদ্ধেও তাহারা কোনও অসম্মানজনক কাজ করে নাই। প্রতিজ্ঞার শেষাংশ ছিল—"আমি যেন সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট হই এবং আমার যদি যোগ্যতা থাকে তবেই যেন আমি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করি।"

প্রথম যুগে অলিম্পিকের কোনও প্রতিযোগিতায় নারীদের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। এমন কি, দর্শক হিসাবেও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই বাধা তুলে নেওয়া হয়।

নারী নিষিদ্ধ

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দৌড়। এক ড্রেক বা ২০০ শত গজের দৌড় সোজাভাবেই হতো। সুতরাং ট্র্যাক পাক দেবার প্রয়োজন ছিল না। দৌড় সুরু করার জন্য একটি

নির্দিষ্ট লাইন টানা ছিল এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ৪ ফুট অন্তর একটি করে ছোট প্রস্তর স্তম্ভ রাখা থাকতো। সেগুলির সোজা-সুজি বিপরীত দিকে এক ষ্ট্রেক দূরত্বে অনুরূপ স্তম্ভ স্থাপিত ছিল। প্রতিযোগীদের সোজাসুজি প্রতিযোগীরা সংকেতদানের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় সুরু করতেন। এই সংকেত দেওয়া হতো কখনও কোনও শিঙাধ্বনির সাহায্যে, কখনও বা প্রতিযোগীদের পায়ের সম্মুখে রাখা দড়ি সরিয়ে নিয়ে।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়: দৌড়

এক ষ্ট্রেকের দৌড়ে যেমন কোরিবাস ও হার্মোজেনেসের নাম সর্বজন শ্রুত ছিল তেমনি দূরপাল্লার দৌড়ে আর্গিয়াসের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমবার অলিম্পিকের দৌড়ে বিজয়ী হয়ে নিজের প্রণয়িনীকে সেই গৌরবের কথা জানাবার জন্য অলিম্পিয়া থেকে ৩৪ মাইল দূরত্ব দৌড়ে অতিক্রম করেছিলেন।

ল্যাডাস নামে আর একজন দৌড়বীর ছিলেন যিনি উপর্যুপরি কয়েকটি অলিম্পিকে দীর্ঘদৌড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং একবার ট্র্যাকের উপরেই অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উচ্চ লাফ নয়, একমাত্র দীর্ঘ লাফই ছিল অলিম্পিকের প্রতিযোগিতার বিষয়। দুই হাতে ডাম্বেল দোলাতে দোলাতে বিশেষভাবে নির্মিত বেদী থেকে লাফ দিতেন প্রতিযোগীরা। কোনও কোনও সময় পিছন দিক থেকে সামান্য দৌড়েও আসতেন লাফের দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য।

লাফ দেওয়া

সাধারণত পাথর দ্বারাই নির্মিত হতো ডিসকাসগুলি। তবে কোনও মজবুত ধাতুর তৈরি ডিসকাসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ডিসকাসের ব্যাস ছিল ১১ ইঞ্চি এবং ওজন ছিল প্রায় ১৫ পাউন্ড। আকৃতিতে এখনকারই মতন মাঝখানে পুরু এবং কিনারায় পাতলা।

ডিসকাস নিক্ষেপ

বর্শা বা জ্যাভেলিনগুলি ছিল লম্বায় ৬ ফুট এবং পুরু অর্ধ ইঞ্চির মতো। মাঝখানের অংশটি ঠিক ভাবে ধরার জন্য প্রায় দেড় ফুট লম্বা সরু চামড়া দিয়ে মোড়া থাকতো।

বর্শা নিক্ষেপ

অলিম্পিকের কুস্তি ছিল কেবলমাত্র দণ্ডায়মান কুস্তি। তিনবারের মধ্যে দুইবার ভূমিতে শুইয়ে দিতে পারলেই জিৎ। সর্বশরীরে তৈল মর্দন করে কুস্তিগীর লড়াইয়ে নামতেন তবে দেহে মাটি বা বালি মেখে নেওয়ার অনুমতি ছিল।

কুস্তি

প্রাচীন অলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরের নাম মাইলো। তাঁর অসামান্য দৈহিকশক্তির জন্য তাঁকে হারকিউলিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মাইলো সাতবার অলিম্পিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

মুষ্টিযুদ্ধ অলিম্পিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হিসাবে গণ্য ছিল। প্রথম দিকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে কোনও আবরণ ছিল না। উন্মুক্ত হাতের মুষ্টি যুদ্ধ অবশ্য খুব বেশি দিন প্রচলিত থাকলো না। চামড়ার বন্ধনীতে মুষ্টি আবৃত করা হলো। এই জাতীয় মুষ্টি যুদ্ধে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হাত তুলে পরাজয়ের স্বীকৃতি সংকেত জানালে তবেই সমাপ্ত হতো প্রতিযোগিতা।

মুষ্টিযুদ্ধ

পৃথিবীর মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে হেরাক্লেসের মন্দিরের পুরোহিত থেয়াগেনেসকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টি যোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত করা হয়। তিনি সর্বসমেত ১৪২৫ বার বিভিন্ন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধে নামেন এবং প্রতিবারই জয়ী হন।

অলিম্পিকে যখন যুক্ত হলো রথ চালনা প্রতিযোগিতা তখন তার জন্য স্থান নির্বাচিত হয় স্টেডিয়ামের নিকটেই অ্যালফিউস নদীর তীরে শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত হিপ্পোড্রোম ক্রীড়াক্ষেত্র। এই ক্রীড়াক্ষেত্রের আয়তন ছিল ৮০০ × ৪০৫ গজ। সেখানে বসার ব্যবস্থা ছিল শুধু মাত্র বিচারক ও ব্যবস্থাপকদের।

রথচালনা

প্রতিযোগিতার রথগুলি ছিল দুই চক্রযুক্ত এবং চার ঘোড়ায় টানা। এক উচ্চ শৃঙ্গ ধ্বনিতে সুরু হতো এই রথ চালনা প্রতিযোগিতা। ২৩ বার পাক দিয়ে সমাপ্ত হতো জয় পরাজয় নির্ধারণ। ক্রীড়াক্ষেত্রের দুই প্রান্ত দুইটি মাটির ঢিবির পাশ দিয়ে রথ চালনা করে মোড় ঘোরার সময় সারথি দের অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োজন হতো। মোড় ঘোরার সময় মাঝে মাঝে রথের অশ্বগুলি হত চকিত হয়ে গিয়ে বিপদ বাধিয়ে বসতো। রথের সঙ্গে রথের সংঘর্ষ ছিল প্রায় নিত্য ঘটনা। একবার দেখা গেল চল্লিশটি প্রতিযোগী রথের মধ্যে মাত্র একটি রথ শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগী সম্পূর্ণ করতে পেরেছে।

অলিম্পিকের সবগুলি প্রতিযোগিতার মধ্যে রোমহর্ষকতার দিক দিয়ে বিচার করলে এই রথচালনার স্থান ছিল সকলের উপরে।

ষষ্ঠ অলিম্পিক পর্যন্ত বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল হৃষ্টপুষ্ট পশু, শস্য কিংবা কোনও ক্রীড়া ভঙ্গী খোদিত ধাতু নির্মিত পাত্র। কোনও ষষ্ঠ অলিম্পিক থেকে বিজয়ীদের মাথায় অলিভ

বিজয়ীর পুরস্কার

বৃক্ষের পাতা দিয়ে তৈরি মুকুট পরিয়ে দেওয়া হতো।

ক্রীড়াবিদদের জন্মভূমিতে তাদের বিজয় সংবাদ খুব দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে তাদের প্রাপ্য ছিল আন্তরিক নাগরিক সম্বর্ধনা।

অলিম্পিকের পুরস্কার বিতরণ উৎসবটিও ছিল খুব মনোরম। বিজয়ীদের নাম, পিতৃপরিচয়, শহরের নাম উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হতো। প্রধান বিচারক নিজের হাতে বিজয়ীকে স্বর্ণমণ্ডিত শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে রাখা অলিভ পাতার মুকুট পরিয়ে দিতেন।

গ্রীস দেশের ক্যালেণ্ডারে বিজয়ীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হতো। এছাড়া, দেশের কবিরা তাঁদের জন্য প্রশস্তি রচনা করতেন সুমধুর কাব্য গাথায়, ভাস্কররা নির্মাণ করতেন বিজয়ীদের ক্রীড়াভঙ্গীর নানা মূর্তি। যদি বিজয়ীরা হতো এথেন্সের বাসিন্দা, তবে তাদের সারা জীবনের খাদ্য-সংস্থানের বন্দোবস্ত করতো রাজ্য সরকার। এছাড়া, বিজয়ীরা নাগরিকদের নিকট থেকে প্রচুর উপঢৌকন লাভ করতেন।

অলিম্পিকের বিজয়ীরা সর্বত্র সম্মানিত হতেন।

প্রাচীন অলিম্পিকে কোন্ প্রতিযোগিতা কোন্ বছরে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হলো তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ—

সন		অলিম্পিক	বিষয়
খ্রীঃ পূঃ	৭৭৬	প্রথম	এক স্টেড অর্থাৎ প্রায় ২০০ গজ দৌড়।
,,	৭২৪	চতুর্দশ	দুই স্টেড অর্থাৎ প্রায় ৪০০ গজ দৌড়।
,,	৭২০	পঞ্চদশ	প্রায় তিন মাইল দৌড়।
,,	৭০৮	অষ্টাদশ	পেন্টাথলন।
,,	৬৮৮	ত্রয়োবিংশ	মুষ্টিযুদ্ধ।
,,	৬৮০	পঞ্চবিংশ	চার অশ্বযুক্ত রথচালনা।
,,	৬৪৮	৩৩ তম	প্যানক্রেশিয়াম ও অশ্বচালনা।
,,	৬৩২	৩৭ তম	বালকদের দৌড় ও কুস্তি।
,,	৬১৬	৪১ তম	বালকদের মুষ্টিযুদ্ধ।
,,	৫২০	৬৫ তম	অস্ত্রসহ দৌড়।

অলিম্পিকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অবসান হয় একাদিক্রমে বারো শত বছর চলার পরে। রোমের অধীনে গ্রীস থাকা অবস্থায় অলিম্পিক তার পুরাতন মহান ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়। গ্রীসের রাজা ও অধিবাসীরাও

ক্রীড়া জগতের উচ্চ আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। শুধু তাই নয়,
অস্তান অনেক প্রকার অশান্তি ও অপ্রীতিকর ঘটনার
প্রাদুর্ভাব হয় পবিত্র ক্রীড়া প্রাঙ্গণের বুকে। পেশাদার ক্রীড়াবিদদের
সঙ্গেই প্রবিষ্ট হলো বিভিন্ন দুর্নীতির বিষ। অবশেষে, রোমের সম্রাট
থিয়োডোসিয়াস ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করে বন্ধ করে দিলেন
অলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা।

১২০৮ বছরে ২৯৩টি অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে পুনরায় যিনি অলিম্পিকের বাতি
জ্বালিয়ে জগৎকে বিস্মিত করেন তাঁর নাম ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিন।
তবে বাতি জ্বালাবার পূর্বে তো প্রয়োজন হয় সল্‌তে পাকানো। সেই
অলিম্পিক : আধুনিক সল্‌তে যাঁরা পাকিয়ে ছিলেন তাঁদের নাম হলো
জার্মান জিমনাস্টিক এর প্রবর্তক গুট্‌স মুথ্‌স, আরনস্ট্‌ কার্টিয়াস, গ্রীক
ক্রীড়ানুরাগী মেজর জাপ্পাস এবং জার্মান ক্রীড়ানুরাগী জুলেস এনিংগ্‌।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি সরকারের উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন কার্য
চালিয়ে প্রাচীন অলিম্পিকের কিছু নিদর্শন ও ভগ্নাবশেষ উদ্ধারের চেষ্টা
করেছিলেন। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই গুট্‌স মুথ্‌স অলিম্পিক প্রতি-
যোগিতা পুনরায় প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তাঁর এই প্রস্তাব
কার্যকর না হলেও তার ধ্বনি বিলীন হয়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়
পর্বে আরনস্ট কার্টিয়াস এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এক আলোচনা সভার
আয়োজন করেন। সভার তারিখ ছিল ১০ই জানুয়ারি, ১৮৫২। এই
আলোচনা সভার কথাবার্তায় বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন গ্রীক
মেজর জাপ্পাস। মৃত্যুকালে তিনি অলিম্পিককে পুনরায় বাস্তবায়িত
করার ইচ্ছায় প্রচুর ধন সম্পত্তি উইল করে যান। এই অর্থের সাহায্যে
গ্রীস সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার চেষ্টা করেছিলেন জাপ্পাসের
স্বপ্নকে রূপদান করতে। এথেন্সে এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজনও
হয়েছিল, কিন্তু সেটি সফল হয়েছিল একথা কখনই বলা যায় না।

এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জুলেস এনিংগের প্রচেষ্টায় দ্বিতীয়বার
অলিম্পিক প্রবর্তনের প্রয়াস হয়, কিন্তু সংগঠনের অনভিজ্ঞতাই অন্তরায়
হয়ে দেখা দেয়। ২০০ মিটার দৌড়, হপ্‌ স্টেপ লাফ, ডিসকাস নিক্ষেপ,
কুস্তি ও দড়ি টানাটানি অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল।

১৮৫২ ও ১৮৭০ সালের এই দুইবারের প্রচেষ্টায় সংগঠকদের
অলিম্পিকে প্রবর্তনের আন্তরিক ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে যতটা

সাধ ছিল সাধ্য ততটা না থাকায় "সকলি অনলে পুড়িয়া গেল।"

এরপরে আবির্ভাব হয় ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিনের, যার কাছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যৎ কালের সর্বদেশের সব ক্রীড়াবিদদের সমুদ্রসমান ঋণ। তাঁরই অদৃশ্য হাত ধরে তারা তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান ও বলীয়ান হবার সাধনায় এগিয়ে চলেছে এবং চলবেও যুগ যুগ ধরে।

কুবার্তিন

সর্বজনীন মিলন ক্ষেত্র স্থাপনের প্রেরণায় এবং দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের আশায় ও সর্বোপরি বিশ্বের ক্রীড়াবিদদের দক্ষতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর চিহ্নিত করার সুযোগ দান করতে কুবার্তিন এগিয়ে এলেন অলিম্পিককে পুনরায় জন্ম দিতে, বিকশিত হতে, পরিণত হতে। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি এক অভিজাত পরিবারে কুবার্তিন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনার প্রতি তাঁর সবিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও চারুশিল্প কলায় তাঁর গভীর পড়াশুনা ছিল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন আধুনিক অলিম্পিক প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে ১৪টি দেশ থেকে ৭৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। আট দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে স্থির হয় যে, অলিম্পিকের পুনর্জন্ম হবে। কুবার্তিনের ইচ্ছা ছিল যে, আগামী শতাব্দীর প্রথম বর্ষ অর্থাৎ ১৯০০ সাল থেকে ফ্রান্সের ভূমিতে আরম্ভ করা হোক এই নব যুগের অলিম্পিক, কিন্তু অন্যান্য প্রতিনিধিরা বললেন, আর বিলম্ব নয় এবং এর জন্য গ্রীসকেই দিতে হবে এই অলিম্পিকেরও প্রথম আসর বসানোর গৌরব। তবে কুবার্তিনের প্রস্তাবানুসারে স্থির হয় যে, অলিম্পিকের আসর গ্রীসে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক স্থানান্তরিত হবে দেশ থেকে দেশান্তরে।

অলিম্পিকের পুনরাগমনের সংবাদ সম্পর্কে উচ্চারিত হলো কুবার্তিনের ঐতিহাসিক ঘোষণা ঃ—আজ অপরাহ্নে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে বিশ্বের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হলো যে, সেই প্রাচীন অলিম্পিকের আবার আবির্ভাব হতে চলেছে। সকলে যেন তাকে অভ্যর্থনা জানায়। অলিম্পিকের মশাল

আবার প্রজ্জ্বলিত হবে পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। অলিম্পিকের যে মহান ঐতিহ্য ধ্বংসস্তুপের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছিল তাকে আবার ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পড়েছে এ যুগের মানুষের।

আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধনের দিন স্থির হলো ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। সমগ্র এথেন্স শহর উদ্দীপনা ও গৌরববোধে আপ্লুত প্রথম আধুনিক অলিম্পিক হয়েছিল। চতুর্দিকে বিভিন্ন দেশের রঞ্জিত পতাকাশোভিত স্টেডিয়ামে রাজা জর্জ আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন।

এথেন্সের উপকন্ঠে হেরোদিস স্টেডিয়ামের ভগ্নাবশেষকে সম্পূর্ণ সংস্কার করে সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিকের অনুষ্ঠান। দশদিনব্যাপী এই অলিম্পিকের আসরে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কয়দিন এথেন্সের জনসাধারণের কারো মুখে অলিম্পিক ছাড়া কোনও কথা ছিল না। যারা স্টেডিয়ামের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পায়নি তারা রোজ সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ণনা শুনে তৃপ্ত হয়েছে।

১৫ই এপ্রিল দশ দিনের অনুষ্ঠানের সমাপনান্তে গ্রীসের রাজা জর্জ পুরস্কার বিতরণের কাজ সম্পূর্ণ করে এবং প্রতিযোগীদের সঙ্গে করমর্দন করে প্রথম অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে যোগদান করেছিল ফ্রান্স, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া, গ্রেটবৃটেন, জার্মানি, আমেরিকা, সুইডেন, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যাণ্ড ও গ্রীসের ২৮৫ জন প্রতিযোগী।

এই অলিম্পিকে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল এ্যাথলেটিকস, জিমনাস্টিক, ভারোত্তলন, সুটিং, সাঁতার, কুস্তি, তরবারি চালনা ও টেনিস খেলা।

বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয় পদক ও অলিভ পাতার মুকুট। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল জয়-পত্র।

এই এথেন্স-অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ভাবে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন আমেরিকার প্রতিযোগী রবার্ট গ্যারেট। তিনি সট-পাট ও ডিসকাস নিক্ষেপে প্রথম স্থান এবং লং জ্যাম্প ও হাইজাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া, আমেরিকার দৌড়বীর টমাস বার্ক, ১০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। ৮০০ ও ১৪০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী হন অষ্ট্রেলিয়ার ই, এইচ ফ্লাক্। লং জাম্প ও হাইজাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন আমেরিকার ই, ক্লার্ক।

পোল ভল্টে প্রথম হন আমেরিকার উইলিয়ম হোয়েট। ১১০ মিটার

হার্ডল্ রেসে আমেরিকার টমাস কার্টিস বিজয়ী হন। হপ-স্টেপ জাম্পে বিজয়ী হন আমেরিকার কনোলী।

এথেন্স অলিম্পিকের সম্ভবত সর্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল প্রায় ২৫ মাইলের ম্যারাথন দৌড়। খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথন মাঠে পারসিকদের বিরুদ্ধে গ্রীসের যুদ্ধ বিজয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসাধারণ

ম্যারাথন

দৌড় বীর ফিডিপাইডিসের মহান আত্মোৎসর্গকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই হয়তো প্রথম অলিম্পিকে এই দৌড়টি ক্রীড়াসূচীতে স্থান লাভ করে।

পর্বত আর সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ম্যারাথন প্রান্তরে পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে এথেনীয়রা ফিডিপাইডিসকে পাঠালো স্পার্টায় তাদের সাহায্যলাভের আশায়। একশত মাইলের বেশি পথ ফিডিপাইডিস

ফিডিপাইডিস

দৌড়ে পৌঁছে গেল। দেশের বিপদে দেশকে ভালোবেসে সে ভুলে গিয়েছিল পথের সব কষ্ট, ক্লান্তি, শ্রান্তি। কিন্তু এথেন্সের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকায় স্পার্টা ইচ্ছা করেই যুদ্ধের দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে উপস্থিত হয়েছিল। যাই হোক, ফিডিপাইডিস্ স্পার্টা থেকে ফিরে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এথেনীয় সেনাবাহিনী পর্বতের উপর থেকে পারসিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ম্যারাথন প্রান্তরে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এথেনীয় সেনাবাহিনীর পরাক্রমে এথেন্স বিজয়ী হয়। ম্যারাথন থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত এথেন্সের জনগণ এই যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তখন রণক্লান্ত মহাদৌড়বীর ফিডিপাইডিস যুদ্ধ জয়ের সংবাদ এথেন্সে পৌঁছে দিয়ে সেখানকার লোকের মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়ে আবার দিলেন লম্বা দৌড়। মাঠ, ঘাট, অরণ্যপথ অতিক্রম করে ছুটেছিল সে—যে কোনও বাধাই তার কাছে হয়ে গেল তুচ্ছ।

অবশেষে ফিডিপাইডিস পৌঁছে গেল এথেন্সের সীমানার মধ্যে। দূর থেকে দেখতে পেলো এথেন্সের সিংহ দরজার সামনে এক বিশাল জনতার কৌতূহল-আক্রান্ত পাথরের নিস্তব্ধতা। অবিরল ঘামে নির্গত সম্পূর্ণ সিক্ত দেহ আর রক্তলাল মুখমণ্ডল নিয়ে ফিডিপাইডিস তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছিল সীমাহীন ক্লান্তি আর বিজয় সংবাদ বহনের দুরন্ত আবেগে। মুহূর্ত মধ্যে ফিডিপাইডিসের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো স্পষ্ট উচ্চারণ—আমরা জিতেছি—

"আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।" মন্ত্রের মতো দ্যুতিময় এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে উত্তাল হয়ে উঠেছিল এথেন্সের সব মানুষের বুকের রক্তের ঢেউ। কিন্তু পরম বেদনার কথা, এটাই ছিল পৃথিবীর বাতাসে ফিডিপাইডিসের শেষ উচ্চারণ। শ্রান্তিতে নিঃশেষিত তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো জন্মভূমি এথেন্সের ঘাসের উপর।

২৩৮৬ বছর পূর্বেকার সেই গ্রীক বীরের মহৎ মৃত্যুকে অমরতা দেবার জন্য আধুনিক অলিম্পিকের সর্বপ্রথম আসরে যে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রথম স্থান লাভ করে এক আশ্চর্য ঘটনার নায়ক অপর এক গ্রীক দৌড়বীর। তার নাম স্পিরিডন লোয়েস।

স্পিরিডন

স্পিরিডন ছিল এক ভাববিলাসী পশুপালক। পাহাড়ে প্রান্তরে মেষ চরানো এক যুবক। গ্রীস দেশের সুদূর অতীত কীর্তিকাহিনী তার মনে এক মমতা মাখানো রহস্যময়তার সৃষ্টি করতো। অলিম্পিয়ার সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি আবিষ্কৃত হবার পরে সেগুলির পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই যাতায়াত কালে সে কল্পনায় নিজেকে সেই সব অতীত দৌড়বীর মনে করে এক অপার আনন্দ লাভ করতে খুব ভালোবাসতো।

স্পিরিডনের কানে যখন এথেন্সে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের আসর বসার খবর পোঁছালো সে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা তার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করলো। ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণের জন্য সে নিজের নাম পাঠিয়ে দিল এথেন্সে।

ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিন তার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, সে প্রতিযোগিতার তিন দিন আগে থেকে প্রত্যেক দিন নিজের দৌড়ের সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রত্যাশায় উপাসনায় বসতো এবং প্রতিযোগিতার পূর্ব দিন থেকে সম্পূর্ণ উপবাসী ছিল। উপাসনা আর উপবাস তার মনে এনে দিল এক দুর্জয় আত্মপ্রত্যয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৫ জন শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর অরণ্য প্রান্তর ও গিরিপথের মধ্যে দিয়ে সুরু করে দূর পাল্লার এই দৌড়। এদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিখ্যাত দৌড়বীরের নাম হলো ফ্রান্সের লেরমুজিও। দৌড়ের প্রায় প্রথম থেকেই সে সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় এবং অধিকাংশ সময় দেখা যায় সে এগিয়েই আছে।

এই দৌড় চলাকালীন কয়েকজন অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক মাঝে মাঝে প্রতিযোগীদের মধ্যে কে সকলের চেয়ে এগিয়ে আছে এবং তার নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী কে, এই খবর স্টেডিয়ামের অপেক্ষারত দর্শকদের কাছে পেঁছে দিচ্ছিল। অনেক ক্ষণ পরে দেখা গেল স্পিরিডন অন্য সকলকে পিছনে ফেলে দিয়ে লেরমুজিওকে অতিক্রম করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ৪০ কিলোমিটারের ৩৩ কিলোমিটার দৌড়ের পর স্পিরিডন সবাইকে বিস্মিত করে লেরমুজিওকে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছবার জন্য বড়ো বড়ো পদক্ষেপে এগিয়ে চললো। স্পিরিডন সকলের প্রথমে এগিয়ে গেছে —দাবানলের মতো এই খবর চতুর্দিকে এবং সমস্ত স্টেডিয়ামের দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। সকলের হৃৎপিণ্ডের তালে তালে তখন একটাই ধ্বনি বাজতে লাগলো—স্পিরিডন, স্পিরিডন, স্পিরিডন। তারপর যখন স্পিরিডন, অরণ্যপর্বতচারী মেষপালক স্পিরিডন, উপবাসী স্পিরিডন, প্রাচীন অলিম্পিকের ঐতিহ্য রোমাঞ্চিত স্পিরিডন, গ্রীসের গৌরব স্পিরিডন সকলের আগে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলো তখন গ্রীক রাজ পরিবারের দুই গণ্যমান্য পুরুষ স্টেডিয়ামের আসন থেকে দৌড়ে লাফিয়ে গিয়ে স্পিরিডনের দুই পাশে দৌড়ে দৌড়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেঁছোলেন তাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তারপর যখন গ্রীসের যুবরাজ ও তাঁর ভাই স্পিরিডনকে কাঁধে বহন করে পুরস্কার গ্রহণের জন্য নিয়ে যান তখন সমগ্র স্টেডিয়ামের দর্শকরা আনন্দে, আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। তখন উপস্থিত এক হোটেলের মালিক ঘোষণা করলেন, তিনি স্পিরিডনকে সারা জীবন খাওয়াবার ভার গ্রহণ করলেন। এক পোষাক পরিচ্ছদের বিপণীর কর্তা জানালেন, তিনি স্পিরিডনকে সারা জীবন পোষাক পরাবার ভার নিলেন এবং একজন নরসুন্দর ঘোষণা করলেন, তিনি সারা জীবন স্পিরিডনের চুল ও দাড়ি কাটার ভার গ্রহণ করলেন।

এমনি ভাবে গ্রীক সমাজে সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ে স্পিরিডন আসন পাতলো।

প্রথম অলিম্পিক এথেন্সে অনুষ্ঠিত হবার পরে ১৯০০ সালে দ্বিতীয় অলিম্পিক হয় কুবার্তিনের দেশ প্যারিসে। এই দ্বিতীয় অলিম্পিক থেকে সুরু করে ১৯৭৬ পর্যন্ত অলিম্পিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে দেওয়া হলো সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৭ সংখ্যা থেকে ঃ—

"পারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সঙ্গে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হওয়ায় খেলাধুলোর আকর্ষণ অনেক কমে যায়, যদিও যোগ দেন ২২ টি দেশের ১৩৩০ জন প্রতিনিধি। মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১১।

ফ্রান্স জয়ী হয় ২৮ টি ইভেন্টে, আমেরিকা ২২ টিতে, ১৪ টিতে গ্রেট বৃটেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ১৭ টি। তার মধ্যে গলফ্ ক্রোকেট, বোলিং এবং পোলো খেলাও ছিল। আমেরিকার আলভিন ক্রায়েঞ্জলিন ৬০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডল্স, ২০০ মিটার হার্ডল্স ও লং জাম্প—মোট চারটি ইভেণ্টে জিতে এই অলিম্পিকের নায়ক হয়ে ওঠেন। আমেরিকার আর এক অ্যাথলীট রে ইউরি জেতেন স্ট্যাণ্ডিং হাই জাম্প, স্ট্যাণ্ডিং লং জাম্প ও স্ট্যাণ্ডিং হপ স্টেপ ও জাম্প। এই তিনটি ইভেণ্টে পরবর্তী তিনটি অলিম্পিকে ইউরি পান আরও ৭টি পদক—মোট ১০টি। কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিযোগী নর্মান প্রিচার্ড, যিনি আই, এফ, এ-র সম্পাদক ছিলেন এবং কলকাতার ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন। তিনি বেসরকারীভাবে এই অলিম্পিকে যোগ দিয়ে ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান পান। মেয়েদের মধ্যে প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন ব্রিটেনের শার্লট কুপার টেনিসে সিঙ্গলস্ জিতে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিকে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হতো। প্রথম যিনি হতেন তিনি পেতেন রুপোর পদক, দ্বিতীয় ব্রোঞ্জের পদক। সোনার পদক দেওয়া সুরু পরবর্তী অলিম্পিক থেকে।

১৯০০ সাল-পারী

বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তৃতীয় অলিম্পিকও সারা বিশ্বে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। ইউরোপের ৭টি এবং অন্যান্য ৫টি মোট ১২টি দেশের ৬২৫ জন অংশ নেন। এর মধ্যে মেয়ে প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র ৮ জন। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৪ রকমের। আমেরিকার জেমস্ লাইটবডি তিনটি সোনার পদক পান স্টিপল চেজ, ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে। আমেরিকার প্রতিযোগীরা সোনা পায় ৭৮টি। আধুনিক অলিম্পিকে প্রথম দুর্নীতির পরিচয় মেলে সেণ্ট লুইতে। আমেরিকার লর্জ ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হন। কিন্তু পরে জানা যায়, দীর্ঘ পথের ১০ মাইল তিনি এসেছেন একটি ট্রাকে চড়ে। ফলে প্রতিযোগিতা থেকে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯০৪-সেন্ট লুই

আধুনিক কালের অলিম্পিকের দশম বার্ষিক পালনের জন্যই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন নিয়ে এথেন্সে আবার অলিম্পিকের আসর বসে। কিন্তু যেহেতু এটি চতুর্বার্ষিক অনুষ্ঠান নয় সেহেতু সরকারি অলিম্পিকের মর্যাদা এখানে ছিল না। ১১ রকমের খেলাধুলায় ২০টি দেশের ৮৮৪ জন (মেয়ে ৭ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। ফরাসীর প্রতিযোগীরা জিতে-

১৯০৬-এথেন্স

ছিলেন ১৪টি ইভেণ্টে, আমেরিকার প্রতিযোগীরা ১২টিতে।

সুব্যবস্থা, সাংগঠনিক সুষ্ঠুতা এবং সুপ্রচারের ফলে এই চতুর্থ অলিম্পিকেই সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগীরা সুরু থেকে অলিম্পিক শেষ হতে সময় লাগে ছয় মাস। অলিম্পিকের মূল কেন্দ্র ছিল এক লক্ষ দর্শকের আসন বিশিষ্ট হোয়াইট সিটি স্টেডিয়াম। ২২টি দেশের ২০৩৫ জন (মেয়ে ৩৬ জন) প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ২১ রকমের খেলাধূলায়। এই অলিম্পিকেই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় হকি ও ফুটবল। এই অলিম্পিকেই প্রথম শোনা যায়ঃ "অলিম্পিকে জয়লাভ বড়ো কথা নয়, অংশগ্রহণই বড়ো কথা। পদক জয় মূল লক্ষ্য নয়—সততার সঙ্গে সংগ্রাম করাই লক্ষ্য।" বাণীটি পাঠিয়েছিলেন পেনসিল ভেনিয়ার এক বিশপ।

১৯০৮ : লণ্ডন

নিজেদের দেশে প্রথম আয়োজিত এই অলিম্পিক গ্রেট বৃটেন পায় ৫৬টি স্বর্ণ পদক, আমেরিকা পায় ২২টি। চতুর্থ অলিম্পিকের দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি—৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে আমেরিকার তিনজন প্রতিযোগী কার্পেণ্টার, রবীন্‌স এবং টেলর অন্যায় ভাবে দৌড়ানোর ফলে বাতিল হয়ে যাওয়ায় আবার দৌড়ের ব্যবস্থা। কিন্তু তখন অন্য কোনও প্রতিযোগীর অভাবে গ্রেট বৃটেনের হলওয়েল একাই ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক পান। দ্বিতীয় ঘটনাটি—ম্যারাথন দৌড়ের রাজকীয় মর্যাদার জন্য দৌড় সুরু হয় উইণ্ডসর রাজ-প্রাসাদের সামনে থেকে। দৌড়টি দেখেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। কোনো স্পোর্টসে তখন পর্যন্ত রেকর্ড সমাবেশ। ইতালীর খর্বকায় প্রতিযোগী ডোরাণ্ডো পিয়েত্রি সর্বপ্রথম স্টেডিয়ামে পেঁাছে এবং প্রথম হয়েও স্বর্ণ পদক না পেয়ে অমর হয়ে আছেন। কারণ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়ে শ্রান্ত অবসন্ন পিয়েত্রি ফিতে ছিঁড়বার আগে মাঠে দু'বার লুটিয়ে পড়েন। প্রথমবার নিজে উঠে আবার দৌড়তে থাকেন। দ্বিতীয়বার পড়ে গেলে সহানুভূতি বশে স্পোর্টসের কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। সেটা বেআইনী কাজ। তাই পিয়েত্রি বাতিল হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অসাধারণ দৌড়ের জন্য ইংলণ্ডের রাণী আলেকজান্দ্রা তাঁকে উপহার দেন একটি বিশেষ সোনার কাপ।

সুইডেনের সংগঠকদের সুব্যববস্থায় পঞ্চম অলিম্পিক হয় আরও সাফল্যমণ্ডিত। আরও বেশি দেশ এবং আরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ১৪ রকমের খেলাধূলায় ৫৭

১৯১২ : স্টকহোম

জন মেয়ে প্রতিযোগীসহ ২৮টি দেশের মোট প্রতিযোগী ছিলেন ২৪৪৭ জন। মেয়ে সাঁতারুরা প্রথম অংশ নেন এই অলিম্পিকে এবং প্রথম ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফোটো ফিনিশের ব্যবস্থা হয়। ফিনল্যাণ্ডের হ্যান্স কোলেমিনেন ৫০০০, ১০০০০ ও ৮০০০ হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি রেস জিতে তিনটি স্বর্ণ পদক পান। তবে অসাধারণ এ্যাথলীটের সম্মান পান আমেরিকার নিগ্রো জিম থর্প ডেকাথলন ও পেণ্টাথলনে সোনা জিতে। ডেকাথলনে ইভেন্ট দশটি—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, পোল ভল্ট, লোহার বল ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া ও বর্শা ছোঁড়া এবং ১১০ মিটার হার্ডল্স রেস। আর পেণ্টাথলনের পাঁচটি বিষয় হচ্ছে—ঘোড়ায় চড়ে ৮০০ মিটার রেস, ফেন্সিং, ২৫ মিটার দূর থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি ছোঁড়া, ৩০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতার এবং ৪০০০ মিটার ক্রস কাণ্ট্রি দৌড়। সমস্ত খেলাধুলায় কত পারদর্শী হলে পেণ্টাথলন ও ডেকাথলনে স্বর্ণ পদক লাভ সম্ভব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জিম থর্পের ভাগ্য মন্দ। কখন নাকি আমেরিকায় বাস্কেটবল খেলে পয়সা নিয়েছিলেন। তাই প্রোফেশনাল বলে পরিগণিত হন এবং এক বছর পরে দুটি স্বর্ণপদক তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয়। স্টকহোম অলিম্পিকে ২৪টি স্বর্ণপদক পায় সুইডেন, আমেরিকা ২৩টি।

১৯১৬ : বার্লিন প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে ষষ্ঠ অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অলিম্পিক, তাই পাঁচ মহাদেশকে এক সূত্রে বেঁধে রাখার পরিকল্পনায় অলিম্পিকের শ্বেত পতাকায় পঞ্চবলয় এঁকে দেওয়া হয় এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয় শান্তির

১৯২০ : আন্টোয়ার্প দূত হিসাবে। দুটি পরিকল্পনাই আসে আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের ডি কুবার্তিনের মাথা থেকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম অ্যাথলীটদের পক্ষ থেকে একজন সততার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার শপথ বাক্য পাঠ করেন। সেবার এই শপথ বাক্য পাঠ করেন গেমসের আয়োজনকারী বেলজিয়মের ফেনসার ভিক্টর বয়েন। এই অলিম্পিক ও পরবর্তী দুটি অলিম্পিক মিলিয়ে ফিনল্যাণ্ডের পাভো নুর্মি দূরপাল্লার দৌড়ে পান ৯টি সোনা ও ৩টি রূপোর পদক। আন্টোয়ার্পে সর্ব কনিষ্ঠ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সম্মান পায় আমেরিকার ১৩ বছরের মেয়ে আইলিন রিগিন স্প্রিং বোর্ডের ডাইভিং-এ বিজয়িনী হয়ে।

আমেরিকা পায় ৪১ টি সোনা, সুইডেন ১৯টি। অংশ নিয়েছিলেন ২৯টি দেশের ২৬০৭ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ৬৪ জন)। ক্রীড়া বিষয় ছিল ২২টি।

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অষ্টম অলিম্পিকে যোগ দেন ৪৪টি দেশের ৩০৯২ জন (মেয়ে ১৩৬) প্রতিযোগী। ক্রীড়া বিষয় ছিল ১৮ টি। পাভো নুর্মি "ফ্লাইং ফিন" নামে অভিহিত হন ৫টি

১৯২৪ : প্যারী

সোনা জিতে। তিনি জেতেন ১৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার ১০০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি এবং তিন হাজার মিটার টিম ইভেন্টে। পরবর্তী কালে যিনি টার্জানের ভূমিকায় ছায়াছবি জগতে বিখ্যাত হন সেই জনি ওয়েস মুলার এই অলিম্পিকে সাঁতারে তিনটি সোনা পান ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ২ × ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলেতে। আমেরিকা পায় ৪৬টি স্বর্ণ পদক, ফিনল্যান্ড ১৭টি।

নবম অলিম্পিকেই প্রথম ১৫ দিন ব্যাপি প্রতিযোগিতার দিনগুলিতে পূতাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। এই অলিম্পিকেই প্রথম ফল জানাবার জন্য স্কোর বোর্ডের ব্যবস্থা হয় এবং অ্যাথলেটিকসে মেয়েরা প্রথম প্রতি-

১৯২৮ : আমস্টারডাম

যোগিতার সুযোগ পান। ফলে মেয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০। মোট প্রতিযোগী ছিলেন ৩০১৪ জন। ১৫ রকমের খেলাধূলায় অংশ নিয়েছিল ৪৬টি দেশ।

আমাদের ভারতের কাছে এই অলিম্পিক স্মরণীয়। ভারতের অ্যাথলীটরা সরকারীভাবে আগের অলিম্পিকে অংশ নিলেও আমস্টারডামেই ভারত বিশ্বের ক্রীড়া দরবারে প্রথম বড়ো সম্মান পায় হকি চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

এখানে জনি ওয়েস মুলার পান আরও দুটি স্বর্ণপদক। আমেরিকা আবার শীর্ষস্থান পায় ২৪টি সোনা জিতে। প্রতিযোগীদের একস্থানে এবং এক সঙ্গে বসবাসের জন্য লস্ অ্যাঞ্জেলসেই প্রথম অলিম্পিক

১৯৩২ : লস্ অ্যাঞ্জেলস্

ভিলেজের ব্যবস্হা হয় এবং বিজয়ীদের উঁচু-স্হানে দাঁড়িয়ে পদক নেবার জন্য ব্যবস্হা হয় ভিক্টরি স্ট্যান্ডের। ১৫ রকমের খেলাধূলায় অংশ নেয় ৪৭টি দেশের ১৩০৮ জন প্রতিযোগী (মেয়ে ১২৭ জন) ৪৭ টি স্বর্ণপদকে আমেরিকা শীর্ষস্হান এবং ১২টি স্বর্ণপদকে ইতালি দ্বিতীয় স্থান পায়। এশিয়ার দেশ হিসাবে জাপান কিছুটা সাড়া জাগায় সাঁতারে ৫টি এবং মোট ৭টি স্বর্ণপদক জিতে। একমাত্র লংজাম্প বাদে অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টের সমস্ত রেকর্ড এখানে ভেঙ্গে গিয়েছিল।

বার্লিনে একাদশ অলিম্পিকের মাধ্যমে হের হিটলার চেয়েছিলেন আর্য সভ্যতা ও আর্য আধিপত্যের প্রমাণ দিতে। কিন্তু তাঁর দম্ভে আঘাত হেনেছিলেন কৃষ্ণ চর্ম নিগ্রো অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স্ চারটি সোনা জিতে। পরবর্তীকালে জেসি ওয়েন্স্ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীটের সম্মান পেয়েছেন। বার্লিনে তিনি সোনা পান ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প এবং ৪ × ১০০ মিটার রীলে দৌড়ে।

১৯৩৬ : বার্লিন

বার্লিনের একাদশ অলিম্পিক থেকে সুরু হয়েছে অলিম্পিয়ার মন্দির প্রাঙ্গণে সূর্যরশ্মি থেকে আতস কাচের সাহায্যে পূতাগ্নি জ্বালিয়ে সেই অগ্নি রীলে প্রথায় অলিম্পিক অঙ্গনে আনার রেওয়াজ। বার্লিনেই প্রথম বেতারে এবং টেলিভিশনে অলিম্পিকের খবর ও চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা হয়। একাদশ অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিল ৪৯ টি দেশ। ২০ রকমের খেলাধূলায় অংশ নিয়েছিলেন ৪০৫৬ (মেয়ে ৩২৮) জন প্রতিযোগী। জার্মানি পেয়েছিল ৩৬ টি স্বর্ণ পদক, আমেরিকা ২৫ টি। নতুন ইভেণ্ট ছিল বাস্কেটবল।

১৯৪০ : টোকিও, পরে হেলসিংকি ১৯৪৪ : লণ্ডন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি।

কয়েক বছর পরে যুদ্ধ ক্লান্ত পৃথিবীতে আবার অলিম্পিকের আয়োজনে সারা বিশ্ব মেতে ওঠে। মরণ আলিঙ্গনের পর বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে জার্মানি, জাপান ও রাশিয়া অংশ নিতে পারে না। ১৮ রকমের খেলায় ৫৯ টি দেশের ৪০৯৯ জন (মেয়ে ৩৮৫) প্রতিযোগী অংশ নেন। চারটি সোনার পদক জিতে সবাইকে অবাক করে দেন দুই সন্তানের জননী হল্যাণ্ডের ফ্যানি ব্ল্যাংকার্স কোয়েন। তিনি সোনা পান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে, ৮০ মিটার হার্ডল্‌সে এবং ৪ × ১০০ মিটার রীলে রেসে। মাত্র ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা আমেরিকার জোসেফ পিয়েত্র ব্যান্টাম ওয়েট ভারোত্তলনে ৩০৭.৫ কিলোগ্রাম তুলে নতুন রেকর্ড করেন। পিয়েত্রোর চেয়ে খর্বকায় প্রতিযোগী বোধহয় আর অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হননি। আমেরিকা আবার পদক তালিকায় শীর্ষ স্থান পায়। সোনা পায় ৪১ টি।

১৯৪৮ : লণ্ডন

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকির জনসংখ্যা তখন মাত্র সাড়ে তিন লাখ। কিন্তু ক্রীড়াযজ্ঞে বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। ১৭ রকমের খেলায় প্রতিযোগী ছিলেন ৬৯টি দেশের ৪৯২৫ জন (মেয়ে ৫১৮)।

১৯৫২ : হেলসিংকি

হেলসিংকি অলিম্পিকে চিহ্নিত হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেকের নামে। জিতেছিলেন ৫000 মিটার, ১0000 মিটার ও ম্যারাথন দৌড়। আবার তিনটিতেই নতুন রেকর্ড। তাঁর সহধর্মিনী ডানা হেটোপেকোভা সোনা পেয়েছিলেন বর্শা নিক্ষেপে। শুটিং-এ র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে লণ্ডনে সোনা জিতেছিলেন হাঙ্গেরির কারোলি ট্যাকাকস। তিনি হেলসিংকিতেও জেতেন। উল্লেখ্য, ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় ডান হাতখানি খোয়া যাবার পর ট্যাকাকস গুলি ছুঁড়তেন বাঁ হাতে।

হেলসিংকি অলিম্পিকের বড়ো খবর আমেরিকাকে পিছনে ফেলে রাশিয়ার এগিয়ে যাওয়া। জার-এর আমলে রাশিয়া তিনটি অলিম্পিকে যোগ দিয়ে পেয়েছিল মাত্র একটি সোনা, চারটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। ৪০ বছর পরে রাশিয়া হেলসিংকি অলিম্পিকেই পায় ৪৩টি সোনা, আমেরিকা পায় ৩৪ টি। অবশ্য, সোনা রুপো ব্রোঞ্জ মিলিয়ে আমেরিকা পায় ৭৬ টি পদক, রাশিয়া ৬৯ টি।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রথম অলিম্পিক হয় অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বাড়লেও প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল। ১৭ রকমের খেলায় যোগ দিয়েছিলেন ৭১টি দেশের ৩৩৪২ জন (মেয়ে ৩৮৪) প্রতিযোগী। পদক-তালিকায় রাশিয়া শীর্ষস্থান পায় (৯৮টি), দ্বিতীয় স্থান পায় আমেরিকা (৭৪ টি)।

১৯৫৬ : মেলবোর্ন

রাশিয়ার মেয়ে জিমনাস্ট লারিশা লাটিনিনা পান ৪টি সোনা এবং ১টি রুপো। পরবর্তী অলিম্পিকে আরো পদক পেয়ে তাঁর মোট পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯টি—৯টি সোনা, ৫টি রুপো এবং ৫টি ব্রোঞ্জ। অলিম্পিকে আর কোনও মেয়ে এত পদক পাননি।

৮৩টি দেশের ৫৩৪৮ জন (মেয়ে ৬১০) প্রতিযোগীর মধ্যে ১৭ রকমের খেলায় সবচেয়ে তাক লাগান ইথিওপিয়ার নগ্নপদ অ্যাথলীট আবেবে বিকিলা এবং আমেরিকার কালো মেয়ে রুডলফ্। আবেবে বিকিলা রেকর্ড সময়ে জেতেন ম্যারাথন দৌড়। পরের অলিম্পিকে আবার জেতেন। তবে সেবার রানিং-সু পরে। রুডলফ্ সোনা পান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে ও ৪ × ১০০ মিটার রীলেতে। এই রুডলফ্ কিন্তু পোলিও রোগে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত হাঁটতে পারতো না।

১৯৬০ : রোম

রোম ভারতের কাছে রমনীয় হয়ে ওঠেনি কারণ এবার হকির সোনা

এই প্রথম হাত ছাড়া হয় এবং যায় পাকিস্তানের হাতে। পদক-তালিকায় আবার রাশিয়া শীর্ষস্থান পায় ১০৩ টি সোনা রূপা ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে। আমেরিকা পায় ৭১টি।

এশিয়া ভূখণ্ডে প্রথম অলিম্পিক হয় টোকিওতে। মোট ৫৬০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে অষ্টাদশ অলিম্পিকের আয়োজন, জাঁকজমক এবং বর্ণবৈচিত্র্যে পাশ্চাত্তের দেশগুলিকে তাক লাগিয়ে দেয় এই উদিত সূর্যের দেশ। ১৯ রকমের খেলায় যোগ দেন ৯৩ টি দেশের ৫১৪০ জন (মেয়ে ৬৮৩) প্রতিযোগী।

১৯৬৪ : টোকিও

ব্যক্তিগতভাবে নজর কাড়েন মার্কিন মুলুকে স্কুলের ছাত্র ডন স্কোলান্ডার সাঁতারে ৪টি সোনা জিতে। টোকিওতে রাশিয়া পায় ৯৬টি পদক, আমেরিকা ৯০টি। জুডো এবং ভলিবল টোকিও অলিম্পিক থেকেই। এখানে ভারত আবার পায় হকির সোনা।

হিরোশিমার প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দিন যে ছেলেটির জন্ম হয়েছিল সেই ছেলেটির উপর অর্পণ করা হয়েছিল স্টেডিয়ামের অগ্নিস্থলে পূতাগ্নি স্থাপনের দায়িত্ব।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০০ ফুট উপরে মেক্সিকো শহরে ঊনিশতম অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট বব্-বীমন লং জাম্পে এমন এক রেকর্ড করে রেখেছেন যা কে কতদিনে ভাঙ্গবে ভবিষ্যৎই জানে। লং জাম্পে বিশ্বরেকর্ড ছিল ২৬ ফুট-৭½ ইঞ্চি। বীমন লাফান ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি। অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

১৯৬৮ : মেক্সিকো

এই অলিম্পিক থেকে মেয়ে প্রতিযোগীদের সেক্স-টেস্ট সুরু হয়। মেক্সিকোয় ১৮ রকমের খেলায় ১১২টি দেশের ৫৫৩১ জন (মেয়ে ৭৮১) প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র পায় ১০৭টি পদক, রাশিয়া ৯১টি।

এই অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীটরা বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে বিজয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে প্রতিবাদ জানায়।

এখানে চারটি সোনা ও দুটি রূপার পদক জয় করে জিমনাস্ট-রানীর সম্মান পান চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেরা ক্যাসলাভস্কা।

যেমন সবচেয়ে বেশি দেশ (১১২টি) এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগীর (৭১৪৭ জন—মেয়ে ১০৭০) বিংশতি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মতো ঘটনা তেমনি খেলাধূলার ইতিহাসে বিভীষিকাময় ও পৈশাচিক ঘটনা ঘটে মিউনিখ অলিম্পিকেই। আরব

১৯৭২ : মিউনিখ

গেরিলাদের নৃশংসতায় নিহত হয়েছিলেন ১১ জন ইজরায়েলী ক্রীড়াবিদ। মোট ১৭টি প্রাণবলি হয়েছিল। মিউনিখ অলিম্পিকেই বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের কিছু হকি খেলোয়াড় জুতোর মধ্যে রূপোর পদক ভরে সেই জুতো উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন আম্পায়ারিং-এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য।

অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো কীর্তির অধিকারী হন সাঁতারে ৭টি সোনা জিতে।

রাশিয়া পায় ১০১ টি পদক, আমেরিকা ৯১টি।

১৯৭৬ : মণ্ট্রিয়ল

বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদে আফ্রিকার প্রায় ৩০ টি দেশ মণ্ট্রিয়ল অলিম্পিক বয়কট করা সত্ত্বেও ২১ রকমের খেলায় ৮৮টি দেশের ৬১৫২ জন (মেয়ে ১২৬১) প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মন্ট্রিয়লকে মাতিয়ে তোলে ইউরোপের দুই চতুর্দশী—পূর্ব জার্মানির কর্নেলিয়া এন্‌ডার এবং রুমানিয়ার নাদিয়া কোমানেচি। সাঁতারে এন্‌ডার পায় ৪টি সোনা, জিমনাস্টিকে কোমানেচি ৩টি সোনা ও একটি রূপো।

মণ্ট্রিয়ল অলিম্পিকে খরচ হয় সবচেয়ে বেশি অর্থ। আমাদের মুদ্রার হিসাবে ১৩০০ কোটি টাকা।

রাশিয়া পায় ৪৭টি সোনা, পূর্ব জার্মানি ৪০টি এবং আমেরিকা ৩৪টি। মণ্ট্রিয়ল থেকে ভারতের গোটা দলকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়। মণ্ট্রিয়ল হকিতে ভারত পায় সপ্তম স্থান।

১৯৮০ : মস্কো

১৫ দিন ব্যাপি মস্কো অলিম্পিকে ৩৬টি নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়। রেকর্ডগুলি হয় সাঁতার ও এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ে, বন্দুক চালনা, ভারোত্তলন ও সাইকেল রেসে। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে যারা নতুন রেকর্ডের অধিকারী হলো তারা নিঃসন্দেহে এই বছরের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

রাজনৈতিক কারণে কয়েকটি দেশের অ্যাথলীটরা এই অলিম্পকে যোগদান না করা সত্ত্বেও এর গুরুত্ব সম্ভবত ম্লান হয়নি। সমগ্র বিশ্বই জেনেছে কী আন্তরিকতা, কী দক্ষতা ছিল সংগঠকদের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যবস্থাপনায়। এমন কি, আমেরিকার এক বড়ো ব্যবসায়ী উচ্চকণ্ঠে এই অলিম্পিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছিলেন, এই সংগঠকদের কাছ থেকে অন্যান্য দেশের অনেক কিছু শিক্ষণীয় জিনিস আছে।

লস্‌ এঞ্জেলস্‌ অলিম্পিকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিভাবান এ্যাথলীট কার্ল লুইস এবং গ্রেট বৃটেনের ড্যালে টমসনের অসাধারণ নৈপুণ্য।

১৯৮৪ : লস্ এঞ্জেলস্

কার্ল লুইস ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৪ × ৪০০ মিটার রিলে রেস ও লং জাম্পে স্বর্ণ পদক লাভ ক'রে কিংবদন্তীতে পরিণত জেসি ওয়েন্সের নামের পাশে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করলেন। একটি অলিম্পিকের আসরে চারটি প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত কেবল মাত্র এঁরা দুজনই স্বর্ণ পদক জয়ের দুর্লভ সম্মান অর্জন করলেন।

ড্যালে টমসন ১৯৮০ এবং ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে দু'বারই ডেক্যাথলন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে এক নতুন ও অত্যন্ত দুরূহ রেকর্ড স্থাপন করলেন। এই রেকর্ডকে এক কথায় বলতে হয় বিস্ময়কর। ডেক্যাথলনে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয় ঃ—১০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, সট পাট, হাই জাম্প, ৪০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডলস, ডিসকাস নিক্ষেপ, পোল ভল্ট, জ্যাভেলিন নিক্ষেপ এবং ১৫০০ মিটার দৌড়।

এই বছরের অলিম্পিকে "ছন্দোবদ্ধ সাঁতার" নামে এক নতুন ধরণের প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়। জিমনাস্টিক ও নৃত্য সমন্বয়ে সাঁতারের অভূতপূর্ব এই প্রতিযোগিতা। এর সৌন্দর্য দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার টেসি রুইজ ও ক্যাণ্ডি কস্ট নাম ধারী দুই কন্যা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্বর্ণপদক পাবার সম্মান লাভ করলেন।

অলিম্পিকের গুরুত্ব অনুযায়ী তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিও বিশেষ আড়ম্বর ও আকর্ষণীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। অলিম্পিকের জন্মভূমি গ্রীসদেশের অলিম্পিয়ায় একটি মশাল প্রজ্জ্বলিত করে সেটি হাতে বহন করে যথাসম্ভব দৌড়ের সাহায্যে রীলে প্রথায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অবশেষে পেঁছায় অলিম্পিকের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে। মশালের শেষ বহনকারী থাকেন সাধারণত সেই দেশেরই কোন এক প্রাক্তন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ। তিনি উদ্বোধনের দিন মশাল হাতে স্টেডিয়ামে দৌড়িয়ে প্রবেশ করেন।

অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

দেশের প্রেসিডেণ্ট, রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি সাধারণত প্রতিযোগিতা সুরুর ঘোষণাটি করেন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতির পদও তিনিই অলংকৃত করেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং জাতীয় সংগঠক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সভাপতিকে পরিচয় করানো হয় এবং তারপরেই সেই দেশের

জাতীয় সংগীত গীত হয়।

তারপরের অনুষ্ঠান হলো মার্চ পাস্ট্। মার্চ পাস্টে সবদেশের ক্রীড়াবিদরাই অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রত্যেক দেশের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে প্রতিযোগীরা সারিবদ্ধ হন। সকলের পিছনে থাকেন সংগঠক-কারী দেশের ক্রীড়াবিদের দল এবং সর্বদাই সব দলের সম্মুখে রাখা হয় গ্রীসের দলকে। অলিম্পিকের জন্মদাতার প্রতি এইভাবে প্রথমেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। মার্চ পাস্টের অভিবাদন গ্রহণ করেন স্বয়ং সভাপতি। প্রতি দেশের প্রতিযোগীরা মার্চ করার সময় সভাপতির সম্মুখে আসা মাত্র তাঁদের দেশের পতাকা নত করেন সভাপতিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং তাঁকে অতিক্রম করে গিয়ে আবার পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেন।

তারপর শান্তির দূত পায়রাগুলিকে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সময় মশাল হাতে নির্দিষ্ট ক্রীড়াবিদ স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে এবং সমস্ত ট্র্যাকটি একবার দৌড়ে প্রদক্ষিণ করেন এবং অলিম্পিকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন।

অলিম্পিকের শপথ বাক্যটি এই রকম ঃ—সামগ্রিকভাবে ক্রীড়ার গৌরব এবং আমাদের স্বদেশের সম্মানের জন্য অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সত্যিকার ক্রীড়া-মনোভাব নিয়ে আমরা অংশগ্রহণ করার শপথ গ্রহণ করছি এবং এর সবগুলি নিয়মও আমরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শপথ-বাক্য

১৯২০ সালে অ্যান্টোয়ার্পে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে সর্বপ্রথম এই শপথ বাক্য উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত হয়।

অলিম্পিকের পতাকার রঙ হলো সাদা। তার মধ্যে পাঁচ রঙের পাঁচটি রিং থাকে—নীল, কালো, সাদা, সবুজ ও লাল। কুবার্তিনের পরামর্শ অনুসারে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯১৩ সালে এই পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক কংগ্রেসে এই পতাকা উত্তোলিত হয়। ১৯২০ সাল থেকে প্রতিবারের অলিম্পিকের আসরেই এই পতাকাটি তোলা হয়। পাঁচটি রিং হলো পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। অলিম্পিকের ক্রীড়ানুষ্ঠান যেন পাঁচটি মহাদেশকেই এক সূত্রে গাঁথতে পারে সেই ইচ্ছাই প্রকাশিত হয় এই রিং এর পরস্পরের একের সঙ্গে অপরটির বাঁধনের মধ্য দিয়ে।

পতাকা

এই মহৎ ইচ্ছা যদি কোনও দিন বাস্তব রূপ পায় তাহলে সেই দিন

স্বর্গ নেমে আসবে পৃথিবীতে এবং মানুষ দিব্যজীবন লাভ করবে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান অর্জনকারীদের দেওয়া হয় তিন প্রকার পদক। প্রথম পুরস্কারের পদকটি থাকে রুপোয় তৈরি এবং তার উপর ৬ গ্রাম খাঁটি সোনায় মণ্ডিত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে রুপো এবং ব্রোঞ্জের তৈরি পদক। পদকগুলির ব্যাস ৬০ মিলিমিটারের কম হবে না এবং ঘনত্বে ৩ মিলিমিটারের কম হবে না—এই হলো সরকারি নির্দেশ। প্রতিযোগিতার বিষয়ের নাম পদকে খোদিত থাকে। প্রথম তিন স্থানাধিকারীদের পদকের সঙ্গে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এই ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ষষ্ঠস্থানাধিকারী পর্যন্ত ক্রীড়াবিদদের অর্পণ করা হয়।

পদক

সিটিয়াস, অল্টিয়াস ও ফোর্টিয়াস্ অর্থাৎ আরও বেগে দৌড়, আরও উঁচুতে লাফ এবং আরও শক্তি সঞ্চয়—এই হলো ক্রীড়াবিদদের আকাংখা। বর্তমানে পৃথিবীতে দ্রুততম দৌড়বীর হলেন যুক্তরাষ্ট্রের জেম্স হাইন্স, যাঁর ১০০ মিটার দৌড়াতে সময় লেগেছে মাত্র ৯.৯ সেকেণ্ড। সবচেয়ে উঁচুতে লাফিয়েছেন (পোল ভল্ট নয়) জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের গের্ড ওয়েসিগ্—২ মিটার এবং ৩৬ সেন্টিমিটার। আর সকলের চেয়ে অধিক ওজন তুলেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্যাসিলি অ্যালেক্সিয়েভ। দুই লিফ্টে তিনি মোট ওজন তুলেছেন ৪৪০ কে জি।

ক্রীড়াবিদদের আকাংখা

কেউ বলতে পারেনা মানুষের শারীর ক্ষমতার মাত্রা কোথায় গিয়ে থামবে। প্রতি চার বছর বাদেই অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনে কয়েকটি বিষয়ের পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করে যাচ্ছে নতুন ক্রীড়াবিদরা—বিশেষত, দৌড়ের গতিতে, লাফানোর উচ্চতায় ও দূরত্বে কিংবা কোনও বস্তু নিক্ষেপের ব্যবধানে অথবা সব রকম সাঁতারের সময় সীমায়।

আধুনিক বিজ্ঞান তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিস্তারে এই সব ক্রীড়াবিদদের বাড়িয়ে দিচ্ছে শারীর ক্ষমতা। গবেষণার অন্ত নেই নব নব উপায় উদ্ভাবনের, যেগুলির সাহায্যে মানুষ ভাঙ্গবে তার নিজের তৈরি সব রেকর্ড। বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রশিক্ষণে নব আবিস্কৃত নানা যন্ত্রের প্রয়োগে পেশীর শক্তি বৃদ্ধি করে সচলতা বাড়িয়ে এবং বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ায় অলিম্পিকের রেকর্ড ভাঙ্গার প্রতিযোগিতা চলছে অগ্রসর দেশগুলিতে।

এশিয়ান গেমস

এশিয়ান গেমস সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে। এটাই কিন্তু এশীয় দেশগুলির মধ্যে প্রথম সমবেত ক্রীড়ানুষ্ঠান নয়। ১৯১৩ সালে ম্যানিল্লাতে ফার ইস্টার্ণ চ্যাম্পিয়নশিপ নামে এই ধরণের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, বেসবল, টেনিস, এ্যাথলেটিকস ও সাঁতার ছিল এই প্রতিযোগিতার বিষয়। প্রতি দু'বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং টোকিও, সাংহাই, ম্যানিলা ও ওসাকা শহরে পর্যায়ক্রমে এই প্রতিযোগিতার আসর বসে। তবে ভারত মাত্র একবার ১৯৩০ সালে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাও শুধু এ্যাথলেটিকসে। তেমন সাড়া মেলেনি এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি থেকেও। চীন, জাপান, মালয়, শ্যাম, ফিলিপিনসই ছিল প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ। তৎকালীন যানবাহন বর্তমানের মতন সুবিধাজনক না থাকা হয়তো এই সংখ্যাল্পতার অন্যতম কারণ ছিল।

ভারতের অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতায় নগণ্য হলেও ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ১৯৩৪ সালে গুরুদত্ত সন্ধির উদ্যোগে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম এশিয়াটিকস গেমস। এতে অংশগ্রহণকারী ছিল ভারত, সিংহল, আফগানিস্থান ও প্যালেস্টাইন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল মাত্র তিনটি—হকি, এ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার। এই প্রতিযোগিতার এটাই প্রথম ও শেষ অনুষ্ঠান।

আধুনিক বিশ্ব অলিম্পিকের হিসাবে ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিনের নাম যেমন ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকবে তেমনি এশিয়ান গেমসের উদ্যোগকারীদের সর্বপ্রধান হিসাবে গুরুদত্ত সন্ধির নাম চিরস্মরণীয়। পূর্বোক্ত পশিচম এশিয়াটিক গেমসেরও প্রবর্তক ছিলেন তিনিই। বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় তখন আর ঐ প্রতিযোগিতার পুনরুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। এশিয়ান গেমসের পরিকল্পনার প্রধান রূপকার হিসাবে গুরুদত্ত সন্ধি চিহ্নিত। ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ভারতীয় সদস্য হিসাবে ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি ৮ই আগস্ট লণ্ডনের মাউণ্ট রয়্যাল হোটেলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান। সেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন সভায় ভারত সহ চীন, কোরিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপিনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে

গুরুদত্ত সন্ধির প্রস্তাবানুসারে গঠিত হয় এশীয় এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়শন। সন্ধি সেখানে প্রস্তাব রাখেন যে, দিল্লীতে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে এশীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোক এবং এশীয় গেমস ফেডারেশন গঠন করে প্রতি চার বছর অন্তর এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান করা হোক। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সকলেই তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানান।

তারপর পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে আহূত সভায় গঠিত হয় এশিয়ান গেমস ফেডারেশন। সন্ধির স্বপ্নকে রূপ দান করার উদ্দেশ্যেই এই সভা বসেছিল। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হলো এই যে, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পূর্বের সভায় এশিয়ান এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়শন নামটিকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ইচ্ছানুযায়ী এশিয়ান গেমস ফেডারেশন এই নামে পরিবর্তিত করা হয়। মহারাজা কর্তৃক আয়োজিত ঐ সভায় ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন ও শ্যাম দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসের ৪ থেকে ১১ পর্যন্ত প্রথম এশিয়ান গেমসের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ছিল ১১। স্মারক পুস্তিকায় লেখা হলো ঃ—

"বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক ঐ সব দেশে ভারতের বাণী প্রচারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাঠাতেন। এশিয়ান গেমসের মধ্য দিয়ে সম্রাট অশোকের স্বপ্নই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। ভারতের ডাকেই এশিয়ার দেশগুলি নিজ নিজ দেশের পতাকা সহ এসে দাঁড়িয়েছে অশোকচক্র শোভিত পতাকার তলে।"

ন্যাশনাল স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন এ্যান্টনি ডি' মেলো। উদ্বোধক ছিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ফিতে কেটেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। এই উপলক্ষে শিল্পকলারও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় ১৬৮ পয়েন্ট অর্জন করে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারত দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ১১৬ পয়েন্ট পেয়ে। যে ১১টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের নাম ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, জাপান, ইরান, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও ভারত। আর, মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪৮৯।

প্রথম এশিয়ান গেমসের পরে ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে যথাক্রমে ম্যানিলা, টোকিও, জাকার্তা, ব্যাংকক্, ব্যাংকক্, তেহরান, ব্যাংকক ও ভারতে অনুষ্ঠিত হয়।

নবম এশিয়ান গেম্‌সে নিম্নলিখিত ২১টি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় :—এ্যাথলেটিকস্, সাঁতার, জিমনাস্টিকস্, কুস্তি, বক্সিং, ভারোত্তলন, সাইক্লিং, তীরন্দাজী, গল্‌ফ, শ্যুটিং, সুটিং, ব্যাডমিণ্টন, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, ইয়টিং, টেবল টেনিস, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ড বল, হকি ও ফুটবল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এশিয়ান গেমসের পূর্বেকার আসরগুলিতে প্রতিযোগিতার সংখ্যা এর চেয়ে কম ছিল। কোন বার কয়টি প্রতিযোগিতা ছিল তার সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে প্রতিবারের দেশ ও প্রতিযোগীর সংখ্যা উল্লেখ করা হলে :—

সাল	দেশ	প্রতিযোগী	ইভেন্ট
১৯৫১	১১	৪৮৯	৬
১৯৫৪	১৮	৯৭০	৮
১৮৫৮	২০	১৪২২	১৬
১৯৬২	১৭	১৫৪৫	১৪
১৯৬৬	১৮	১৯৪৫	১৪
১৯৭০	১৮	১৭৫২	১৩
১৯৭৪	১৯	২৮৬৯	১৬
১৯৭৮	২৫	৩৮৪২	১৯

১৯৮২ সালে দিল্লীতে এশিয়ান গেমসের যে আসর বসেছিল তার সঙ্গে ১৯৫১ সালের দিল্লীর এশিয়ান গেমসের অনেক তফাৎ। প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ১১ থেকে হলো ৩৩, ইভেন্টের সংখ্যা ৬ থেকে হলো ২১। এবারের দিল্লীর ব্যবস্থাপনা ও উদ্দীপনা সম্ভবত পূর্ববর্তী সবগুলি এশিয়ান গেমসকে ম্লান করে দিয়েছে। ভারত সরকার এটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যার ফলে, বিদেশীরা মুক্তকণ্ঠে এবারের এশিয়ান গেমসকে সাধুবাদ জানিয়ে গেছেন।

কয়েকটি জনপ্রিয় খেলার জন্মকথা

ফুটবল খেলার জন্ম-ইতিহাস এক অজানা অন্ধকারে আবৃত। সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা কিছু কিছু আলোর রশ্মিতে দেখা যায় যে, মহাসুদূর অতীতেও পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যদেশগুলির কোনও কোনওটিতে

ফুটবল

ফুটবল খেলা হয়েছে। চীন তাদের অন্যতম। দু'হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন এক চীনা কবি ফুটবল খেলা নিয়ে একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করেছিলেন। সে কবিতা থেকে জানা যায় যে, সেই খেলাতেও দু'টি গোল পোস্ট ছিল এবং দুই দলের অধিনায়কও ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা হলো এই যে, কবি প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোভাবের যে উল্লেখ রেখেছেন তাতে তার সঙ্গে এই বিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত ক্রীড়া-আদর্শের কোনও পার্থক্য নেই। কবি লিখেছেন, খেলায় থাকবে পূর্ণ নিরপেক্ষতা আর পরাজয়ে যেন বিজিতদল অবিচলিত থাকে।

প্রাচীন গ্রীসেও "এপিস কুরস" নামে ফুটবল জাতীয় একটি খেলা প্রচলিত ছিল। অন্তত, একটি বল নিয়ে যে খেলোয়াড়রা লাথি মেরে খেলতো সে তথ্য পাওয়া যায়। তবে সে খেলার আইন কানুন কিছু জানা যায়নি।

একদা একাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কতিপয় মজুর এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে খনন কার্যের সময় ডেন দেশীয় এক মৃত সৈনিকের নরমুণ্ডের কংকাল খুঁজে পায়। ডেনমার্ক ছিল তখন ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষ। অতএব, শত্রুর মুণ্ডটি পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে তারা পায়ে পায়ে লাথি মেরে খেলা সুরু ক'রে দেয়। আর, তাদের দেখাদেখি বালকেরা নরমুণ্ডের বদলে নিজেদের তৈরি বল দিয়ে লাথি মেরে খেলতে আরম্ভ করলো। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের ধারণা, এটাই ইংলণ্ডে ফুটবলের জন্মকথা।

ইংলণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ফুটবল খেলা প্রচলিত ছিল তার চেহারা আবার অন্যরকম। দু'দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং, লোকবলে যারা বেশি বলীয়ান তারাই লাভবান। দুই দলের গোল পোস্টের ব্যবধান কয়েক মাইল। খেলার নির্দিষ্ট মাঠ বলে কিছু নেই। রাস্তা, গলি, মাঠ, ঘাট সব জুড়েই খেলা। এমন কি, গৃহস্থের বাড়ীঘর

দোরের মধ্যে দিয়েও খেলোয়াড়দের দৌড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। এ খেলায় খেলোয়াড়দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর গৃহস্থের গৃহসামগ্রী সবই বিপন্ন ছিল।

এই সময় ইংলণ্ডে ফুটবল খেলায় দেশের এতো বেশি লোক মেতে উঠেছিল যে অখেলোয়াড়দের প্রাণান্তকর অবস্থা। দেশের সেনাবাহিনীও শান্তির সময়ে শরীর চর্চা ও যুদ্ধ চর্চা পরিহার করে ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছিল।

অবশেষে, ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের রাজারা দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার নিমিত্ত উপায়ান্তর না দেখে দেশে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিলেন। এই আদেশ বলবৎ ছিল অনেক কাল। কিন্তু অসামান্য জনপ্রিয় এই খেলা আবার দেখা দিল।

ফুটবল খেলার এই সময়ে যে ধরণ ছিল তা রুক্ষতা ও বলপ্রয়োগের সংযোগে এক প্রায় বর্বর রূপ ধারণ করেছিল। যার ফলে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এ খেলা থেকে বিরত থাকতেন। উনিশ শতকের প্রায় অর্ধেক কাল পর্যন্ত ফুটবলের এই চেহারা অব্যাহত ছিল। ১৮২৯ সালে এক শিক্ষিত ফরাসী ইংলণ্ডের ফুটবল খেলা দেখে মন্তব্য করেছিলেন—"ইংরেজরা যদি এটাকে খেলা ব'লে প্রচার করে তাহলে মারামারি কাকে বলে আমি জানি না।"

বিবর্তনের পথই উন্নতির পথ, তাই ফুটবলও একদিন পেলো তার সভ্য ও বিজ্ঞান সম্মত ক্রীড়ারূপ। এরও জন্মদাতা ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলির খেলা থেকেই আধুনিক ফুটবল পেয়েছে তার মোটামুটি বর্তমান রূপ। তারপর নানা প্রকার প্রথা প্রকরণ আর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ফুটবল এগিয়ে চলেছে উন্নত থেকে উন্নততর মানে। নব নব চিন্তাধারা ও ক্রীড়া-পরিকল্পনা ফুটবলকে ক'রে তুলেছে এক অসাধারণ কৌশল ও শারীর-ক্ষমতাসাপেক্ষ খেলা। দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, নিপুণ কলা-কৌশল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমৃদ্ধ ফুটবল বর্তমানে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা।

বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা। ১৯৩০ সালে এর সুরু এবং প্রতি চার বছর অন্তর এটি অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে বিশ্বকাপের খেলা বন্ধ ছিল। বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় পূর্বে

বিশ্বকাপ

বিজয়ীদল যে কাপ পেতেন তার নাম ছিল জুলে রিমে কাপ। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে উপর্যুপরি তিনবারের বিজয়ীদল চিরকালের

হতো কাপটি নিজেদের কাছে রাখতে পারে। ১৯৭০ সালে ব্রাজিল যখন পর পর তিনবার জুলে রিমে কাপ জিতে নিলো তখন তারা চিরকালের জন্য কাপটি নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল। এর পূর্বে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে ব্রাজিল বিজয়ী হয়েছিল। তারপর আবার নতুন ক'রে নির্মিত হলো বিশ্বকাপ এবং তার নামকরণ করা হলো ফিফা কাপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে বসেছিল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার আসর। তখন ব্রাজিলের রায়ো ডি জনিরো শহরে মারাকানা নদীর কাছে নির্মিত হয়েছিল মারাকানা স্টেডিয়াম। দু'লক্ষ দর্শকাসন সমেত এই স্টেডিয়াম পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম। যাইহোক, ব্রাজিল কিন্তু তার নিজের দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ১৯৫০ সালে উরুগুয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ফাইনাল খেলায় দর্শক সংখ্যা সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে ১,৯৯,৮৫৪-তে পৌঁছেছিল।

বিশ্বকাপের প্রথম বছর ১৯৩০ সাল থেকে প্রতি বছরের ফাইনাল খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হলো ঃ—

সাল	স্থান	বিজয়ী দেশ	বিজিত দেশ	গোলের সংখ্যা
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেণ্টিনা	৪-২
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোশ্লোভাকিয়া	২-১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	হাঙ্গেরি	৪-২
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	২-১
১৯৫৪	সুইজারল্যাণ্ড	পশ্চিম জার্মানি	হাঙ্গেরি	৩-১
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল	সুইডেন	৫-২
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩-১
১৯৬৬	ইংলণ্ড	ইংলণ্ড	পশ্চিম জার্মানি	৪-২
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	ইতালি	৪-১
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	পশ্চিম জার্মানি	হল্যাণ্ড	২-১
১৯৭৮	আর্জেণ্টিনা	আর্জেণ্টিনা	হল্যাণ্ড	৩-১
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	৩-১

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত যতো খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে নিঃসন্দেহে ব্রাজিলের পেলে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক

সোভিয়েত রাশিয়ার লেভ্ ইয়াসিন বলেছেন যে, পেলেই ফুটবল খেলার শেষ কথা। অর্থাৎ তিনিই হলেন সর্বোচ্চ ধাপের মান, বা ফুটবলের এভারেস্ট।

পেলে তাঁর খেলোয়াড় জীবনে গোল দিয়েছেন ১৩০০ শত। পেলে ছাড়াও বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যে ফুটবল খেলোয়াড়দের নাম অমর হয়ে থাকবে তাঁদের কয়েকজনের নাম হলো—ব্রাজিলের গ্যারিঞ্চা (উড়ন্ত পাখি নামে খ্যাত)—এঁকে পেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

পুসকাস—হাঙ্গেরির এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের ক্রীড়া চাতুর্য দেখে ফুটবলের বনেদী ঘরানা ইংলণ্ডকে ফুটবলের প্রথা প্রকরণ পরিবর্তন করার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল।

ডি, স্টিফানো—আর্জেণ্টিনার এই খেলোয়াড় বিশ্ব-শ্রেষ্ঠদের অন্যতম। ইংলণ্ডের সর্বকালের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় স্ট্যান্‌লি ম্যাথুজ, ববি মুর ও ববি চার্লটনের নাম চিরস্মরণীয়।

ইউসেবিও—পর্তুগালকে বিশ্বের ফুটবল আসরে সম্মানের আসনে বসানোর কৃতিত্বের অধিকারী এই খেলোয়াড় তাঁর অনন্য ক্রীড়াভঙ্গীর জন্য "ব্ল্যাক প্যান্হার" নামে পরিচিত ছিলেন।

বেকেনবাওয়ার—পশ্চিম জার্মানির এই অসাধারণ খেলোয়াড় সমগ্র দলকে নিজের কাঁধে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখতেন। ইনি বিশ্বের চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ "মিড্ ফিল্ড্" খেলোয়াড়।

গার্ড মুলার—ইনিও পশ্চিম জার্মানির তথা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়-দের সারিতে স্থান পেয়েছেন।

জোহান ক্রুয়েক—হল্যাণ্ডের এই খেলোয়াড় বিশ্ব-কাপের খেলায় অনন্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

রাশিয়ার লেভ্ ইয়াসিন, ইংলণ্ডের গর্ডন ব্যাংক্স এবং পশ্চিম জার্মানির সেপ মেয়ার—এই তিনজনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলকীপার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এঁদের বিরুদ্ধে পেনাল্টি সটেও গোল দেওয়া দুরূহ ব্যাপার।

ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলা ইংলণ্ডের পূর্বে আর কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে সেখানেও এর সঠিক জন্মকাল সম্পর্কে কিছু বলা কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অক্সফোর্ড লাইব্রেরিতে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় সন্ন্যাসীর ক্রিকেট খেলার এক বিবরণ পাওয়া গেছে। এর পূর্বেকার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি আজও

পর্যন্ত। ষোলো শতকে ইংলণ্ডে প্রকাশিত গিল্ড ফোর্ডের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গিল্ড ফোর্ড গ্রামার স্কুলের ছেলেরা তখন ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। বলাই বাহুল্য, তৎকালীন ক্রিকেটের রূপ অন্যরকম ছিল। মোটামুটি এই সময়েই ক্রিকেট খেলার নিয়ম কানুনের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে নিয়মগুলি তৈরি করা হয় তাতে দেখা যায় যে, ক্রিকেটের স্টাম্প ছিল তখন অনেকটা ছোট আকারের গোল পোস্টের মতন। তিনটির বদলে দুটি ২২ ইঞ্চি উঁচু স্টাম্পের উপরে গোল পোস্টের ক্রসবারের মত একটি বেল রাখা হতো।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ক্রিকেট ক্লাবের নাম সম্ভবত হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাব। জানা গেছে যে, ১৭৭৫ সালের মে মাসে এই ক্লাবটি লণ্ডনের আর্টিলারি মাঠে কেণ্ট দলের বিরুদ্ধে একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল। প্রতি দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। এই সময়কার বিভিন্ন ক্রিকেট খেলার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ রকম স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে বল চলে গেল কিনা এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হতো। যার ফলে, ১৭৭৬ সালে নিয়ম করা হলো যে, দুটির বদলে আরেকটি স্টাম্প বসানো হবে মাঝখানে।

হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাবের কাছে ক্রিকেট খেলার অফুরন্ত ঋণ। ক্রিকেটকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় করায় এই ক্লাবের অবদান অসামান্য। ১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব।

ধীরে ধীরে ক্রিকেট খেলা তার জন্মস্থান ইংলণ্ডের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়, তবে অন্যান্য জনপ্রিয় খেলাগুলির মতো এর প্রসার সর্বত্র হয়নি। ইংলণ্ডের বাইরে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এখনও পর্যন্ত এই খেলা সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে, অন্যান্য কয়েকটি দেশেও ক্রিকেট খেলার কিছু কিছু প্রচলন হয়েছে, তবে তার মান নিতান্ত নীচু অতএব উল্লেখের অযোগ্য।

এক দেশের সঙ্গে যখন অপর দেশের ক্রিকেট খেলার নাম টেস্ট ম্যাচ। সাধারণত, টেস্ট খেলা পাঁচদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। টেস্ট খেলার প্রায় সমান্তরাল ভাবে আরেক রকমের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় প্রতি দলের ইনিংস ৬০ ওভারের খেলায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই প্রতিযোগিতার নাম প্রুডেনসিয়াল কাপ। ১৯৭৫ সালে এর সুরু। প্রতি চার বছর অন্তর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দু'বারের বিজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তৃতীয়বারে

ভারত। ক্রিকেটকে যাঁরা করেছেন রমনীয়, রাজকীয় ও এক দক্ষতা-নির্ভর ক্রীড়া তাঁদের কয়েকজনের নাম এই গ্রন্থের অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা হলেন ইংলণ্ড ও ভারতের খেলোয়াড়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কিছু খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ না করলে সে তালিকা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান হলেন বিশ্ব-ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি ব্যাটিং-এর দাপটে মাত্র ৫২টি টেস্ট খেলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ২৯টি এবং টেস্ট ম্যাচে একদিনে ৩০০ রান করার নজীর রেখেছেন—যাঁর কথা বলতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-সাহিত্যিক নেভিল্ কার্ডাস আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, ব্র্যাডম্যানের মতো আরও কয়েকজনের আবির্ভাব হ'লে ক্রিকেট তার গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেতাব খোয়াবে, কেননা ব্র্যাডম্যান মানেই রানের বন্যা। তাঁর টেস্ট খেলায় রানের গড় ৯৯।

অরেকজন হলেন ভিক্টর ট্রাম্পার। রাজকীয় কায়দার এই ব্যাট্‌সম্যান সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম। ইনি প্রায়ই নিজের দলের পরবর্তী খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-এর সুযোগ ক'রে দেবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের উইকেট বিসর্জন দিতেন। নইলে, সে বেচারারা তো ব্যাট হাতে নিয়ে ক্রিজে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে না।

অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান ম্যাক্‌কেব ছিলেন এমন এক জোরালো ব্যাট্‌সম্যান যিনি পড়ন্ত বেলায় উইকেটে থাকলে বিপক্ষ দলের ফিল্ডাররা আম্পায়ারের কাছে খেলা বন্ধ করার আবেদন জানাতেন কারণ তাঁর ব্যাটের মার খেয়ে বল এত তীব্র বেগে ছুটতো যে, ফিল্ডাররা প্রায়ই দেখতে পেতেন না।

পরবর্তীকালের ওপেনিং বোলার জুটি লিন্‌ডওয়াল ও মিলার বলের বেগের জন্য বিশ্ব-ত্রাস আখ্যা পেয়েছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে তাঁর ব্যাটিং দক্ষতার জন্য ব্ল্যাক ব্র্যাড-ম্যান নামে অভিহিত হতেন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরিদের নাম ওরেল, উইকস ও ওয়ালকট এবং অবশ্যই সোবার্স ও ভিভিয়ান রিচার্ড। এঁদের মধ্যে সোবার্স বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্‌ডার খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আর, ভিভিয়ান রিচার্ড সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের সারিতে স্থান ক'রে নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম যুগের খেলোয়াড় লিয়েরি কনস্ট্যানটাইন বোলিং ও ফিল্ডিং-এ আশ্চর্য নিপুণ ছিলেন।

ক্রিকেট এক স্বতন্ত্র পদ্ধতির খেলা। একমাত্র বেস্‌বল ব্যতীত সম্ভবত অপর কোনো খেলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায় না। প্রায় সব

খেলাতেই গতির গুরুত্ব ও প্রাধান্য সর্বাধিক, কিন্তু ক্রিকেটে গতির সঙ্গে ধীরতাও বিদ্যমান। অনেক সময়, ব্যাটিং-এ ধীরতার আশ্রয় নিয়ে খেলা ড্র ক'রে মান বাঁচাতে হয়। অর্থাৎ, তখন অগতিই হয় একমাত্র গতি। বোলিং-ও দু'রকম তো আছেই, দ্রুতলয় ও বিলম্বিত লয়। যারা দুরন্ত দ্রুত বোলার তাঁরা যেমন ভীতি সঞ্চারক, তেমনি আবার ধীরগতি সম্পন্নরা আঙ্গুল ও কব্জির নানারকম মোচড়ের কৌশলে চৌকস ব্যাটসম্যানকেও পযর্দস্ত করে ফেলে।

এছাড়া, ক্রিকেটই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যাপি খেলা হয়। পাঁচদিনের খেলা আর কোনো খেলায় প্রচলন নেই।

আরও আছে অসাদৃশ্য। অপর কোনো খেলায় খেলা চলাকালীন দুই প্রতিপক্ষের ক্রীড়াধারায় এমন তফাৎ নেই। একপক্ষের কাজ ব্যাটিং অপর পক্ষের বোলিংসহ ফিল্ডিং।

ক্রিকেট খেলা প্রথমে ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে, খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণও যোগ দেয় এই চিত্তাকর্ষক খেলায়।

ব্যাটসম্যানরা যে সব মার মারে তার নাম হলো, ড্রাইভ, কাট্, পুল, হুক, গ্ল্যান্স, ফ্লিক্ ইত্যাদি। আর বিভিন্ন ধরণের বোলিং-এ আছে ইন সুইং, আউট সুইং, অফ্ স্পিন, লেগ স্পিন, টপ্ স্পিন, গুগলি ইত্যাদি। গুগলিং বোলিং-এর আবিষ্কর্তা হলেন অক্সফোর্ড ও মিডলসেক্সের বোলার বোসান কোয়েট। আবিষ্কর্তার নামানুসারে গুগলিং বোলিংকে একদা বসি বোলিং বলারও প্রচলন ছিল।

আধুনিক ক্রিকেট শারীরিক পটুতা, শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশলের সমন্বয়ে এক শিল্পমণ্ডিত খেলা। যার ফলে, ক্রিকেট সম্পর্কে লেখা গ্রন্থগুলি প্রায়ই সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। বলতে গেলে, ক্রিকেট বিষয়টি সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

হকি খেলার জন্ম ইতিহাসের সঠিক কাল নিরূপণ করা কিঞ্চিৎ অসুবিধা হলেও খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে যে হকি খেলার অস্তিত্ব ছিল তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে

হকি

খেলার নিয়মাবলী তখন কিরকম ছিল তা জানার কোনও উপায় নেই। কিন্তু হাতে হকি স্টিক ও সামনে বল—এইরকম ভঙ্গীর কিছু খেলোয়াড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে প্রাচীন এথেন্সের দেওয়ালের গায়ে। সেগুলি নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত ৫০০ বছর

পূর্বে। ১৯৪২ সালে বিধ্বস্ত নগরী এথেন্সের মাটি খনন করে পাওয়া গেছে মন্দিরের গায়ে তৎকালীন হকি খেলার ছবি। সেখানে দেখা যায় দুজন খেলোয়াড় অবিকল আধুনিক কায়দায় "বুলি" করায় উদ্যত। এ ছবি শ্বেত পাথরের গায়ে খোদাই করা চিত্র। এই মহামূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনটি কোপেনহ্যাগেনের জাতীয় যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

ক্রীড়া-ইতিহাসবিদদের ধারণা, এথেন্সের পূর্বে পারস্য দেশে হকি খেলা প্রচলিত হয়েছিল এবং সেখান থেকেই গ্রীস ও রোমে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স ও বৃটেনে হকির আগমন ঘটে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডে "শিণ্টি" নামে একপ্রকার হকি খেলা প্রচলিত ছিল। আয়ারল্যাণ্ডেও কয়েক শত বছর পূর্বে হকি খেলা হয়েছে বলে জানা যায়। সেখানে হকির নাম ছিল "হার্লি।" শোনা যায় "হার্লি" ছিল তাদের জাতীয় খেলা। ভারতের দক্ষিণভাগে "খিদ্দো কুন্ডি" নামে একটি খেলা প্রচলিত ছিল। খেলোয়াড়রা বাঁকানো লাঠি আর তূলো দিয়ে তৈরি বল দিয়ে এই খেলাটি খেলতো কয়েক শত বছর পূর্বে। হকির সঙ্গে খিদ্দো কুন্ডির সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায়না।

মধ্যযুগে ফ্রান্সে হকেট নামে যে খেলাটি প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে গ্রেটবৃটেনে তারই নাম দেওয়া হয় হকি। ফরাসী ভাষায় হকেট শব্দটির অর্থ হলো মেষপালকের লাঠি।

হকির আদি জন্মস্থান ও জন্মকাল যথাক্রমে কোথায় এবং কখন তার কোনও তথ্য সংশয়াতীতভাবে আজও প্রমাণিত হয়নি। তবে একথার নিঃসংশয় ঘোষণায় কোনও বাধা নেই যে, আধুনিক কালের হকি খেলা উনিশ শতকে ইংলন্ডেই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়।

১৮৭৬ সালে ইংলণ্ডের কয়েকটি হকি ক্লাবের উদ্যোগে একটি হকি ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং তার ঠিক সাত বছর পরে ১৮৮৩ সালে লণ্ডনের উইম্বলডন হকি ক্লাব একটি কমিটি গঠন করে হকি খেলার নিয়মাবলী প্রণয়ন করে লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। হকি খেলার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর ১৮৮৬ সালে সমগ্র বৃটেনের হকি খেলা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবেই আধুনিক হকির জন্ম হয়। এই সংগঠনের নাম ছিল বৃটিশ হকি অ্যাসোসিয়েশন এবং এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন করার জন্য এর সভাপতি পদে রাখা হয় ইংলণ্ডের তৎকালীন যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডকে।

সমগ্র বিশ্বের হকি খেলা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য ১৯০০ সালে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বৃটেনে মেয়েরাও হকি খেলা সুরু করে এবং অল্পদিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৯৫ সালে গঠিত হয় সর্ব ইংলণ্ড মহিলা হকি অ্যাসোসিয়শন।

আধুনিক হকি খেলা ইংলণ্ডে জন্মলাভ করলেও এ খেলার মানকে ইংলণ্ড প্রথম যুগে উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত, আধুনিক হকির প্রথম যুগে ইউরোপের যে কয়টি দেশে হকি খেলা প্রচলিত ছিল তার কোনোটিতেই খেলার মান উন্নত ছিল না। ১৯২৮ সালে ভারতীয় দলের অলিম্পিকে প্রথম যোগদানের ফলে ইউরোপ সবিস্ময়ে দেখল হকি খেলার মান কত উঁচুতে তোলা সম্ভবপর। এর পূর্বে অলিম্পিকে হকি স্থান পেয়েছে মাত্র দু'বার—১৯০৮ ও ১৯২০ সালে যথাক্রমে লণ্ডনে এবং অ্যাণ্টোয়ার্পে। প্রথমবারে ছয়টি এবং দ্বিতীয় বারে মাত্র চারটি দেশ যোগ দিয়েছিল। ইংলণ্ড দুবারই জয়ী হয়। ১৯২৮ সালে ভারত বিজয়ী হবার পরে ভারতের খেলার উন্নত মান লক্ষ্য করে অন্যান্য দেশগুলি নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে পড়ে। যার ফলে, অলিম্পিক থেকে হকি উঠে যাবার জোগাড় হয়। ভাগ্যিস, আনাড়ি আমেরিকা আর জাপান যোগদান করতে রাজি হলো। নইলে ১৯৩২ এর লস্ এ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের আসরে হকি বাদ হয়ে যেতো। অবশ্য, অন্যান্য দেশগুলি ভারতের কাছে আবার পর্যুদস্ত হয়ে অপমানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি দেশ—ভারত, জাপান ও আমেরিকা-কে নিয়েই লস্ এঞ্জেলসের অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। বলা বাহুল্য, ভারত জয়ী হয়েছিল। জাপানকে ১১ গোল এবং আমেরিকাকে ২৪ গোল দিয়েছিল।

বর্তমানে হকির মান উন্নত হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। অন্যান্য দেশ-গুলি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে লেগে প্রচণ্ড অনুশীলন করে নিজেদের মান উন্নত করে নিয়েছে। যার ফলে ভারতের সুদীর্ঘকালের হকির প্রাধান্য অন্তর্হিত হয়েছে। এছাড়া, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ভারত তার নিজস্ব ক্রীড়া কৌশল পরিত্যাগ করে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে।

তুষার হকির জন্ম হয়েছে সম্ভবত পূর্ব কানাডায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। সাধারণ হকি খেলার নিয়মেই চলে এই খেলা, তবে মাঠে

নয়, তুষারের বুকে। নামেই বোঝা যায়, এটা শীতের দেশের শীতকালীন **তুষার হকি** খেলা। এই জন্যই তুষার হকি কানাডা, বৃটেন, রাশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্কে এত প্রচলিত। মাঠের হকির চেয়ে তুষার হকি অনেক কঠিন খেলা। শক্তি সামর্থ্যও অধিক প্রয়োজন এই খেলায় আর দর্শকরা তুষার হকি দেখে যেমন মুগ্ধ হন তেমনি হয়ে ওঠেন শিহরিত। ১৯২০ সাল থেকে শীতকালীন বিশ্ব অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তুষার হকি।

উনিশ শতকে অন্যান্য অনেক খেলার মত রাগবিরও জন্মস্থান ইংলন্ডের বুকে। রাগবি খেলার উৎস হলো ফুটবল। ফুটবল মাঠের একটি ঘটনাকে **রাগবি** কেন্দ্র করেই এ খেলার উৎপত্তি। একবার ইংলণ্ডের রাগবি স্কুলে ফুটবল খেলার সময় উইলিয়ম ওয়েব নামে ঐ স্কুলেরই একটি ছাত্র লাফিয়ে আসা একটি বলকে সুটিং করতে অসুবিধা বোধ করে হাত দিয়ে বলটি তুলে নিয়ে দৌড় সুরু করে। ছাত্রটির নিয়ম বহির্ভূত এই কাজটি অনেকের কাছেই বেশ কৌতূককর মনে হয়। এই ঘটনাটিই রাগবি খেলার জন্মদাতা।

শীতের দিনে ইনডোর খেলার জন্য আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ড কলেজের ডঃ জেমস্ নাইস্মিথ ১৮৯১ সালে বাস্কেটবল খেলাটি আবিষ্কার করেন। **বাস্কেটবল** জিমনাসিয়ামের দুদিকের দেওয়ালে পিচফলের ঝুড়ি টাঙিয়ে আর একটি ফুটবল দিয়ে নাইস্মিথ খেলাটি সুরু করে দেন। ঝুড়ির মধ্যে বল ফেলতে পারলেই এক পয়েণ্ট। ১৮৯২ সালে নাইস্মিথ এবং তাঁর বন্ধু অ্যালেন্ জোকে নিয়ে দু'টি দল গঠন করে স্প্রিংফিল্ডের শারীর শিক্ষার এক কনফারেন্সে সমাগত বিভিন্ন স্থানের ওয়াই, এম, সি, এ-র ডিরেক্টরদের সম্মুখে এই নব আবিষ্কৃত খেলাটি প্রদর্শনী খেলা হিসাবে উপস্থিত করেন। তাঁরা সকলেই এক বাক্যে খেলাটির প্রশংসা করেন। তারপর থেকেই বাস্কেটবল খেলা দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষত এই ডিরেক্টরদের প্রচেষ্টায়।

প্রথম যুগের বাস্কেটবল খেলার সঙ্গে আধুনিক বাস্কেটবলের অমিল অনেক। তখন খেলার কোর্ট আকারে অনেক ছোট ছিল এবং খেলোয়াড়রা প্রায় খুশি মতন দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতো। কনুইয়ের গুঁতো আর মুষ্টিবদ্ধ ঘুসির অবাধ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যার জন্যে মুখোসের আবরণ ছিল অপরিহার্য।

বাস্কেটবল খেলা আবিষ্কারের ৬ বছরের মধ্যেই ১৮৯৭ সালে আমে-

রিকায় প্রথম বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে নাইস্মিথ বাস্কেটবল খেলার যে নিয়মগুলি প্রবর্তন করে ছিলেন সেগুলি ১৯১৫ সালে একটি সম্মিলিত বাস্কেটবল নিয়মের কমিটির দ্বারা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশন। সেই বছরই এই ফেডারেশন খেলার নিয়মগুলি পুনরায় সংশোধন করেন।

১৯৩৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে স্থান পেয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। নাইস্মিথ ১৯৩৯ সালে পরলোক গমন করেন। আধুনিক বাস্কেটবল পৃথিবীর অন্যতম দ্রুততম খেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা জেমস্ নাইস্মিথের জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতিকে সম্মানিত করার জন্য তাঁর নামে একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

ভলিবল খেলার জন্মস্থান আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের হেলিওক ওয়াই, এম, সি, এ-র শারীর শিক্ষার ডিরেক্টর উইলিয়ম জি, মরগ্যান ১৮৯৫ সালে

ভলিবল

এই চিত্তাকর্ষক খেলাটির আবিষ্কারক। বাস্কেটবল খেলা আবিষ্কার হওয়ার পরে তিনি এই খেলাটি ওয়াই, এম, সি, এ-তে প্রচলিত করার চেষ্টা করেন।

ঐ সময় আমেরিকায় একটি ৭ ফুট উঁচু জালের উপর দিয়ে কাপড়ের তৈরি বল পারাপার করার খেলা প্রচলিত ছিল। খেলার নাম ছিল মিণ্টন। খেলোয়াড়রা হাতের র‍্যাকেট দিয়ে বল জালের ওপারে পাঠাতো। মরগ্যান এই খেলাটিকে ভিত্তি করে ভলিবল খেলা সুরু করলেন। তিনি প্রথমেই এই খেলা থেকে বাদ দিলেন র‍্যাকেট এবং কাপড়ের বল। বাস্কেটবলের ব্লাডার হাত দিয়ে থাপ্পড় মেরে অথবা অন্যভাবে আঘাতের সাহায্যে জালের ওপারে পাঠানো হতো। জিমনাসিয়ামের মধ্যেই মরগ্যান সুরু করে দিলেন খেলাটি। খেলার নাম দিলেন মিণ্টোনেট। বাস্কেটবলের ব্লাডার বেশি হাল্কা হওয়ায় বেশ অসুবিধা দেখা দিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্লাডারকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে খেলা প্রায় অসম্ভব। এই সময় এক ক্রীড়া-সরঞ্জাম ব্যবসায়ী ফুটবলের চেয়ে খানিকটা আকারে ছোট এবং ওজনে হাল্কা একরকম বল তৈরি করে দিলেন চামড়া দিয়ে। এই বল খেলোয়াড়দের কাছে খুবই উপযোগী মনে হলো।

খেলাটির নাম মিণ্টোনেট থেকে ভলিবলে রূপান্তরিত করেন আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ড কলেজের শারীর শিক্ষক ডঃ এ, টি, হ্যালস্টেড।

যেহেতু বল মাটিতে পড়ার পূর্বেই মারার নিয়ম সম্ভবত সেই কারণেই তিনি একে ভলিবল নামকরণ করেছিলেন।

প্রথম যুগে এ খেলায় খেলোয়াড়রা এক হাতে বল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারতো তবে জালের চারফুটের মধ্যে ঐভাবে যাবার অনুমতি ছিল না। সার্ভিস করার সময় বলটিকে পিছন থেকে অন্তত দশ ফুট পাঠাতে পারলেই চলতো এবং নিজের দলের উপর যে কোনও খেলোয়াড়ের সেটিকে অপর পারে পাঠানোর ক্ষমতা ছিল।

প্রতি দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় অনেক খেলোয়াড় একত্রে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারতো।

বর্তমানে ভলিবল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং অলিম্পিকের অন্তর্গত হওয়ায় সারা বিশ্বে এর প্রসার হয়েছে। আধুনিক ভলিবলে দক্ষতা অর্জনের জন্য জিমনাস্টিকের ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন। এই খেলায় আমেরিকা এবং রাশিয়াই বর্তমানে শীর্ষে আছে।

টেনিস

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে "লে-পম্" যে খেলাটি প্রচলিত হয়েছিল ক্রীড়া-ঐতিহাসিকদের মতানুসারে যদিও সেটাই প্রথম টেনিস খেলা, তথাপি প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের একটি খেলার খবর পাওয়া যায়। আবার দশম শতাব্দীতেও স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে একরকম খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় যার সঙ্গে টেনিসের আত্মীয়তা দৃশ্যমান। কেউ কেউ মনে করেন, এই খেলাটিই বর্তমান টেনিসের জন্মদাতা।

লে-পম্ খেলায় প্রথম যুগে কর্ক অথবা লোমশ চর্মাবৃত বল ব্যবহৃত হতো। তিন ফুটের মতন উঁচু কোনও ঢিবির উপর দিয়ে হাত দিয়ে সেই বলটি খেলোয়াড়দ্বয় এপার ওপার করে খেলা করতো। পরবর্তীকালে এলো র‍্যাকেট, ফোলানো সাদা বল আর ঢিবির বদলে জাল। প্রসঙ্গত, প্রায় সমসাময়িক কালেই চীনদেশেও অনুরূপ একটি খেলার প্রচলন ছিল।

চোদ্দ শতকে যখন লে-পম্ খেলার আরও খানিকটা উন্নতি হয় তখন ইংরেজরা ফরাসী শব্দ "টেনেজ" থেকে খেলাটির নব নামকরণ করলেন "টেনিস।" ফরাসী ভাষায় টেনেজ শব্দের অর্থ "খেলা সুরু কর।" আর, লে-পম্ শব্দে বোঝায় হাতের সাহায্যে কোনও একটি খেলা। এই সময় ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা টেনিস খেলায় তাঁদের অনেকখানি সময় অতিবাহিত করতেন। ষোলো এবং সতেরো শতকে টেনিস খেলা এই দুই দেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে তখনও অভিজাতশ্রেণীর সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এই কারণেই

টেনিসকে তখন বলা হতো—রাজকীয় টেনিস।

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই খেলাটিকে নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ১৮৭৩ সালে মেজর ওয়াল্টার উইংফিল্ড নামে এক ইংরেজ সামরিক অফিসার ঘাসের কোর্টে টেনিস খেলার প্রচলন করলেন। এর পূর্বে সাধারণত ধনী লোকদের নিজেদের বাড়ীর বাঁধানো অঙ্গনেই খেলার ব্যবস্থা ছিল। উইংফিল্ড টেনিস খেলার কতকগুলি সাধারণ নিয়মও প্রবর্তন করলেন। তবে তিনি সেই সঙ্গে টেনিস খেলার নামটিও বদল করে রাখলেন—"স্ফেইরিস্টাইক।" অবশ্য, এই নামের অল্প দিনেই মৃত্যু ঘটে, তবে বেঁচে থাকে কিছু নিয়ম ও ঘাসের কোর্টের খেলা। ঘাসের উপরে খেলার জন্য এর নাম হয়ে গেল লন টেনিস। এটাই হলো আধুনিক টেনিসের জন্মলগ্ন। খেলার প্রসারের সঙ্গে বৈচিত্র এলো কোর্টেরও। মাটি, কংক্রিট, মোরাম, এ্যাস্ফল্ট্ সব রকমের তৈরি কোর্টেই খেলা সুরু হলো।

টেনিসের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮৮ সালে বৃটেনে লন টেনিস এ্যাসোসিয়শন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন।

টেবল টেনিস খেলার বয়স ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কিংবা টেনিসের মত অতটা হয়নি। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির মতানুসারে এই খেলাটি বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় খানিকটা গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর পূর্বে নিতান্তই সখের খাতিরে বলতে গেলে মজা হিসাবে খাওয়ার টেবিলের উপরে দুটি কাঠের র‍্যাকেট দিয়ে কেউ কেউ এ খেলা খেলতো। তখন র‍্যাকেটে রাবার ছিল না। বল ছিল কর্কের তৈরি। আর খেলাটির নাম ছিল পিং পং। টেনিস খেলার নিয়মই অনুসৃত হতো। সম্ভবত, ইংলণ্ডই এই খেলার জন্মস্থান। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। জাপানের দাবি হলো যে, অতি প্রাচীন কালে তাদের দেশে পিং পং খেলা প্রচলিত ছিল।

টেবল টেনিস

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে পিং পং অ্যাসোসিয়শন গঠিত হয়। এর পূর্বে এ খেলার কোনও অ্যাসোসিয়শনের নাম পাওয়া যায় না। অতএব, এটিকেই প্রথম পিং পং অ্যাসোসিয়শনের স্বীকৃতি দেওয়া যায়। তবে অচিরেই, অর্থাৎ মাত্র তিন বছর পরেই এই অ্যাসোসিয়শনের অকাল মৃত্যু হয়। পুনরায় ১৯২১-২২ সালে এর

পুনর্জন্মের সময় পিং পং নামটি মুছে ফেলে তার স্থানে টেবল টেনিস নাম বসানো হয়। গত শতাব্দীতে আমেরিকাতেও "হুইফ্-হোয়াফ্" নামে এই জাতীয় একটি খেলার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

টেবল টেনিস খেলাটি যে ইংলণ্ডেই প্রথম আধুনিক রূপ ধারণ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ফাঁপা সেলুলয়েডের বল আর রাবার বসানো কাঠের র‍্যাকেটেরও আবিষ্কর্তা হলেন যথাক্রমে মিঃ গুড্স ও মিঃ গিব্স নামে দুই ইংরেজ সন্তান।

ধীরে ধীরে সুরু হলো রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক ক্রীড়াধারা এবং অল্প দিনের মধ্যেই টেবল টেনিস খেলা একটি জনপ্রিয় ইন্ডোর খেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। যারাই একবার র‍্যাকেট হাতে সুরু করলো এই খেলা তারাই চুম্বকের মতো এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলো। সুতরাং এর ব্যাপক প্রচলনে বিলম্ব দেখা যায়নি।

১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন। এই ফেডারেশনে প্রতিনিধি থাকলেন নিম্নলিখিত দেশগুলি থেকে—অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, ইংলণ্ড, জার্মানি, ওয়েলস্, সুইডেন এবং ভারত।

আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হবার এক বছর পরেই টেবল টেনিস বিশ্ব প্রতিযোগিতার প্রথম উদ্বোধন হয়। লণ্ডনের একটি বড় হল ঘরে ৭টি দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার গোড়া-পত্তন হয়। সিঙ্গলসে পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২ ও ১৪। দলগত খেলায় ভারত ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছিল তবে শীর্ষস্থানে ছিল হাঙ্গেরি।

হাঙ্গেরির ভিক্টর বার্নার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত টেবল টেনিস খেলায় প্রধান অস্ত্র ছিল টপ্স্পিন, হাফ-ভলি এবং চপ সট। বার্না এসে টেবল টেনিস খেলাকে নতুন মর্যাদায় মণ্ডিত করলেন। এক আশ্চর্য গতিময়তা ও সাবলীলতা এনে খেলাটিকে তিনি দক্ষতার এক অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত করলেন যেখানে পেঁছাতে গেলে প্রয়োজন হতো অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৌশল। এছাড়া, বার্না তৎকালীন রাবার-র‍্যাকেট খেলার সবচেয়ে কার্যকর স্ট্রোক ব্যাক-হ্যাণ্ড ফ্লিকের আবিষ্কর্তা হয়ে টেবল টেনিস খেলার ইতিহাসে অমর হয়ে বিরাজ করছেন। বার্নার সমসাময়িক আরেক উজ্জ্বল রত্নের নাম ইংলণ্ডের রিচার্ড বার্গম্যান।

প্রসঙ্গত, এঁরা দুজন ১৯৪৯ সালে ভারতে এসে নিজেদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গিয়েছিলেন।

বস্তুত, বার্নাই সর্বপ্রথম রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক খেলার সার্থক সংমিশ্রণ করেন এবং খেলাটিকে পিং পং থেকে টেবল টেনিসে রূপান্তরিত করার তিনিই সবচেয়ে বড় কারিগর হিসাবে চিহ্নিত।

১৯৫২ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্বপ্রতিযোগিতায় জাপানের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই টেবল টেনিসে দু'টি নতুন জিনিসের উদয় হলো, পুরু স্পঞ্জ মোড়া র‍্যাকেট ও পেন হোল্ডার গ্রিপ। ১৯৫৯ সালে আবার এক নতুন ধরণের র‍্যাকেট তৈরি হলো। তার নাম স্যানড্‌উইচ র‍্যাকেট। এই র‍্যাকেটই বর্তমানেও প্রচলিত। এই র‍্যাকেট তীব্র স্পিন, প্রচণ্ড গতিবেগ ও জোরালো মারের সহায়ক। খেলার কৌশল ও ধরণও আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এই আধুনিক পদ্ধতির কার্যকর ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তবে একথা মানতেই হবে দর্শকের কাছে বার্না প্রবর্তিত সেই সনাতন পদ্ধতি ছিল অধিক আকর্ষণীয়। পুরানো পদ্ধতির খেলায় ছিল দীর্ঘ র‍্যালি। তাতে প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে অসাধারণ রক্ষণের নিপুণতা রীতিমত শিল্প সৃষ্টি করতো। দর্শকরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই র‍্যালি-প্রধান খেলা উপভোগ করে পরম তৃপ্তি পেত। বর্তমানের খেলা তীব্র বেগ এনে দিয়েছে, তবে কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

ব্যাডমিন্টন

নামটি ইংরেজির মতন হলেও ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তি কিন্তু আমাদের এই ভারতের বুকে। ভারতে এ খেলার নাম ছিল "পুনা।"

গত শতাব্দীতে যে ইংরেজ সামরিক অফিসাররা ভারতে বসবাস করছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এই খেলাটির চর্চা সুরু করে। নিতান্তই সময় অতিবাহিত করা কিংবা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই পুনা খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে ঐ অফিসাররা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে এই খেলা সুরু করেন। খেলাটির নূতনত্বে ও চিত্তাকর্ষকতায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। তারপর একদিন ডিউক অভ্ বিউফোর্ট গ্লসেস্টারশায়ারে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই পল্লী গ্রামটির নাম হলো ব্যাডমিণ্টন। সেখানেই তিনি এই খেলাটির আয়োজন করলেন এবং তার থেকেই এই পুনা খেলা তার নতুন নাম পেলো ব্যাডমিণ্টন।

১৮৮৫ সালে ইংলণ্ডে ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়শন খেলাটির নিয়মাবলী

লিপিবদ্ধ করে। এখনও পর্যন্ত মূলতঃ সেই নিয়মেই খেলা পরিচালিত হয়ে চলেছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাডমিণ্টন খেলা ইংলণ্ডের সীমা অতিক্রম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, মালয়, সুইডেন, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সারা ইউরোপ ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রচলিত হয় এবং তিরিশ দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন। ১৯৩৯ সালে এই ফেডারেশন বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জয়লাভ করে মালয়।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভাপতি স্যার জর্জ এ, টমাস বিজয়ী দলকে একটি কাপ প্রদান করেন। তাঁর নামানুসারে এই কাপের নাম হয় টমাস কাপ। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী টমাস কাপের খেলা হয়। যদিও এটি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা কিন্তু টমাস কাপ প্রতিযোগিতা নামেই অধিক পরিচিত।

টমাস কাপের খেলা ১৯৪৮-৪৯ সালে সুরু হলেও কাপটি কিন্তু ১৯৩৯ সালেই তৈরি হয়েছিল কারণ তখনই এই প্রতিযোগিতা সুরু হবার কথা ছিল। সুদৃশ্য এই কাপটি উচ্চতায় ২৮ ইঞ্চি এবং এর ব্যাস ১৬ ইঞ্চি। কাপটির ঢাকনায় একজন ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের মূর্তি লাগানো আছে। আর, কাপের নীচের অংশে কাপের দাতার নাম, প্রতিযোগিতার নাম এবং ১৯৩৯ সাল খোদিত করা আছে।

ব্যাডমিণ্টন খেলার চিরাচরিত শাট্‌লককের বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পাখির পালকের বদলে এক প্রকার সিন্থেটিক বস্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিটি শাট্‌লককের পরমায়ু বেড়ে গেছে প্রায় দশগুণ। অবশ্য, ওজন এবং অন্যান্য গুণাগুণের কোনও তারতম্য ঘটেনি। অতএব, খেলোয়াড়রাও কোনও রকম অসুবিধা বোধ করছেন না। প্রসঙ্গত, ভারতে এই শাট্‌লককের খেলা এখনও বহুল প্রচলিত হয়নি। হ'লে তখন আর ব্যাডমিণ্টন খেলা এখনকার মত প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ থাকবে না।

পরিসমাপ্তি

শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে অসংখ্য আলোচনায় ও উপদেশে অনেক লেখকের অজস্র কালি ব্যয় হয়েছে। সে সব বক্তব্যের কোন বিকল্প নেই। তাঁরা লিখেছেন, শারীর শিক্ষা মানুষকে শক্তি সামর্থ্যে ভরপুর করে এবং তার দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-গুলির অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলি ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে নীরোগ রাখে ও তার আয়ু বর্ধিত করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরও সচল করে দিয়ে তার চলা ফেরায় চমৎকার সচলতা এনে দেয় এবং তার কর্মশক্তি দ্বিগুণ তালে বাড়িয়ে তোলে। শারীর শিক্ষার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন একটা জাতি তার দেশের সর্বরকম কর্মযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সহায় হতে পারে।

তাঁরা আরও লিখেছেন, শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার প্রভাবে ও অন্তর্নিহিত গুণে মানুষ আরও সামাজিক হয়ে ওঠে। বিচিত্র পরিস্থিতিতেও নিজেকে মানিয়ে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মায়। এছাড়া, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই খেলোয়াড়ী মনোভাবের প্রতিফলন হওয়ায় অপরের কাছে প্রিয় হয়। কিন্তু, শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার মধ্যে যে অপার আনন্দ আর সৌন্দর্য নিহিত আছে তার কথা সম্ভবত বেশি লেখা হয়নি।

এই যে পৃথিবীটা পড়ে আছে তার নদী আর সাগর, পর্বত আর আকাশ, অরণ্য আর প্রান্তরের প্রতি অঙ্গে সুন্দরের মালা গেঁথে—সেখানে যে মানুষগুলো বাস করে তাদেরও তো সুন্দর হতে হবে, নইলে রইলে তুমি বেমানান হয়ে। পৃথিবীটার ঐ বিরাট বিচিত্র রঙিন্ ক্যানভাসে অসুন্দর তুমি কালো বিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে শুধু।

শারীর শিক্ষার নানা শাখা প্রশাখা আর খেলাধুলায় নিজেকে নিয়োগ ক'রে—আর প্রয়োগ ক'রে তার নানা কলা-কৌশল মানুষ পারে তার দেহকে রূপময় করে তুলতে।

সুগঠিত দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয় স্বাস্থ্যের দীপ্তি। তার চলায় স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দ বেজে ওঠে। তার থামাও সুরহীন নয়, তার বসায় ঋজুতার দৃপ্ততা দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে, মোহ জাগায়।

সব খেলার মধ্যেই অপরূপ রূপের সঞ্চারণ দৃশ্যমান। চক্ষুষ্মানরা দেখতে পান সেগুলি এবং তারিফ করেন প্রাণভরে। ক্রিকেটে লেট কাট্ কিংবা লেগ গ্ল্যান্স—ফুটবলের পায়ের কাজে আর দেহের ভাঁজে ব্যাক্‌কে বোঁকুব বানিয়ে গোলের কোন ঘেঁসে, সট করা—হকি স্টিকের সঙ্গে বলকে আঠার মতো লাগিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একখানা নিখুঁত থ্রু পাস—ব্যাডমিণ্টনের নিখুঁত প্লেসিং—টেবল টেনিসে মারের উপর মার, তারপরে আবার মার, আবার মার—বাস্কেট ও ভলিবলে উঁচুতে লাফিয়ে উঠে বল রিং-এ নিক্ষেপ বা জালের ওপারে সজোর চপেটাঘাতে পাঠিয়ে দেওয়া—এ্যাথলেটিকসে বর্শা কিংবা পেতলের বল নিক্ষেপের অপূর্ব ভঙ্গী—১০০ মিটার দৌড়ের সমাপ্তি মুহূর্তে বুকে ফিতে ঠেকানোর আকুতি—সাঁতারে বাটার ফ্লাই স্ট্রোকের জল-প্রজাপতির পাখা মেলা আর বন্ধ করা—জিমনাস্টিক রিং এর-খেলায় ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর ভঙ্গী, ফ্লোরে ও বীমে কত লাবণ্যময় দেহভঙ্গীর মেলা—পোলভল্টে প্রায় আকাশে লাফিয়ে উঠে হেলায় হাতের দণ্ড ছেড়ে দিয়ে দেহকাণ্ড বাঁকিয়ে রমণীয় ভঙ্গীতে নীচে লাফিয়ে পড়া।...

এমনি করে দিনের পর দিন খেলোয়াড়রা মাঠে ময়দানে, জলে-স্থলে কতশত রূপ নির্মাণ করে চলেছে রঙিন্ তুলির রেখায় নয়, নিজেদের সুঠাম, মজবুত, পেশীপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীর দিয়ে।

এই রূপাবলীর যারা স্রষ্টা, যারা অনেক ঘাম ঝরিয়ে, ক্লান্তি উপেক্ষা করে খেলার মাঠে উপস্থিত করে সমুদ্রের ঊর্মির উল্লাস তাদের যুক্ত করে জানাই নমস্কার বারংবার।

যারা অনেক শ্রমের বিনিময়ে নিজের দেহকে মনোহর ক'রে নিয়ে মনোরম ভঙ্গীমায় একের পর এক বিদ্যুতের চমকে খেলার মাঠ আলোকিত করে তোলে তাদের যুক্ত করে জানাই নমস্কার বারংবার।

যারা দিনের পর দিন রোদ্দুরে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ঠাণ্ডায় জমেও অনুশীলনে অনুশীলনে উপযুক্ত হয়ে খেলার মাঠে প্রদর্শন করে গতি-বেগের ঝড় কিংবা ষড়বিংশ মাইল দৌড়ের দক্ষতা তাদের যুক্ত করে জানাই নমস্কার বারংবার।

যারা শুধু মাঠে নয়, জীবনেও নিজের সাফল্যে বিনম্র, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন তাদেরও জানাই যুক্ত করে নমস্কার বারংবার।

গ্রন্থপঞ্জী

১। History of Physical Education—Eraj Ahmed Khan.

২। An Analytical History of Physical Education—C. Tirunarayanan and S. Hari Haran.

৩। A Brief History of Physical Education of India—K. Rajagopalan.

৪। India : Ancient and Medieval—Khanna and Chopra.

৫। National Folk Sports in the USSR—Editor : Yuri Lukashin.

৬। The Story of Mankind—Hendrik Van Loon.

৭। Platinum Jubilee Number of Mohun Bagan A. C.

৮। Civilisation in Ancient India—Ramesh Chandra Datta.

৯। A History of the Great Mughuls—Pringle Kennedy.

১০। The Story of Civilization—Edited by Arjun Dev.

১১। 40 years of Test Cricket : India vs England—Saradindu Sanyal.

১২। Magazines—Sports in the USSR and Chinese Sports.

১৩। অলিম্পিকের ইতিকথা—শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

১৪। বিশ্বক্রীড়া ওলিম্পিক—অজয় বসু।

১৫। হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর।

১৬। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা—পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

১৭। মল্লজগতে ভারতের স্থান—সমর বোস।

১৮। ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা—বীরেন্দ্র নাথ বসু।

১৯। বলীদের গল্প—শচীন্দ্র মজুমদার।

২০। ব্যায়ামে বাঙ্গালী—অনিল চন্দ্র ঘোষ।

২১। সচিত্র যোগ ব্যায়াম—নীলমনি দাশ।

২২। সমাজের কথা—সুকুমার মিত্র ও সুনীল কুমার সেন।

২৩। মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু।

২৪। বাংলা প্রবন্ধ সংকলন (১ম খণ্ড)—সম্পাদক-নীলরতন সেন।

২৫। বিনোদন সংখ্যা (দেশ)।

২৬। আনন্দবাজার পত্রিকা (বার্ষিক সংখ্যা)।

২৭। সাময়িক পত্র—দেশ ও খেলার আসর।

২৮। দৈনিক পত্রিকা—রবিবাসরীয় আনন্দবাজার ও রবিবাসরীয় আজকাল।

২৯। A Commemoration : 33rd World Table Tennis Championship.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২৫	জন্মানো	জন্মালো
৩	৩২	প্রান্তরে	প্রান্তরের
৫	৩	অন্যদলের	অন্যদলের সঙ্গে
৫	১৪	ধনুর্বিদ্যা	ধনুর্বিদ্যা
৫	১৫	বিদ্যা	বিদ্যা।
৬	১১	করুণায়	করুণার
৭	৫	সমান	সম্মান
৭	১০	গ্রীসে	গ্রীস
৭	১৩	সঞ্চিত	সিঞ্চিত
৯	৩	সুষমান্বিত	সুষমামণ্ডিত
১৫	২৯	বিত্ত	চিত্ত
২২	১৯	হাওয়া	হাওয়ায়
২২	২৩	পদ্ধতি	পদ্ধতিতে
৫৬	১৫	ব্যক্তিরাও	ব্যক্তিরও
৫৯	১৬	কাজ	কাছ
৫৯	২৬	সম্রাটের	সম্রাটের
৬০	১	নিশ্চিত	বিস্মিত
৬১	২৮	শাসনে	সামনে
৬৮	২৪	ভাস্কর	ভাস্বর
৬৮	২৫	পদ	পদে
৬৮	২৮	ব্যক্তিদের	ব্যক্তিত্বের
৮৭	২৩	সম্প্রদায়	সম্প্রদায়ের
৯২	২৪	১০০০ মিনিট	১০০ মিনিট
৯৫	১২	স্বীকার	শিকার
৯৮	২৮	উচ্ছলতা নেই,সংযম	উচ্ছলতা নেই, আছে সংয
১০৫	১৩	রীতিমতও	ও নিখুঁত
১০৫	১৮	আয়ত্ব	আয়ত্ত
১০৫	১৯	অর্থাৎ	অবশ্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৬	৬, ৭ ও ৮	ফুটবল প্রশিক্ষণের উপর একটি বই লিখে ভারতীয় ভাষায় প্রথম যেটি ফুটবল প্রশিক্ষণের গ্রন্হকার হিসাবে চিহ্নিত।	ফুটবল প্রশিক্ষণের উপর একটি বই লিখে প্রথম ভারতীয় ফুটবল প্রশিক্ষণের গ্রন্হকার হিসাবে চিহ্নিত।
১০৬	৩২	মন্মথ দত্ত	সন্মথ দত্ত
১০৭	১৪	অনেক	অনেকে
১০৯	২১	খেলোয়াড়	খেলোয়াড়দের
১০৯	২৮	সাহায্য	সাহায্যে
১১৩	১০	মূলোর	মূল্যের
১১৮	২৪	বর্ণনা পাওয়া যায়	বর্ণনা।
১১৮	২৯	মহাদেরের	মহাদেবের
১১৯	৯	পহলবান	পাহেলবান
১১৯	২৭	প্রবন্ধে	প্রবন্ধ
১২৬	১৭	দাটের	দাপটের
১৫৫	১৯	অশোষ	অশেষ
১৫৫	২১	এ	এক
১৫৫	২২	এসেছে	এসেছে।
১৫৮	৪	সকলেই	সকলেই ছিল
১৫৮	২৯	দুই মিটার	দুই শত মিটার
১৬৩	২৬	বোর্ডিং	বোর্ডিং-এ
১৬৪	৩০	যে সব	সব
১৬৯	৭	স্বাস্থ্যরক্ষা	স্বাস্থ্যরক্ষার
১৭১	৩	রুনা	রুশ
১৭৫	৩, ৪	কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে দাবা প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয় রাশি-য়ার দাবা।	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে দাবা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয় রাশিয়ার দাবা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৫	১৫	প্রতিভার	প্রতিভা
১৭৮	১৩	দেখতে	দেখতে দেখতে
১৯৫	১৯	ফন্দ্র	যন্ত্র
২০৫	২	সাহায্য	সাহায্যে
২০৫	৪	এগুলির	এগুলি
২০৯	১২	[illegible]ুক্ত	মুক্ত
২৪৬	৫	তার	তারা
২৭৪	২৩	আশোক চক্র	অশোক চক্র

আদিম যুগের মানুষের প্রাণ ধারণের প্রয়াসে ও জীবন-যাপনের প্রয়োজনে আরও বেগে দৌড়, আরও দূরে লাফ, আরও শক্তি সঞ্চয়ের ইতিহাস থেকে সুরু করে যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন দেশের শারীর শিক্ষার বিচিত্রতা ও ক্রমবিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। তৎসহ প্রতিবিম্বিত হয়েছে নানা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এতদ্ব্যতীত, বর্তমানের জনপ্রিয় ক্রীড়াগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কাহিনী এবং প্রাচীন ও আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাসও এই গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। শারীর শিক্ষায় বাঙ্গালীর অবদান সম্পর্কে একটি পৃথক পরিচ্ছদ প্রদত্ত হয়েছে।

সাতাশ টাকা